মূল রচনা শ্রীলাল শুক্লা
ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া 1957

Original title : RAAG DARBARI *(Hindi)*
Bengali title : RAAG DARBARI

পরিবেষক :
সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
22, রাজা উডমান্ট স্ট্রিট
কলিকাতা-700001

ডাইরেক্টর, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক, নয়া দিল্লী- 110016
দ্বারা প্রকাশিত এবং নবজীবন প্রেস, কলিকাতা-700006 দ্বারা মুদ্রিত

ভূমিকা

হিন্দী উপন্যাসের ইতিহাস ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আরম্ভ। কিন্তু তার এক গম্ভীর এবং সুস্পষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে প্রেমচন্দের আগমনের পর থেকে। এটা আশ্চর্যের বিষয় হতে পারে যে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দশকগুলিতে পাশ্চাত্য জগৎ যখন তাদের উপন্যাস-সাহিত্যের উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে তখন হিন্দী উপন্যাস তার শৈশবের অবোধ ঔপন্যাসিক চরিত্র থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে। প্রেমচন্দের রচনা কয়েক বছরের মধ্যেই উপন্যাস-সাহিত্যে নতুন মহিমা স্থাপন করল আর হিন্দী উপন্যাসকে সমকক্ষতার মর্যাদা দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-জগতের মানচিত্রে অঙ্কিত করে দিল।

বিংশ শতাব্দী রাজনৈতিক বিপ্লব, সাংস্কৃতিক সংক্রমণ এবং মানুষের অদৃষ্টের ওপর প্রশ্ন চিহ্ন বসানোর শতাব্দী। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতি শিল্পসংস্কৃতিকে কেবল নিরর্থক প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে নি, তাকে এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার চ্যালেঞ্জের সামনে উপন্যাস সেই একই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। উপন্যাসের অতি-কল্পনাকে বিজ্ঞান বাস্তব রূপ দিয়েছে, কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষার অক্ষয় ভাণ্ডার এখন নিঃশেষ। প্রযুক্তিবিদ্যার সামনে মানুষের ক্রমক্ষীয়মাণ বিশ্বাস আর তার সমগ্র বিরূপতার কথা উপন্যাসে চিত্রিত হচ্ছে। ঐ একই তীব্রতার সঙ্গে আমাদের আজকের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের নরকও আধুনিক উপন্যাসের বিষয় হয়েছে। হিন্দী উপন্যাস-সাহিত্যের প্রসঙ্গে এ কথা বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে, মানুষের

জীবনের যেসব দিক কোনো মহিমান্বিত ভাষার সাফল্য বলে পরিগণিত হয় তার চিত্রও এতে সম্যক্‌রূপে আছে। হিন্দী উপন্যাসের ইতিহাস যদিও খুব পুরনো নয়, তবু তার সাফল্যের পরিধি বিরাট।

প্রেমচন্দের যুগের আগেকার উপন্যাস অলৌকিক ঘটনা আর ঐতিহাসিক চমৎকারিত্বে ভরা। তাদের অসাফল্যের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ তারা কোনো ঐতিহ্য রেখে যেতে পারে নি। ভাষা আর শিল্পগত স্তরে ঐসব উপন্যাসের কোনো দান নেই। প্রেমচন্দই প্রথম সামাজিক চেতনার সেইসব বিন্দু ধরার চেষ্টা করলেন, যাতে সামাজিক পরিবর্তন, স্বাধীনতা, রূঢ় এবং মরণাসন্ন মূল্যবোধের বিরোধিতা ও অন্যান্য সমস্যার মোকাবিলায় মানুষের সংগ্রামের কথা স্থান পেয়েছে। প্রেমচন্দের 'গোদান' উপন্যাস এমন এক মূল্যবান্ প্রস্তরখণ্ড, যেখান থেকে আধুনিক হিন্দী উপন্যাসের যুগের সূত্রপাত। গোদানে একজন চাষীর মজুর হয়ে যাবার তরণগাথা চিত্রিত হয়েছে। এই চিত্রের সাহায্যে প্রেমচন্দ মহাজনী অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানতে চেয়েছেন এবং বলতে চেয়েছেন, চাষী থেকে মজুরে রূপান্তরিত হবার এই ট্র্যাজিডি নগরীকরণের ভয়াবহ ভূমিকার একটা প্রমাণ। নগর আর গ্রামের দুই ভিন্ন বিন্দুকে স্পর্শ করছে এই যে কাহিনী, এ আমাদের বর্তমানকালের এক ঐতিহাসিক দলিল। প্রেমচন্দ আর তাঁর সমকালীন অধিকাংশ লেখক "সামাজিক ন্যায়"-কেই তাঁদের উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন। লোকজীবনের বিবিধ দৃশ্যে সম্পূরিত প্রেমচন্দ-কালীন উপন্যাসে লোক-সংস্কৃতির সেইসব প্রারূপ বর্তমান, যাতে দাসত্ব থেকে মুক্তি, চাষী-মজুরদের আর্থিক সংঘর্ষ আর ভারতীয় সমাজে একটা ন্যায়পরায়ণ সমাজবাদ আনার সংকল্পের মহিমান্বিত সক্রিয়তা চিত্রিত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে ফ্যাসিজম, বিশ্বযুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী

মনোবৃত্তি যে আতঙ্কের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল, হিন্দী উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে আজও তার সংগ্রথিত রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে। গণ-আন্দোলনের যথার্থতা থেকে সৃষ্ট এক রাষ্ট্রীয় মানসিকতার এই উপন্যাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর "মানুষ"-কে কেন্দ্র করে "ব্যক্তি"-র অন্তর্জগতের কথার উপন্যাস কী করে হ'ল, সে এক মনোজ্ঞ কাহিনী হতে পারে, কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সামাজিক পটভূমিতে ব্যক্তির নিজস্ব জগতের চিত্রাঙ্কন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। বস্তুতপক্ষে, "ব্যক্তি"-র বিশ্লেষণের এই ধারা "ব্যক্তির অন্বেষণে"-র ধারা। অজ্ঞেয়, জৈনেন্দ্র, ইলাচন্দ্র যোশী, ভগবতীচরণ বর্মা প্রভৃতি লেখকের উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে যশপাল, অশ্‌ক্, অমৃতলাল নাগর, বৃন্দাবনলাল বর্মা প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের রচনা প্রকৃত অর্থে ভারতীয় জনজীবনের বিবিধ সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের কাহিনী বর্ণনা করছে।

স্বাধীনতা এমন এক কেন্দ্রবিন্দু যাকে ভিত্তি করে স্বাধীনতা-পূর্ব তথা স্বাধীনতার পরবর্তীকালের উপন্যাসের আলোচনা করা যেতে পারে। হিন্দী উপন্যাসে সামাজিক ন্যায়বিচার আর মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের পর একেবারে নতুন একটা ভূমির স্পর্শ পাওয়া গেল স্বাধীনতার পরে। নতুন রচয়িতারা ভারতীয় রাজনীতি আর স্বাধীনতার পরবর্তীকালের ভারতের স্বরূপকে সত্যিকারের পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত করায় সফল হলেন। মোহন রাকেশ, ফণীশ্বরনাথ রেণু, কৃষ্ণবলদেব বৈদ, নাগার্জুন, ভৈরবপ্রসাদ গুপ্ত, কমলেশ্বর, রাজেন্দ্র যাদব, রাঙ্গেয় রাঘব, নরেশ মেহতা প্রভৃতির উপন্যাসকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। রেণুর 'ময়লা আঁচল' আর নাগার্জুনের 'বলচনমা' এমন রচনা, যাতে প্রেমচন্দ-কালীন

সামাজিক ন্যায়বিচারের মানসিকতার প্রস্ফুট রূপ চিত্রিত হয়েছে এবং সংবেদনশীলতার ভিত্তির ওপর আধুনিক ভারতীয় লোকানুভব ব্যঞ্জিত হয়েছে। এইসব উপন্যাসের মধ্যে অনেকগুলিই আমাদের আজকের যুগের "ক্লাসিক উপন্যাস" হয়ে গেছে। এটা বিস্ময়ের কথা যে, আধুনিক রচনা আধুনিক কালেই ক্লাসিক রচনা হয়ে গেছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, কেবল বস্তুচেতনার দৃষ্টি থেকেই নয়, শৈল্পিক আর সংবেদনের দৃষ্টি থেকেও স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের কতকগুলি উপন্যাস "উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যমূলক প্রকাশভঙ্গি" নতুন করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। স্বাধীনতার কয়েক বছর পরে তরুণ লেখকদের যে নতুন প্রজন্ম সামনে এসেছেন তাঁরাও এমন কতকগুলি উপন্যাস লিখেছেন যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এইসব উপন্যাস আকারে ছোটো, কিন্তু আজকের সত্যকে বোঝার জন্য এগুলো একপ্রকার প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীকান্ত বর্মা, শ্রীলাল শুক্লা, রমেশ বকসী, মহেন্দ্র ভল্লা প্রভৃতি লেখকের উপন্যাসে সমকালীন "বিরূপতা" তার সমগ্রতার মধ্যে চিত্রিত হয়েছে। আমাদের সামাজিক জীবনে যা কিছু আছে, তার শৈল্পিক ব্যাখ্যা এই কারণে কোনো মাধ্যমেই সম্ভব নয় যে, আজ যা কিছু আছে তা এক বিকট রকমের "ধ্বংসের" অংশ মাত্র। ব্যক্তি, পরিবার, জাতি, ব্যবস্থা, সংস্থা, বিশ্বাস আর অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে তাকে খেয়ালী কিংবা বিদ্রোহী অথবা নৈরাশ্যপূর্ণ আখ্যা দেওয়া যায় না। বরং বলতে হবে, এটা এমন একটা বিকল্পহীন স্থিতি, যাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যায়। বস্তুত, এমন কতকগুলি উপন্যাস আছে, যা ঐ "নিশ্চিহ্ন" করার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতার পরে গণতন্ত্রের প্রয়োগে নিরত রাজনীতি কতদূর পর্যন্ত

আমাদের সাংস্কৃতিক সংক্রমণকে অধিকতর সংকটময় করে তুলেছে তা এক অদ্ভুত ব্যাপার হলেও ভয়ংকর। সমকালীন ঔপন্যাসিকেরা এই ট্র্যাজিডিকেই তাঁদের উপন্যাসের লক্ষ্য করেছেন। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের ঔপন্যাসিকেরা যেভাবে সমাজ আর মানুষের অন্তর-মনের সমস্যাবলীর সহানুভূতিপূর্ণ চিত্র এঁকেছেন, নতুন কথা-সাহিত্যিকেরা সেই রীতি ত্যাগ করে নিজেদের সামাজিক স্থিতির সামনে রেখে আসলে সমাজের ধ্বংসোন্মুখ আস্থাগুলোকে অনাবৃত করে দিয়েছেন। 'জাহাজ কা পঞ্ছী'-র তুলনা 'অন্ধেরে বন্ধ কমরে'-র সঙ্গে হতে পারে না। সম্ভবত, কোনো স্তরেই কোনো দুটো উপন্যাসের তুলনা হতে পারে না। কেবল সুবিধার জন্য এ কথা বলা যেতে পারে যে, দুটো উপন্যাসে দুটো ভিন্ন দৃষ্টি কাজ করে। এই দৃষ্টি বা মানসিকতা একরকম ভাবে উপন্যাসের মূলাধারের নিয়ামক। অতএব স্বাধীনতার পরে লেখা হলেও দুটো উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থাকতে পারে। তাই যখন কোনো উপন্যাসে আমরা মানবীয় স্তরে "ব্যক্তি"-র অন্তর্জগতের চিত্র পাই আর অন্য একটা উপন্যাসে নিজের সত্যটাকে দেখে সেই ভয়ংকরের মানবীয় রূপ পাই তখন দুটো উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার সেই সূত্রটা খুঁজে নিই, যেটা পূর্ববর্তী উপন্যাস থেকে আজকের উপন্যাসকে আলাদা করছে।

'গোদান' থেকে 'রাগ দরবারী' পর্যন্ত যাত্রাপথে এইরকম অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস আছে। সেগুলো যেমন ক্লাসিকের গরিমায় মণ্ডিত তেমনি আধুনিক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত প্রয়োগধর্মী উপন্যাস। 'গোদান' আর 'রাগ দরবারী'-র মধ্যে রচনাধর্মের কোনো সাম্য না থাকতে পারে, কিন্তু ভারতীয় জীবনের দুই গুরুত্বপূর্ণ "বিন্দু"-র এবং দুই সাংস্কৃতিক দৃষ্টির অস্তিত্ব দুটো উপন্যাসেই আছে। প্রেমচন্দ

অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, সাহিত্যজগতে তাঁর স্বীকৃতি 'রাগ দরবারী'-র লেখক শ্রীলাল শুক্লার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রীলাল শুক্লা আধুনিক লেখকদের সেই শ্রেণীর অন্তর্গত, যাঁরা মূলত তাঁদের প্রয়োগধর্মী রচনাকার্যের দ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রে স্থান করে নিয়েছেন। 'রাগ দরবারী' রচনার আগে শ্রীলাল শুক্লা হিন্দী সাহিত্যজগতে একজন ব্যঙ্গ-লেখক বলে পরিচিত ছিলেন। হঠাৎ 'রাগ দরবারী' উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস-লেখক হিসাবে হাজির হলেন। এখানে বলা দরকার যে, ব্যঙ্গ লেখক হিসেবে শ্রীলাল শুক্লার ব্যঙ্গ রচনায়, বিশেষ করে তাঁর 'অঙ্গদ কা পাঁও' সংকলন-গ্রন্থে, যে "গাম্ভীর্য" পাওয়া যায়, তাঁর উপন্যাসেও সেই গাম্ভীর্য পরিলক্ষিত হয়— যদিও কয়েকজন আলোচক 'রাগ দরবারী'-কে ব্যঙ্গ-রচনার একটা সংকলন-গ্রন্থ মাত্র বলেছেন। সুতরাং 'গোদান' আর 'রাগ দরবারী' বস্তুতপক্ষে গম্ভীর রচনা। এই দুটি উপন্যাস এমন দুজন লেখকের সৃষ্টি যাঁদের রচনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা যায় না। এটা কৌতূহলের বিষয় যে, যেখানে 'গোদানে' গ্রাম থেকে শহরে যাবার কথা ব্যক্ত হয়েছে, নগরীকরণের প্রক্রিয়ার ভীতিপ্রদ সত্য বর্ণিত হয়েছে, সেখানে 'রাগ দরবারী'-তে শহর থেকে গ্রামের দিকে প্রয়াণ। স্বাধীনতার আগে শহরীকরণের অন্ধ প্রতিযোগিতায় "শহরের" গুরুত্ব ছিল, সেই গুরুত্ব আজ কমে যায় নি— কিন্তু রাজনৈতিক দুর্নীতি থেকে বাঁচার জন্য এবং অন্য শহরের চাপ থেকে বাঁচার জন্য গ্রামের দিকে যাবার যে সূত্র আছে তা আজকের ভারতের আসল স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করছে। "গ্রাম" আর "শহর" ভারতের গণ-জাগরণের এবং সংস্কৃতির দুই কেন্দ্র। এখানে জীবনের স্পন্দনে সমস্ত রকমের বিভিন্নতা আছে, কিন্তু গণতন্ত্রীকরণের ফলে যে সংস্কার দেখা

দিয়েছে তা কমবেশি এক। গ্রামের মতো ছোট্ট একটা শহর— সেখানে গ্রামীণ উত্তেজনা জাতীয় প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বড়ো শহর এবং মহানগরের মতো রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও সেখানে একই রকম সক্রিয়। 'রাগ দরবারী'-র এই সত্য তার শিরোনাম থেকেও প্রতিধ্বনিত হয়। ছোটো শহর আর বড়ো শহরে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে নতুন স্বভাবকে প্রকাশ করছে তা অনেক দিক দিয়ে এক নতুন ধরনের সামন্ততান্ত্রিক আচার-আচরণকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। 'রাগ দরবারী'-র ব্যঙ্গ কাহিনীর চাবুক পড়েছে এই আচার-আচরণের উপর যা কেবল অমানবীয় নয়, বরং অত্যন্ত বিশ্রী, বিরক্তিকর আর অসহনীয়।

কথাশিল্পের বিবিধ শৈলীর নতুন নতুন আর নানারকম প্রয়োগ আর ভাষাগত মাধুর্যে 'রাগ দরবারী' কোনো ক্লাসিক উপন্যাসের চেয়ে কম নয়। কিন্তু তাই বলে একে সোজাসুজি আধুনিক ক্লাসিক উপন্যাস বলা ঠিক হবে না। এ ভয়ংকরের এক সার্থক ব্যঙ্গ। একদিক দিয়ে এ আপন "ব্যবস্থা"-র গোটা খেলাটার মধ্যে থেকেও তাকে অস্বীকার করা। স্বয়ং নিজে থেকেও থাকাটাকে নষ্ট করে দেওয়া একটা ভালো রচনার লক্ষ্য হতে পারে, কিন্তু এখানে আমার উদ্দেশ্য 'রাগ দরবারী'-র সদ্‌গুণগুলো বিচার করা নয়। যদিও শিল্পের দৃষ্টিতে 'রাগ দরবারী'-র কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি নেই (কারণ তথাকথিত শৈল্পিক দৃষ্টিতে "হীন" কোনো শিল্পহীন রচনাও শ্রেষ্ঠ হতে পারে) অথবা অন্য ভিত্তিতে কোথাও কোথাও দুর্বল মনে হতে পারে, তবু সংবেদনের আধারে আমাদের সামাজিক বিশ্বাসঘাতকতা, ধূর্ততা আর প্রবঞ্চনাকে উন্মুক্ত করে দেবার ক্ষেত্রে এ এক সৎ প্রচেষ্টা।

একজন সমালোচক 'রাগ দরবারী'-কে আঞ্চলিক উপন্যাসের শেষ কৃতি বলে আখ্যাত করেছেন। আমি জানি না, আঞ্চলিক উপন্যাসের

আরম্ভ তিনি কোথা থেকে ধরেছেন। তবে এটুকু অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, 'রাগ দরবারী' এক সার্থক ব্যঙ্গ রচনার আরম্ভ। এতে বেঢপ ব্যঙ্গ প্রসঙ্গও আছে, কিন্তু সমস্ত ব্যঙ্গ প্রসঙ্গই তার বাহ্যিক অর্থে কুরূপ হয়ে থাকে। সমস্ত আঘাত আর তর্কের ভাষায় আক্রমণ থাকে আর সমস্ত আক্রমণেই এক রক্তরঞ্জিত কুরূপতার আরম্ভ থাকে। আজকের ভাষায় যাকে বিরোধ বা বিদ্রোহ বলা হচ্ছে, ব্যঙ্গের ভাষায় তাকে সহযতি বলে তার ভেতরকার অর্থ-স্বার্থের বনিয়াদ ভেঙে দেওয়া হয়, তাকে তার সঠিক পদ-অর্থের সংগীতে দেখার ও চেনার চেষ্টা করা হয়। একটি ব্যঙ্গ-কথাশিল্প হিসাবে 'রাগ দরবারী'-র সাফল্য নিয়ে তর্ক হতে পারে, কিন্তু এই উপন্যাস নিঃসন্দেহে এক ভয়াবহ অথচ প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গকৃতি। এর এক নিজস্ব দৃষ্টিকোণ আছে। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, তা বোঝার জন্য হয়তো আলাদা পথও আছে। সম্ভবত এই উপন্যাস "কৃতির পথ" দিয়ে দেখার সুযোগে ভরা উপন্যাস, এবং তা হয়তো এই কারণে যে, এ একটা উপন্যাস আর সেইসঙ্গে ব্যঙ্গও। সমাজ-ব্যবস্থার বীভৎসতা, রাজনীতির ঘৃণ্য নষ্টামি—এসব প্রকাশ করার কাজ খবরের কাগজও করতে পারে। এই দিক দিয়েও 'রাগ দরবারী' আর খবরের কাগজের তৎকালীনতায় পার্থক্য আছে। খবরের কাগজ শিল্পকর্ম হয় না, কিন্তু 'রাগ দরবারী' একটা শিল্পকর্ম। আর শিল্পকর্ম হবার প্রথম শর্ত এই যে, তাকে বিতর্কমূলক হতে হবে, সমস্তরকম সন্দেহে ভরা। এবং এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, 'রাগ দরবারী' কেবল বিতর্কমূলক উপন্যাস নয়, এ "সন্দেহে"রও কেন্দ্রবিন্দু।

গঙ্গাপ্রসাদ বিমল

এক

শহরের শেষ প্রান্ত। এর পরেই পল্লী-ভারতের মহাসমুদ্র শুরু হয়ে গেছে।

ওখানেই একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকটাকে দেখেই মনে হয়, কেবল রাস্তার সঙ্গে বলাৎকার করার জন্যই তার জন্ম। ট্রাকটার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে। পুলিস ওটাকে একদিক থেকে দেখেই অমনি বলে দিতে পারে যে, ওটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার অন্যদিকে তাকিয়ে বলতে পারে যে, ওটা রাস্তার এক কিনারায় আছে।

চলতি ফ্যাশন অনুযায়ী ড্রাইভার ট্রাকটার ডানদিককার দরজাটা খুলে ডানার মতো ছড়িয়ে দিয়েছে। তাতে ট্রাকটার সৌন্দর্য বেড়েছে। তা ছাড়া অন্য সওয়ারীরা বুঝতে পারছে, রাস্তাটা নিরাপদ, ট্রাকটা যখন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে তখন রাস্তাটা দিয়ে নিরাপদে যাওয়া যায়।

রাস্তার একদিকে একটা পেট্রোল স্টেশন। অন্যদিকে খড় পাতা, কাঠ আর ভাঙা পচা টিনের টুকরো দিয়ে তৈরি কতকগুলো দোকান। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়, দোকানগুলো গোনা যাবে না। প্রায় সব

দোকানেই লোকের পছন্দমতো একটা পানীয় পাওয়া যায়। ধুলোকাদা, কয়েকবার ব্যবহার করা চা-পাতা আর গরম জল দিয়ে তা তৈরি। দোকানগুলোতে মিষ্টিও পাওয়া যায়। মিষ্টিগুলো দিনরাত সর্বক্ষণ ঝড়-বাদল আর মশামাছির আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলেছে। মিষ্টিগুলো আমাদের দেশী কারিগরদের হস্তকৌশল আর বৈজ্ঞানিক দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। বলছে, দাড়ি কামানোর ভালো ব্লেড তৈরি করার পদ্ধতি আমরা না জানতে পারি, কিন্তু বাজে জিনিস দিয়ে সুস্বাদু খাবার তৈরি করার কৌশল সারা পৃথিবীতে একমাত্র আমরাই জানি।

ট্রাকটার ড্রাইভার আর ক্লিনার একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে।

রঙ্গনাথ দূর থেকে ট্রাকটাকে দেখতে পেল, আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার পা দুটো জোরে জোরে চলতে শুরু করল।

রেল আজ তাকে খুব ধোকা দিয়েছে। রোজকারমতো আজও ট্রেনটা দু'ঘণ্টা লেট থাকবে মনে করে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু আজ মাত্র দেড় ঘণ্টা লেট ছিল। অভিযোগ-বইয়ের কথা-সাহিত্যে তার নিজের কিছু কথাসাহিত্য যোগ করে আর রেল-কর্মীদের চোখে হাস্যাস্পদ হয়ে রঙ্গনাথ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসেছিল। রাস্তায় নেমে ট্রাকটাকে দেখতে পেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনটা তার খুশিতে ভরে উঠল।

রঙ্গনাথ ট্রাকটার কাছে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন ক্লিনার আর ড্রাইভার চায়ের শেষ চুমুকটা খাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে, খুশিভাবটা লুকিয়ে, নির্বিকার ভঙ্গিতে ড্রাইভারকে সে জিজ্ঞাসা করল, "কি ড্রাইভারসাহেব, ট্রাকটা কি শিবপালগঞ্জের দিকে যাবে?"

ড্রাইভার তখনও চা খাচ্ছিল, তার চোখের সামনে দোকানদারনী। তাই তাচ্ছিল্যভরে সে জবাব দিল, "যাবে।"

"আমাকেও নিয়ে চলো না তোমার সঙ্গে। পনেরো মাইলের মাথায় নেমে পড়ব। শিবপালগঞ্জ পর্যন্ত যাব।"

ড্রাইভার একবার দোকানদারনীর সর্বাঙ্গ দেখে নিল। তারপর রঙ্গনাথের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। আহা, কী সুন্দর চেহারা! পরনে খদ্দরের পায়জামা, মাথায় খদ্দরের টুপি, গায়ে খদ্দরের জামা। কাঁধে ঝুলছে ভূদানী ঝোলা। হাতে চামড়ার অ্যাটাচি। ড্রাইভার রঙ্গনাথের দিকে তাকিয়েই রইল। তারপর কী চিন্তা করে বলল, "বসে পড়ুন, এখুনি রওনা হব।"

ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ করে ট্রাকটা চলেছে। শহরের আঁকাবাঁকা রাস্তা থেকে মুক্তি পাবার পর একটু এগিয়েই পরিষ্কার ফাঁকা রাস্তা এসে গেল। এখানেই প্রথম ড্রাইভার টপ গিয়ার ধরল, কিন্তু বার বার তা পিছলে পিছলে নিউট্রাল গিয়ারে নেমে আসছে। একশো গজ পর পর গিয়ার পিছলে যাচ্ছে, আর অ্যাকসিলারেটর চাপা থাকছে বলে ট্রাকের ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ বেড়ে যাচ্ছে, গতিবেগ যাচ্ছে কমে। রঙ্গনাথ বলল, "ড্রাইভারসাহেব, তোমার গিয়ারকে তো আমাদের দেশের সরকারের মতো মনে হচ্ছে।"

ড্রাইভার মৃদু হেসে এই প্রশংসা গ্রহণ করল। রঙ্গনাথ তার কথাটা পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করল, "ওটাকে যতবারই তুমি টপ গিয়ারে নিয়ে যাও-না কেন, দু'গজ গিয়েই আবার পিছলে যাবে আর তার নিজের খাঁচায় ফিরে আসবে।"

ড্রাইভার হাসল। বলল, "বড়ো কথা বলেছেন বাবু।"

ড্রাইভার এবার গিয়ারটাকে টপে উঠিয়ে একটা পা প্রায় নব্বই ডিগ্রী কোণ করে গিয়ারটাকে উরুর নীচে চেপে ধরল। রঙ্গনাথ বলতে চাইল, সরকার চালানোর জন্যও এই রকম একটা ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু কথাটা আরো বড়ো হয়ে যাবে ভেবে বলল না।

ওদিকে ড্রাইভার এতক্ষণে উরুটাকে গিয়ারের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়েছে। এবার গিয়ারটার ওপর সে একটা লম্বা কাঠ লাগিয়ে দিয়ে তার একটা মাথা প্যানেলের নিচে আটকে দিল। ট্রাকটা প্রচণ্ড জোরে চলতে শুরু করল। তাই দেখে যারা সাইকেলে যাচ্ছিল, হেঁটে যাচ্ছিল, এক্কায় যাচ্ছিল— সবাই ভয়ে-আতঙ্কে কয়েক ফার্লং দূরেই রাস্তা থেকে নেমে নিচে গিয়ে দাঁড়াতে লাগল। যে-রকম প্রচণ্ড বেগে ট্রাকটা ছুটছে তাতে মনে হচ্ছে, তাদের দৃষ্টিতে ওটা ট্রাক নয়— আগুনের ঢেউ, বঙ্গোপসাগর থেকে ওঠা ঝড়, জনতার ওপর ছেড়ে দেওয়া কোনো অত্যাচারী সরকারী কর্মচারী অথবা কোনো মারাঠা দস্যুদল। রঙ্গনাথ ভাবল, তার আগেই ঘোষণা করে দেওয়া উচিত ছিল যে, শহর থেকে এইমাত্র একটা ট্রাক ছুটেছে, সকলে নিজের নিজের গোরুমোষ আর শিশুদের ঘরে আটকে রাখো।

ড্রাইভার এবার জিজ্ঞাসা করল, "বলুন বাবু, কী খবর? অনেক দিন পর গ্রামের দিকে যাচ্ছেন?"

রঙ্গনাথ মৃদু হেসে শিষ্টাচারের এই চেষ্টাটাকে উৎসাহ দিল। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, "বাবু, আজকাল কী করছেন?"

"ঘাস কাটছি।"

ড্রাইভার হাসল। বছর দশেক বয়েসের একটা উলঙ্গ ছেলে দুর্ঘটনায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। কিন্তু বেঁচে গেলেও একটা কালভার্টের ওপর টিকটিকির মতো পড়ে গেল। ড্রাইভার এতে

এতটুকুও বিচলিত হ'ল না। অ্যাকসিলারেটর চেপে হাসতে হাসতে বলল, "কী কথাই না বললেন! একটু খুলে বলুন।"

"বললাম তো ঘাস কাটছি। ইংরেজীতে একে রিসার্চ বলে। গতবছর এম. এ. পাস করেছি। এ বছর রিসার্চ শুরু করেছি।"

ড্রাইভার যেন অলিফ লায়লার গল্প শুনছে, মৃদু হেসে বলল, "আর বাবু, শিবপালগঞ্জ কী করতে যাচ্ছেন?"

"ওখানে আমার মামা থাকেন। আমার অসুখ হয়েছিল। কিছুদিন গ্রামে থেকে শরীরটাকে সারাব।"

ড্রাইভার এবার অনেকক্ষণ ধরে হাসল। তারপর বলল, "কী গল্পই না বানালেন বাবু!"

রঙ্গনাথ ড্রাইভারের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এর মধ্যে গল্প বানানোর কী দেখলে?"

ড্রাইভার রঙ্গনাথের এই সরলতায় হেসে গড়িয়ে পড়ল। আগের মতোই হাসতে হাসতে বলল, "কী আর বলব! আচ্ছা, ছেড়ে দিন ও কথা। এখন বলুন, মিত্তলসাহেবের কী খবর? কী হ'ল ঐ খুনের মামলার?"

রঙ্গনাথের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। শুকনো গলায় সে বলল, "আমি কী করে জানব, কে মিত্তলসাহেব।"

ড্রাইভারের হাসি থেমে গেল। ট্রাকের গতিও কিছু কমে এল। রঙ্গনাথের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, "মিত্তলসাহেবকে আপনি চেনেন না?"

"না।"

"জৈনসাহেবকে?"

"না।"

ড্রাইভার জানালা দিয়ে বাইরে থুতু ফেলে স্পষ্ট স্বরে প্রশ্ন করল, "আপনি সি. আই. ডি.তে কাজ করেন না?"

রঙ্গনাথ কড়া স্বরে বলল, "সি. আই. ডি.? সে আবার কী জিনিস?"

ড্রাইভার জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে সামনের রাস্তার দৃশ্য দেখতে লাগল। কতকগুলো গোরুর গাড়ি যাচ্ছিল। যেখানেই সুযোগ পাবে সেখানেই পা ছড়িয়ে দেবে— এই প্রচলিত রীতি অনুসারে গাড়োয়ানেরা গোরুর গাড়ির ওপর হাত দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে ছিল। গোরুগুলো তাদের কর্মকুশলতার বলে নয়, অভ্যাসের বশে নির্বিকার-ভাবে রাস্তা দিয়ে গাড়িগুলো টেনে নিয়ে চলেছে। এ-ও সেই জনতা আর জনার্দনের গল্প, কিন্তু রঙ্গনাথের কিছু বলার সাহস হ'ল না। সি. আই. ডি.র কথায় সে চটে আছে। ড্রাইভার প্রথমে রবারের হর্নটা বাজাল। তারপর এমন একটা হর্ন বাজাল, যা সংগীতের আরোহ-অবরোহ সত্ত্বেও অত্যন্ত ভীতিপ্রদ মনে হ'ল। কিন্তু গাড়িগুলো রাস্তা দিয়ে চলতেই থাকল। ড্রাইভার বেশ জোরেই ট্রাক চালাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, গোরুর গাড়িগুলোর ওপর দিয়েই ট্রাকটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু গাড়িগুলোর কাছে আসতেই তার বোধহয় হঠাৎ খেয়াল হ'ল যে, সে ট্রাক চালাচ্ছে, হেলিকপ্টার নয়। সে পুরো ব্রেক কষল। প্যানেলের সঙ্গে আটকানো কাঠটাকে নিচে ফেলে দিয়ে গিয়ারটা বদলাল। তারপর গোরুর গাড়িগুলোর গা ঘেঁষে তাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে ঘৃণাভরে রঙ্গনাথকে বলল, "সি. আই. ডি. নও তো তুমি এই খদ্দর পরেছ কেন?"

রঙ্গনাথ এই আক্রমণে প্রথমে হকচকিয়ে গেল। পরে এটাকে সে

একটা সাধারণ কৌতূহল মনে করে সরলভাবে জবাব দিল, "খদ্দর তো আজকাল সবাই পরে।"

"কিন্তু যাদের বুদ্ধি আছে তারা পরে না।" ড্রাইভার আর-একবার জানলা দিয়ে বাইরে থুতু ফেলে গিয়ারটাকে টপে উঠিয়ে দিল।

ট্রাকটার পেছনে অনেকক্ষণ ধরে একটা হর্ন বাজছে। রঙ্গনাথ তা শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু ড্রাইভার না শোনার ভান করছে। কিছুক্ষণ পরে ক্লিনার পেছন থেকে ঝুলে পড়ে ড্রাইভারের কানের কাছে জানলার ওপর খট্‌খট্‌ শব্দ করতে লাগল। ড্রাইভার ট্রাকের গতিবেগ কমিয়ে দিয়ে ট্রাকটাকে রাস্তার বাঁ দিকে নিয়ে এল।

হর্নের আওয়াজ একটা স্টেশন ওয়াগন থেকে আসছিল। স্টেশন ওয়াগনটা ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আস্তে হয়ে গেল। তারপর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা একটা খাকী হাত ইশারা করে ট্রাকটাকে থামতে বলল। দুটো গাড়িই থেমে গেল।

স্টেশন ওয়াগন থেকে অফিসারের মতো এক চাপরাসী আর চাপরাসীর মতো এক অফিসার নামল। খাকী পোশাক পরা দুজন সেপাইও নামল। তারা নেমেই মারাঠা দস্যুদের মতো লুঠপাট শুরু করে দিল। কেউ ড্রাইভারের ড্রাইভিং লাইসেন্স কেড়ে নিল, কেউ কেড়ে নিল তার রেজিস্ট্রেশন কার্ড, কেউ ব্যাকভিউ মিররটা নাড়াতে লাগল, কেউ ট্রাকের হর্নটা বাজাতে লাগল, আবার কেউ ব্রেকটা দেখতে লাগল। তারা ফুটবোর্ড নাড়িয়ে দেখল, আলোগুলো জ্বালাল, পেছনে টুং টুং করে যে ঘণ্টাটা বাজে সেটা বাজাল। তারা যা-কিছু দেখল, খারাপ পাওয়া গেল; যা-কিছু ছুঁল তার মধ্যে গণ্ডগোল দেখা গেল। এইভাবে ঐ চারজন চারমিনিটের মধ্যে প্রায়

চল্লিশটা দোষ বার করল। তারপর একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে শত্রুর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা যেতে পারে তা-ই নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল।

রঙ্গনাথ অন্য একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। ওদিকে ড্রাইভার আর চেকিংয়ের লোকদের মধ্যে ট্রাকটার এক-একটা জিনিস নিয়ে বাদবিতণ্ডা চলছে। দেখতে দেখতে বাদবিতণ্ডা ট্রাকের বিষয় থেকে সরে গিয়ে দেশের সাধারণ অবস্থা আর আর্থিক দুরবস্থার ওপর এসে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের মধ্যে ছোটো ছোটো উপসমিতি তৈরি হ'ল। তারাও এক-একটা গাছের তলায় আলাদা আলাদা ভাবে এক-এক বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞের মতো আলোচনা আরম্ভ করে দিল। অনেক তর্কবিতর্কের পর একটা গাছের তলায় প্রকাশ্য অধিবেশন গোছের একটা অধিবেশন শুরু হ'ল। একটু পরেই জানা গেল, আলোচনা এবার শেষ হবার মুখে।

শেষে রঙ্গনাথ শুনতে পেল, অফিসারটি বলছে, "কী অশফাক মিঞা, কী রায় তোমার? মাফ করে দেব?"

চাপরাসী বলল, "তা ছাড়া আর কী বলতে পারি হুজুর? কত আর চালান করবেন! এক-আধটা গণ্ডগোল হলে না-হয় চালান করা যেত।"

এটা-ওটা বলার পর অফিসার বলল, "আচ্ছা, যাও বণ্টা সিং, তোমাকে মাফ করে দিলাম।"

ড্রাইভার খোশামোদের সুরে বলল, "এমন কাজ একমাত্র হুজুরই করতে পারেন।"

অফিসার অনেকক্ষণ থেকে অন্য গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা রঙ্গনাথকে দেখছিল। এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে সে রঙ্গনাথের

কাছে এল। এসে জিজ্ঞাসা করল, "আপনিও এই ট্রাকে যাচ্ছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনার কাছ থেকে এ ভাড়া নেয় নি তো?"

"আজ্ঞে না।"

অফিসার বলল, "সে আমি আপনার পোশাক দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। তবু জিজ্ঞাসা করা আমার কর্তব্য।"

রঙ্গনাথ অফিসারকে রাগানোর জন্য বলল, "এটা থোড়াই আসল খাদি। এটা মিলের খাদি।"

অফিসার সগর্বে বলল, "আরে মশায়, খাদি খাদি। এর মধ্যে আসল-নকল কী?"

অফিসার চলে যাবার পর ড্রাইভার বলল, "দুটো টাকা বার করুন তো।"

রঙ্গনাথ মুখ ঘুরিয়ে কড়া সুরে জবাব দিল, "কী মতলব তোমার? আমি কেন টাকা দেব?"

ড্রাইভার চাপরাসীর হাত ধরে বলল, "আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।" যেতে যেতে রঙ্গনাথকে উদ্দেশ করে বলল, "তোমার জন্যই আমার চেকিং হ'ল, আর তুমি বিপদের সময় আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলছ? এই তোমার শিক্ষা?"

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি রাস্তায় পড়ে থাকা কুকুর। যে কেউ তাকে লাথি মারতে পারে। ড্রাইভারও রাস্তা চলতে চলতে তার ওপর একটা লাথি মেরে চাপরাসীর সঙ্গে ট্রাকটার দিকে চলে গেল। রঙ্গনাথ দেখল, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তার অ্যাটাচি ট্রাকেই রাখা আছে। শিবপালগঞ্জ এখনও পাঁচ মাইল। রঙ্গনাথ ধীরে ধীরে

ট্রাকের কাছে এল। ওদিকে স্টেশন ওয়াগনের ড্রাইভার হর্ন বাজিয়ে চাপরাসীকে ডেকে চলছিল। রঙ্গনাথ ত্বটো টাকা ড্রাইভারকে দিতে গেল। ড্রাইভার বলল, "এখন দিচ্ছই যখন তো আরদালী সাহেব-কেই দাও। আমি তোমার টাকা নিয়ে কী করব?"

বলতে বলতে তার গলার স্বরে সেইসব সন্ন্যাসীর ভাব এসে গেল, যাঁরা হাত দিয়ে পয়সা ছোঁন না; অন্যদের বলেন, পয়সা হচ্ছে হাতের ময়লা। চাপরাসী টাকা ত্বটো পকেটে রেখে বিড়ির শেষ টানটা টেনে তার আধ-পোড়া টুকরোটা একরকম রঙ্গনাথের পায়জামার ওপরই ছুঁড়ে মারল। তারপর স্টেশন ওয়াগনের দিকে এগিয়ে গেল। চাপরাসী চলে যেতে ড্রাইভারও তার ট্রাক চালিয়ে দিল। রঙ্গনাথকে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেবার জন্য গিয়ারটা টপে ওঠাল।

একটু পরেই সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে দেখা গেল, রাস্তার ত্ব-ধারে কতকগুলো পোঁটলার মতো কী-সব পড়ে আছে। কাছে আসতে দেখা গেল, অনেকগুলো রমণী, সার বেঁধে বসে আছে। তারা নিশ্চিন্তমনে গল্পগুজব করতে করতে হাওয়া খাচ্ছে। রাস্তার নিচে রয়েছে নোংরা আবর্জনার স্তূপ। তার ত্বর্গন্ধের ভারে সন্ধ্যার বাতাস যেন কোনো গর্ভবতী রমণীর মতো শিথিল ভঙ্গিতে বয়ে চলেছে। কিছুটা দূরে কুকুর ডেকে উঠল। চোখের সামনে দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেসে যাচ্ছে। বোঝা গেল, তারা একটা গ্রামের কাছাকাছি এসে গেছে। এই সেই শিবপালগঞ্জ।

দুই

শিবপালগঞ্জ থানায় একজন লোক হাত জোড় করে দারোগাকে বলল, "আজ-কাল করে করে কয়েক মাস হয়ে গেল। এবার হুজুর, আমাকে চালান করতে আর দেরি করবেন না।"

মধ্যযুগে হয়তো কোনো সিংহাসন ছিল, ক্ষয়ে-বয়ে এখন তা একটা আরামকেদারায় পরিণত হয়েছে। দারোগাবাবু তার ওপর বসেও ছিলেন, শুয়েও ছিলেন। লোকটার নিবেদন শুনে মাথা তুলে তিনি বললেন, "চালান হয়ে যাবে। ব্যস্ত কী? কোনো বিপদ তো আসছে না।"

লোকটা আরামকেদারার পাশে একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মোড়ার ওপর বসে পড়ল। তারপর বলল, "আমার বিপদ নেই, কিন্তু আপনি চালান করে দিলেই ঝঞ্ঝাট মিটে যায়।"

দারোগাবাবু অস্পষ্ট স্বরে কাকে যেন গালাগালি দিতে শুরু করলেন। একটু পরেই তাঁর মনে হ'ল, কাজের চোটে তিনি নিশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছেন না। এত কাজ যে, অপরাধগুলো বিচার করে দেখা হচ্ছে না, মকদ্দমাগুলো চালান করা যাচ্ছে না, আদালতে সাক্ষী দেওয়া হচ্ছে না। এত কাজ যে, সব কাজই থেমে আছে।

মোড়াটা আরামকেদারার দিকে এগিয়ে এল। লোকটা বলল,

"হুজুর, শত্রুরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে, শিবপালগঞ্জে দিনে দুপুরে জুয়া চলে। ক্যাপ্টেনের কাছে বেনামা নালিশও চলে গেছে. তা ছাড়া সমঝোতার বছরে একবার চালান করারই কথা। এবছর চালান করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখনই যদি চালান হয়ে যায় তো লোকের নালিশও বন্ধ হয়ে যাবে।"

কেবল আরামকেদারাই নয়, থানার সব-কিছুই যেন মধ্যযুগের। তক্তপোশ, তার ওপরকার ছেঁড়া শতরঞ্জি, কলমদান, শুকিয়ে যাওয়া কালির দোয়াত, ধুলোময়লায় ভর্তি কোণামোড়া রেজিস্টার— সব-কিছুই যেন কয়েক শতাব্দীর পুরনো।

এখানে বসে কেউ যদি চারদিকে নজর বোলায় তা হলে তার মনে হবে, ইতিহাসের কোনো এক কোণে সে দাঁড়িয়ে আছে। এই থানা এখনও ফাউন্টেন পেনের মুখ দেখে নি। এখানে এখনও টেলিফোন আসে নি। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কয়েকটা প্রাচীন রাইফেল আছে, যা হয়তো সেই সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ব্যবহার করা হয়েছিল। সেপাইদের সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য আছে বাঁশের লাঠি। এই লাঠি সম্বন্ধে এক কবি বলেছিলেন, নদীনালা পার হতে আর হঠাৎ করে কুকুর মারতে এই লাঠির উপযোগিতা প্রমাণ হয়েছে। এখানে এখনও জীপের শব্দ শোনা যায় নি। এখানে জীপের কাজ করে, শের শাহ্‌র আমলেও যেমন করত, ঘোড়া নামে এক সওয়ারী। দু-তিন জন চৌকিদারের স্নেহচ্ছায়ায় তারা প্রতিপালিত হয়।

যদি কেউ থানার ভেতর আসে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হবে, কেউ বোধ হয় তাকে কয়েকশো বছর পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

যদি তার মার্কিন গোয়েন্দা উপন্যাস পড়া থাকে তা হলে সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে চাইবে, আঙুলের ছাপ দেখার কাচ, ক্যামেরা, ওয়্যারলেস লাগানো গাড়ি— এ-সব কোথায়? এ-সবের বদলে যা সে দেখতে পাবে তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। সেইসঙ্গে আরও দেখতে পাবে, সামনে তেঁতুলগাছের তলায় লেংটিপরা একটা লোক বসে বসে ভাং ঘুটছে। পরে জানতে পারবে যে, ঐ একটা লোক কুড়িটা গ্রামের নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত রয়েছে, এবং যে যে-অবস্থায় যেখানে থাকে সেই অবস্থায় সেখান থেকেই কুড়িটা গ্রামে অপরাধ ঠেকাতে পারে। যদি অপরাধ হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে তার সন্ধান করতে পারে। আর যদি অপরাধ না হয়ে থাকে তা হলে তা হওয়াতে পারে। ক্যামেরা, কাচ, কুকুর, ওয়্যারলেস— কোনো-কিচ্ছুরই তার দরকার হয় না। এইভাবে থানার পরিবেশ খুবই রমণীয় আর প্রাচীনকালের গৌরবানুসারী হয়ে আছে।

দারোগাবাবু আর থানার দশ-বারোজন সেপাইয়ের ওপর লোকের অনেক আশাভরসা। আড়াই-তিনশো গ্রামের এই থানায় যদি আট মাইল দূরের কোনা গ্রামে চুরি হয় তা হলে এটা নিশ্চিত যে, ঐ দশ-বারোজন সেপাইয়ের মধ্যে কেউ-না-কেউ তা দেখেই ফেলবে। বারো মাইল দূরে রাত্রিবেলায় যদি ডাকাত পড়ে তা হলে তারা যে ডাকাতদের আগেই সেখানে পৌঁছে যাবে, এমন আশা তাদের কাছে করা যায়। আর সেইজন্যই কোনো গ্রামে দুটো-একটা বন্দুক ছাড়া আর অস্ত্র দেওয়া হয় নি। অস্ত্র দেবার ভয় ছিল এই যে, গ্রামের অসভ্য আর বর্বর লোকেরা বন্দুক চালানো শিখে ফেলবে, আর তার ফলে একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করবে, রক্তনদী বইতে থাকবে। ডাকাতদের হাত থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করার ভারটা

দারোগাবাবু আর তাঁর দশ-বারোজন লোকের জাদুবিদ্যার ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তাঁরা খুনের ব্যাপারেই তাঁদের জাদুবিদ্যার সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব দেখাবেন বলে লোকে আশা করে। কারণ, তাঁরা মনে করে, এই তিনশো গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে কার প্রতি কার বিদ্বেষ আছে, কার প্রতি কার শত্রুতা আছে, কে কাকে কাঁচাই চিবিয়ে খেতে চায়— তার পুরো খবর তাঁরা রাখবেন, আর আগে থেকেই এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে কেউ কাউকে মারতে না পারে। যদি কেউ কাউকে মেরেও ফেলে তা হলে তাঁরা বাতাসের মতো ছুটে গিয়ে হত্যাকারীকে ধরে ফেলবেন, মৃতদেহটা দখল করে নেবেন, আর তার রক্তে-ভেজা মাটি হাঁড়িতে ভরে তার মৃত্যুদৃশ্য দেখেছে যারা তাদের দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেবেন, যাতে মহাভারতের সঞ্জয়ের মতো তারা আদালতে সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিতে পারে। সংক্ষেপে, দারোগাবাবু আর তাঁর সেপাইদের এখানে মানুষ নয়, আলাদীনের প্রদীপ থেকে বার হওয়া দৈত্য বলে মনে করা হয়। তাঁদের ঐভাবে রেখেই ইংরেজরা 1947 সালে দেশে ফিরে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে লোক বুঝতে শুরু করেছে যে, তাঁরা দৈত্য নন, মানুষ— আর এমন মানুষ যে, তাঁরাই দৈত্য বার হবার আশায় দিনরাত প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন।

শিবপালগঞ্জের জুয়াড়ীসঙ্ঘের ম্যানেজিং ডিরেক্টর চলে যাবার পর দারোগাবাবু একবার মাথা উঠিয়ে চারদিকে তাকালেন। সবদিকই শান্ত। তেঁতুলগাছের তলায় লেংটি পরা যে সেপাইটা এতক্ষণ ভাং ঘুটছিল সে এখন কাছের এক শিবলিঙ্গে ভাং নিবেদন করছে।

একজন চৌকিদার ঘোড়ার পিঠে খর্‌রা চালাচ্ছে। হাজতের ভেতর বসে একজন ডাকাত জোরে জোরে হনুমান-চালিশা পড়ছে। বাইরে ফটকে ডিউটি দিচ্ছে যে সেপাইটা, একটা থামে হেলান দিয়ে সে ঘুমোচ্ছে— নিশ্চয় রাত্রে জেগে জেগে পাহারা দেবে বলে।

দারোগাবাবু একটুখানি ঘুমিয়ে নেবেন বলে চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দেখতে পেলেন রুপ্পনবাবু আসছেন। তিনি বিড় বিড় করে উঠলেন, চোখের পাতা বোজার ফুরসুৎ নেই। রুপ্পনবাবু আসতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং "বিনম্রতাসপ্তাহ" অনেক দিন আগে পার হয়ে গেলেও তিনি বিনম্র-ভাবে তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন। রুপ্পনবাবু বসতে বসতে বললেন, "রামাধীনের ওখানে লাল কালিতে লেখা একটা চিঠি এসেছে। ডাকাতরা পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছে। লিখেছে, অমাবস্যার রাত্রে দক্ষিণ দিককার টিলার ওপর··· ।"

দারোগাবাবু মৃদু হেসে বললেন, "এ তো মশায় বাড়াবাড়ি। কোথায় আগে ডাকাতরা নদীপাহাড় পার হয়ে বাড়ি আসত টাকা নিতে, আর এখন তারা চাইছে তাদেরই বাড়িতে গিয়ে টাকা দিয়ে আসতে হবে!"

রুপ্পনবাবু বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তা-ই তো দেখছি। ডাকাতি নয় ঘুষ।"

দারোগাবাবুও সেইভাবে বললেন, "ঘুষ চুরি, ডাকাতি—এখন তো সব এক হয়ে গেছে। পুরো সাম্যবাদ।"

রুপ্পনবাবু বললেন, "বাবাও এই কথা বলেন।"

"কী বলেন তিনি?"

"এই যে, পুরো সাম্যবাদ চলছে।"

দুজনেই হাসলেন। রুপ্পনবাবু বললেন, "না, আমি ঠাট্টা করছি না। রামাধীনের ওখানে সত্যিই ঐরকম একটা চিঠি এসেছে। আর সেইজন্যই বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বলছেন, রামাধীন আমার বিরোধী হলেও তার ওপর যেন এইভাবে অত্যাচার করা না হয়।"

"খুব ভালো কথা বলছেন। যাকেই বলতে বলবেন, বলে দেব।"

রুপ্পনবাবু তাঁর কোটরে বসা চোখদুটো কুঁচকে দারোগাবাবুর দিকে তাকালেন। দারোগাবাবুও ঘুরে তাঁর দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসলেন। বললেন, "ঘাবড়াবেন না, আমি যখন এখানে আছি তখন ডাকাত পড়বে না।"

রুপ্পনবাবু আস্তে করে বললেন, "সে তো আমি জানি। চিঠিটা জাল। আপনার সেপাইদেরও একটু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। হয়তো তাদের মধ্যেই কেউ লিখে পাঠিয়েছে।"

"এমন হতেই পারে না। আমার সেপাইরা লিখতে জানে না। এক-আধজন আছে, কেবল নাম সই করতে পারে।"

রুপ্পনবাবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, দারোগাবাবু তার আগেই বলে উঠলেন, "তাড়াহুড়োর কী আছে? আগে রামাধীনকে রিপোর্ট লেখাতে দিন। চিঠি তো সবে এসেছে।"

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলেন। তারপর দারোগাবাবু কী ভেবে বললেন, "সত্যি কথা জিজ্ঞাসা করুন তো বলি, আমার মনে হচ্ছে, এর সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের সম্বন্ধ আছে।"

"কী রকম?"

"শিক্ষা বিভাগ কী— আপনার কলেজ বলেই মনে হচ্ছে।"

রুপ্পনবাবু কথাটা ভালোভাবে নিলেন না। বললেন, "আপনি তো আমার কলেজের পেছনে লেগেই আছেন।"

"আমার মনে হচ্ছে, আপনার কলেজেরই কোনো ছেলে রামাধীনের বাড়ি এই চিঠি পাঠিয়েছে। আপনার কী মনে হয়?"

"আপনাদের চোখে তো সমস্ত অপরাধ স্কুলের ছেলেরাই করে।" রুপ্পনবাবু ভৎর্সনার সুরে বললেন, "আপনাদের সামনে যদি কেউ বিষ খেয়ে মরে তা হলে তাকেও আপনারা আত্মহত্যা বলবেন না। বলবেন যে, কোনো ছাত্র তাকে বিষ দিয়েছে।"

"আপনি ঠিকই বলছেন রুপ্পনবাবু, দরকার হলে আমি তা-ই বলব। আমি বখতাওয়ারসিংহের চেলা, আপনি বোধ হয় তা জানেন না।"

এরপর সরকারী কর্মচারীদের প্রসঙ্গে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল— আগে তারা কেমন ছিল আর এখন কেমন হয়েছে। ঐ বখতাওয়ার-সিংহের কথা চাপা পড়ে গেল।

রুপ্পনবাবুর বয়েস আঠারো বছর। তিনি এখানকারই কলেজে দশম শ্রেণীতে পড়েন। পড়তে তাঁর খুব ভালো লাগে। তাই গত তিন বছর যাবৎ তিনি ঐ শ্রেণীতেই পড়ছেন।

রুপ্পনবাবু একজন স্থানীয় নেতা। ভারতে নেতা হবার জন্য আগে রোদ্দুরে চুল সাদা করতে হয় বলে যে কথা আছে, তাঁর ব্যক্তিত্ব সেই কথাটা মিথ্যা প্রমাণ করছে। তাঁর নেতা হবার সবচেয়ে বড়ো গুণ এই যে, তিনি সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। থানার দারোগা আর হাজতের চোর— তাঁর চোখে দুই-ই সমান। সেই রকম পরীক্ষায় নকল-করা ছাত্র আর কলেজের প্রিন্সিপালও তাঁর চোখে সমান।

তিনি সবাইকে দয়াদ্র্র চিত্তে দেখেন। সবার কাজ করেন, সবার কাছ থেকে কাজ নেন। তাঁর এত সম্মান যে, পুঁজিবাদের প্রতীক দোকানদার তাঁর কাছে কোনো জিনিস বিক্রি করে না, অর্পণ করে ; আর শোষণের প্রতীক এক্কাওয়ালা তাঁকে শহরে পোঁছে দিয়ে তাঁর কাছে ভাড়া নয়, আশীর্বাদ চায়। তাঁর নেতৃত্বের একমাত্র ক্ষেত্র এখানকার কলেজ। সেখাতে তাঁর ইঙ্গিতে শত শত ছাত্র তিলকে তাল করতে পারে আর দরকার হলে তা নিয়ে হাঙ্গামাও বাধাতে পারে।

তিনি জন্ম-নেতা, কারণ তাঁর বাবাও একজন নেতা। তাঁর বাবার নাম বৈদ্যজী।

তিন

দুটো বড়ো আর দুটো ছোটো কামরার একটা ডাকবাংলো ছিল এটা। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এটাকে ছেড়ে দিয়েছে। এর তিনদিকে কাঁচা দেয়ালের ওপর ছাউনি ফেলে কয়েকটা আস্তাবল তৈরি করা হয়েছে। আস্তাবলগুলো থেকে কিছুটা দূরে পাকা ইঁটের দেয়ালের ওপর টিন দিয়ে একটা দোকান মতো খোলা হয়েছে। তার একদিকে রেলের ফটকের ধারে যেমন গুমটি থাকে তেমনি এক কামরার একটা গুমটি আছে। অন্যদিকে একটা বিশাল বটগাছের নিচে কবরের মতো

একটা চাতাল। আস্তাবলগুলোর ধারে একটা নতুন ঢঙের বাড়ি। তার গায়ে লেখা, "সামুদায়িক মিলনকেন্দ্র, শিবপালগঞ্জ।" এ-সবের পেছন দিকে তিন-চার একরের একটা পতিত জমিতে এখন লাঙল দিয়ে ঘাস বোনা হয়েছে। কোথাও কোথাও সত্যিসত্যিই কয়েকটা করে ঘাস বেরিয়েছে।

এই ইমারতগুলো নিয়ে "ছঙ্গামল বিদ্যালয় ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, শিবপালগঞ্জ।"

ছঙ্গামল এক সময় জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। সেই সময় তিনি একটা কাল্পনিক প্রস্তাব লিখিয়ে নিয়ে বোর্ডের এই ডাকবাংলোয় কলেজের ব্যবস্থাপক সমিতির নাম লিখে দিয়েছিলেন। এই কলেজে তখন ব্যবস্থাপক সমিতি ছাড়া আর কিছু ছিল না। লেখার শর্ত অনুসারে কলেজটার নাম হয়ে গেল ছঙ্গামল বিদ্যালয়।

বিদ্যালয়ের এক-একটা অংশের আলাদা আলাদা ইতিহাস আছে। সামুদায়িক মিলনকেন্দ্র গ্রামসভার নামে নেওয়া সরকারী টাকায় তৈরি। তবু তার মধ্যে প্রিন্সিপালের অফিস আর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পড়াশোনা। আস্তাবলের মতো ইমারতগুলো শ্রমদানে তৈরি। টিনের শেডগুলো কোনো ফৌজী ছাউনির ভগ্নাবশেষ, রাতারাতি তুলে এনে বসানো হয়েছে। চাষ করা পতিত জমিটা কৃষিবিজ্ঞান শেখানোর কাজে লাগে। জমিটাতে জায়গায় জায়গায় যে জোয়ার উঠেছে তা প্রিন্সিপালের মোষের কাজে লাগে।

সায়েন্সের ক্লাস চলছে। নবম শ্রেণী। মাস্টার মোতিরাম এক রকম বি. এস্-সি. পাস। ছেলেদের তিনি আপেক্ষিক ঘনত্ব পড়াচ্ছেন। বাইরে এই ক্ষুদ্র গ্রামে সব ব্যাপারেই ক্ষুদ্রতা। রাস্তা দিয়ে আখ

বোঝাই গোরুর গাড়ি যাচ্ছে চিনির কলের দিকে। জনকয়েক রোগা লিকলিকে ছেলে পেছন থেকে আখ টেনে নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। সামনে বসা গাড়োয়ান টেনে টেনে তাদের গালাগাল দিচ্ছে। গালাগাল আর পালটা গালাগাল পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চড়ছে আর জানলা দিয়ে ক্লাসের ভেতর ঢুকে আবহসংগীতের কাজ করছে। ছেলেরা নাটক উপভোগ করছে, সায়েন্স পড়ছে।

একটা ছেলে বলে উঠল, "মাস্টারমশায়, আপেক্ষিক ঘনত্ব কাকে বলে ?"

মাস্টার মোতিরাম বললেন, "আপেক্ষিক ঘনত্ব মানে রিলেটিভ ডেন্সিটি।"

অন্য একটা ছেলে বলল, "এই দেখুন, আপনি এখন ইংরেজী পড়াতে আরম্ভ করেছেন, সায়েন্স নয়।"

তিনি বললেন, "শালা সায়েন্স ইংরেজী ছাড়া আসবে কী করে ?"

ছেলেরা হাসতে শুরু করে দিল। হাসির কারণ হিন্দী-ইংরেজীর বিবাদ নয়, "শালা" কথাটা অভ্যাসবশে বেরিয়ে গেছে।

তিনি বললেন, "এটা হাসির কথা নয়।"

ছেলেরা শুনল না, তারা আরও জোরে হেসে উঠল। এতে মাস্টার মোতিরাম নিজেই তাদের সঙ্গে হাসতে লাগলেন। ছেলেরা চুপ করে গেল।

মোতিরাম ছেলেদের মাপ করে দিলেন। বললেন, "রিলেটিভ ডেন্সিটি যখন বোঝো না তখন অন্যভাবে বোঝো আপেক্ষিক ঘনত্ব কী। আপেক্ষিক মানে কারও তুলনায়। মনে করো, তুমি একটা আটার চাকি খুলেছ আর তোমার পাশেই তোমার প্রতিবেশীও একটা আটার চাকি বসিয়েছে। তুমি তোমার চাকি থেকে মাসে

পাঁচশো টাকা আয় করো আর তোমার প্রতিবেশী করে চারশো টাকা, তা হলে তার তুলনায় তোমার বেশি লাভ হয়। একেই সায়েন্সের ভাষায় বলতে পারি, তোমার আপেক্ষিক লাভ বেশি। বুঝেছ?"

একটি ছেলে বলল, "বুঝলাম তো মাস্টারমশায়, কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ রয়ে গেল। এই গ্রামে আটার চাকি থেকে কেউই মাসে পাঁচশো টাকা আয় করতে পারে না।"

মাস্টার মোতিরাম টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন, "কেন পারে না? যার করার ক্ষমতা আছে সে কী না করতে পারে।"

ছেলেটা এই কথা থেকে অন্য কথায় না গিয়ে বলল, "কিছুই করতে পারে না। আমার কাকার চাকি দিনরাত চলে, কিন্তু খুব বেশি হলে মাসে দুশো টাকা আয় হয়।"

"কে তোমার কাকা?" মাস্টার মোতিরামের গলার স্বর কেঁপে উঠল। তিনি গভীর দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ঐ বেইমান মুন্নুর ভাইপো নাকি?"

ছেলেটা তার অহংকার গোপন করার চেষ্টা করল না। বেপরোয়া ভাবে বলল, "হ্যাঁ, তা-ই!"

বেইমান মুন্নু খুব সম্মানিত লোক। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, গোলাপকে যে নামেই ডাকো, সে সমানভাবেই গন্ধ বিলোবে— যদিও ইংরেজের দেশের গোলাপে বিশেষ গন্ধ নেই। সেইরকম বেইমান মুন্নুকে যে নামেই ডাকা হোক, তিনি অবিচলভাবে আটার চাকি চালিয়ে যান আর টাকা উপায় করেন। তিনি সম্মানিত ব্যক্তি। বেইমান মুন্নু নামটা তাঁর নিজের অর্জন করা নয়, এ নাম তাঁর মা-বাবার দেওয়া। ছেলেবেলায় তাঁর বাবা তাঁকে আদর করে বেইমান বলে ডাকতেন আর তাঁর মা তাঁকে আদর করে বলতেন

মুন্নু। এখন সারা গ্রামের লোক তাঁকে আদর করে বেইমান মুন্নু বলে ডাকে।

মাস্টার মোতিরাম কিছুক্ষণ বেইমান মুন্নুর ভাইপোর দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "যেতে দাও।"

এবার তিনি খোলা বইয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। দৃষ্টি যখন ওঠালেন, দেখলেন, ছেলেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ব্যাপার?"

একটি ছেলে বলল, "তা হলে এই সিদ্ধান্ত হ'ল যে, আটার চাকি থেকে মাসে পাঁচশো টাকা আয় করা যায় না?"

"কে বলল?" মাস্টারমশায় বললেন, "আমি নিজে এক মাসে সাতশো টাকা পর্যন্ত আয় করেছি। কিন্তু বেইমান মুন্নুর জন্য সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

বেইমান মুন্নুর ভাইপো ভদ্রভাবেই বলল, "এর জন্য দুঃখ কেন মাস্টারমশায়! এটা তো ব্যাবসা। কখনও চিত, কখনও উপুড়। কম্পিটিশনে এ-রকম হয়েই থাকে।"

"সৎ আর বেইমানের মধ্যে কম্পিটিশন কী? কী বকবক করছ?" মাস্টার মোতিরাম ধমকের সুরে বললেন।

একটি ছেলে বলল, "খুব খারাপ কথা।"

মাস্টার মোতিরাম চমকে উঠে ক্লাসের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কে বলল এ-কথা?"

একটি ছেলে তার জায়গা থেকে হাত তুলে বলল, "আমি মাস্টারমশায়! আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে, আপেক্ষিক ঘনত্ব বার করার নিয়ম কী?"

মাস্টার মোতিরাম বললেন, "আপেক্ষিক ঘনত্ব বার করার জন্য ঐ জিনিসটার ওজন আর আয়তন অর্থাৎ ভল্যুম জানতে হবে— তারপর আপেক্ষিক ঘনত্ব বার করার নিয়ম জানতে হবে। নিয়মের কথা বলতে গেলে, প্রত্যেক জিনিসেরই ছটো নিয়ম আছে —একটা ঠিক নিয়ম, আর একটা ভুল নিয়ম। ঠিক নিয়মে ঠিক ফল পাওয়া যায়, আর ভুল নিয়মে ভুল ফল। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। মনে করো, তুমি একটা আটার চাকি বসিয়েছ। মেশিনটা বেশ নতুন। খুব পরিষ্কার রেখেছ, ভালো করে গ্রিজ লাগিয়েছ। ইঞ্জিনও নতুন, পাটাও নতুন। সব-কিছুই আছে, কিন্তু বিদ্যুৎ নেই। তা হলে কী হবে ?"

আগের ছেলেটা বলল, "তা হলে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহার করতে হবে। মুন্নুকাকা করেছিলেন।"

মাস্টার মোতিরাম বললেন, "এখানে একা মুন্নুকাকাই বুদ্ধিমান নন। এই গ্রামে ডিজেল ইঞ্জিন সবচেয়ে আগে কে এনেছে ? কেউ জানো ?"

ছেলেরা সবাই হাত তুলে কোরাসের সুরে বলল, "আপনি ! আপনি এনেছেন !"

মাস্টারমশায় খুশি হয়ে মুন্নুর ভাইপোর দিকে তাকালেন, তারপর তাচ্ছিল্যভরে বললেন, "শুনলে ? বেইমান মুন্নু তো আমার দেখাদেখি ডিজেল ইঞ্জিন চালিয়েছে। কিন্তু আমার চাকি এই কলেজ হবার আগে থেকেই চলছে। এই কলেজের ইমারত তৈরির জন্য প্রত্যেক আটাপেষাই কল থেকে যে এক সের করে আটা নেওয়া হয়েছিল, সে আমারই চাকিতে বসে। আমার চাকি থেকেই সেই আটা বিক্রি করার জন্য শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমার চাকিতেই কলেজের

ইমারতের নকশা তৈরি করা হয়েছিল, আর ম্যানেজারকাকা বলেছিলেন, "মোতি, কলেজে তুমি মাস্টার হিসেবে থাকলেও আসলে তুমিই প্রিন্সিপালি করবে।" সব-কিছু আমার চাকিতেই হয়েছে, আর এখন গ্রামে যদি চাকি থাকে তো সে বেইমান মুন্নুর ? আমার চাকি কিছুই না ?"

ছেলেরা মন দিয়ে শুনছে। এ-কথা তারা আগেও শুনেছে এবং যে-কোনো সময়ে শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। তাদের ওপরে এর বিশেষ প্রভাব পড়ল না। কিন্তু মুন্নুর ভাইপো বলল, "জিনিস তো মাস্টারমশায় আপনারও ভালো, মুন্নুকাকারও ভালো। কিন্তু আপনার চাকিতে ধান কোটার মেশিনটার ওভারহলিং দরকার। ওটাতে ধান বড়ো বেশি ভাঙে।"

মাস্টার মোতিরাম তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বললেন, "কথাটা ঠিক নয়। আমার মতো ধান-কোটা মেশিন এই এলাকাতে আর নেই। আসলে বেইমান মুন্নু কোটা-পেষার রেট কেবল কমিয়েই চলেছে। আর সেইজন্য লোকে ওদিকে ছোটে। প্রত্যেক ভারতীয়েরই এই হাল। যেখানে দু'পয়সা সস্তা সেখানে দৌড়বে।"

"এ তো সব জায়গাতেই হয়।" ছেলেটা তর্ক করল।

"সব জায়গায় নয়, কেবল ভারতবর্ষেই এমনটা হয়। আর…" একটু ভেবে নিয়ে আবার বললেন, "তো রেট কমিয়ে অন্য লোকে লোকসানটা অন্যভাবে— খদ্দেরের আটা চুরি করে— পুষিয়ে নেয়। কিন্তু মাস্টার মোতিরাম যার নাম সে সব-কিছু করতে পারে, কিন্তু ওটা করতে পারে না।"

একটি ছেলে বলল, "তা হলে আপেক্ষিক ঘনত্ব বার করার কী নিয়ম ঠিক হ'ল ?"

তিনি তাড়াতাড়ি করে বললেন, "সেই কথাই তো হচ্ছিল।"

তাঁর দৃষ্টি জানলার বাইরে, রাস্তার ওপর আখের গাড়িগুলো থেকে তিন ফুট ওপরে গিয়ে আরও এগিয়ে দিগন্তে আটকে গিয়েছিল। কয়েকবছর আগে কবিরা যে-রকম চিরন্তন ভাবাবিষ্ট পোজে থাকতেন সেইরকমভাবে তিনি বলতে লাগলেন, "মেশিন সারা অঞ্চলে ঐ একটাই আছে ; লোহার মেশিন, কিন্তু দেখায় কাচের মতো··· ।"

হঠাৎ তিনি দরজার দিকে সোজা তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কী জিজ্ঞাসা করছিলে ?"

ছেলেটা আবার তার প্রশ্ন বলল। কিন্তু তার আগেই তাঁর মন অন্য জায়গায় চলে গেছে। ছেলেরাও কান খাড়া করে শুনল। বাইরে যারা আখ চুরি করছিল আর যারা আখ বাঁচাচ্ছিল তাদের গালাগাল ছাপিয়ে, চাপরাসীর ওপর প্রিন্সিপালের ধমক ছাপিয়ে, মিউজিক ক্লাস থেকে ভেসে আসা হারমোনিয়মের ভ্যাঁ ভ্যাঁ ছাপিয়ে হঠাৎ ভক্ ভক্ শব্দ শোনা গেল। মাস্টার মোতিরামের চাকি চলছে। এটা তারই শব্দ। এটাই আসল শব্দ। অন্নবস্ত্রের জন্য তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, দাঙ্গাহাঙ্গামার চিৎকার— এ-সবের ঊর্ধ্বে সত্যিকারের নেতা যেমন সব-কিছু বাদ দিয়ে কেবল আত্মার শব্দ শুনতে পায়, তেমনি মাস্টার মোতিরামও আর কিছু শুনতে পেলেন না, কেবল শুনতে পেলেন "ভক্-ভক্-ভক্"।

মাস্টার মোতিরাম ক্লাস ছেড়ে দৌড়লেন।

ছেলেরা বলে উঠল, "কী হ'ল মাস্টারমশায় ? এখনও ঘণ্টা পড়ে নি।"

মাস্টার মোতিরাম বললেন, "মনে হচ্ছে, মেশিন ঠিক হয়ে গেছে। দেখি কেমন চলছে।"

দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। সারা মুখে বেদনার ছাপ, যেন কেউ তাঁকে জোরে চিমটি কেটেছে। তিনি বললেন, "বই দেখে পড়ে নিয়ো। আপেক্ষিক ঘনত্বের অধ্যায়টা জরুরি।" তারপর একটা ঢোঁক গিলে বললেন, "ইম্পর্ট্যাণ্ট।" বলার পরই তাঁর মুখটা আবার আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ভক্! ভক্! ভক্! বাইরের জটিল কর্মক্ষেত্র তাঁকে আহ্বান করছে। ছেলের দল আর বইয়ের টান তাঁকে আটকে রাখতে পারল না। তিনি চলে গেলেন।

বেলা চারটের সময় প্রিন্সিপালসাহেব তাঁর ঘর থেকে বেরুলেন। রোগা-পাতলা চেহারা। তার কিছু অংশ খাকী হাফ প্যাণ্ট আর জামায় ঢাকা। বগলে পুলিস সার্জেণ্টের মতো বেত। পায়ে স্যাণ্ডেল। সব মিলিয়ে চেহারাটা বেশ চোস্ত আর চালাক-চতুর। কিন্তু যতটা না তার চেয়ে বেশি তিনি নিজেকে চোস্ত আর চালাক-চতুর মনে করেন।

তাঁর পেছন পেছন, সব সময়কার মতন, কলেজের ক্লার্কও আসছে। তার সঙ্গে প্রিন্সিপালসাহেবের গভীর বন্ধুত্ব।

তাঁরা দুজন মাস্টার মোতিরামের ক্লাসের কাছে এলেন। ক্লাসটা আস্তাবল-সদৃশ ইমারতের ভেতর। দূর থেকেই দেখা গেল, ক্লাসে কোনো মাস্টার নেই। একটা ছেলে পা থেকে উরু পর্যন্ত ছেঁড়া একটা পায়জামা পরে মাস্টারের চেয়ারে বসে বসে কাঁদছিল, প্রিন্সিপালকে কাছে আসতে দেখে আরও জোরে জোরে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। প্রিন্সিপাল জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছে? মাস্টারমশায় কোথায়?"

ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। অন্য একটা ছেলে বলল, "এটা মাস্টার মোতিরামের ক্লাস।"

প্রিন্সিপালকে আর বলার দরকার হ'ল না মাস্টারমশায় কোথায় গেছেন। ক্লার্কটি বলল, "সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মেশিন চব্বিশ ঘণ্টাই দেখা-শোনা করা দরকার। কতবার মাস্টার মোতিরামকে বলেছি, বেচে দাও এই আটার চাকি। কিন্তু কিছুতেই বুঝবে না। আমি নিজে একবার দেড় হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলাম।"

প্রিন্সিপালসাহেব ক্লার্ককে বললেন, "ছেড়ে দাও ও কথা। ওদিককার ক্লাস থেকে মালবীয়কে ডেকে আনো।"

ক্লার্ক একটা ছেলেকে বলল, "যাও, ওদিককার ক্লাস থেকে মালবীয়কে ডেকে আনো।"

একটু পরেই দেখা গেল, ভালোমানুষের মতো দেখতে একজন যুবক আসছে। প্রিন্সিপালসাহেব তাকে দূর থেকে দেখেই চিৎকার করে বললেন, "ভাই মালবীয়, এই ক্লাসটাও একটু দেখো।"

মালবীয় কাছে এসে চালের একটা বাঁশ ধরে দাঁড়াল। তারপর বলল, "একই পিরিয়ডে দুটো ক্লাস কী করে নেব?"

যে ছেলেটা কাঁদছিল সে কাঁদতেই থাকল। ক্লাসের পেছন দিকে কয়েকটা ছেলে জোরে জোরে হাসছে। বাকি সকলে এমনভাবে এঁদের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, যেন চৌরাস্তায় অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে।

প্রিন্সিপালসাহেব গলা চড়িয়ে বললেন, "বেশি আইন ঝেড়ো না মালবীয়। যখন থেকে তুমি খান্নার সঙ্গে ওঠাবসা শুরু করেছ তখন থেকে সব কাজই তোমার কাছে কঠিন মনে হয়।"

মালবীয় প্রিন্সিপালসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্লার্ক বলল, "সরকারী বাসের মতো করো মালবীয়। একটা বাস খারাপ

হয়ে গেলে তার সব যাত্রীকে যেমন পরের বাসে তুলে দেওয়া হয় তেমনি এই ছেলেদেরও তুমি তোমার ক্লাসে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দাও।"

মালবীয় খুব নরম স্বরে বলল, "কিন্তু এটা তো ক্লাস নাইন, আর আমি ওখানে পড়াচ্ছি ক্লাস সেভ্‌নে।"

প্রিন্সিপালসাহেব রাগে ফুলে উঠলেন। যারা জানে তারা বুঝল, এবার তার হাত হাফপ্যাণ্টের পকেটের ভেতরে চলে যাবে আর তিনি চিৎকার করে উঠবেন। তা-ই হ'ল। তিনি বললেন, "আমি সব বুঝি। তুমিও খান্নার মতো তর্ক করতে শুরু করে দিয়েছ। আমি ক্লাস সেভ্‌ন্ আর নাইনের পার্থক্য বুঝি। হমকা অব প্রিন্সিপালি করৈ ন শিখাও ভাইয়া। জৌন্থ হুকুম হ্যায়, তৌন্থ চুপ্পে কৈরী আউট করৌ। সমঝয়ৌ কি নাহীঁ?"

প্রিন্সিপালসাহেবের বাড়ি পাশের গ্রামে। দূর দূর অঞ্চলেও তিনি তাঁর দুটি গুণের জন্য বিখ্যাত। একটা হচ্ছে খরচের মিথ্যে হিসেব তৈরি করে কলেজের নামে বেশি করে সরকারী টাকা আদায় করা, আর একটা হচ্ছে প্রচণ্ড রেগে গেলে স্থানীয় অবধী বুলি বলা। যখন তিনি মিথ্যে হিসেব তৈরি করেন তখন সবচেয়ে বড়ো অডিটরও তার ওপর কলম চালাতে পারে না; আবার যখন অবধী বলেন তখন সবচেয়ে বড়ো তর্কশাস্ত্রীও তাঁর কথার জবাব দিতে পারে না।

মালবীয় মাথা নিচু করে ফিরে গেল। প্রিন্সিপালসাহেব ছেঁড়া পায়জামা পরা ছেলেটার পিঠে এক ঘা বেত কষিয়ে দিয়ে বললেন, "যাও, ঐ ক্লাসে গিয়ে সবাই চুপ করে বসে থাকো। জোরে নিশ্বাসও যদি পড়ে তা হলে খাল খুলে নেব।"

ছেলেরা চলে গেলে ক্লার্ক মুচকি হেসে বলল, "চলুন, এবার খান্না মাস্টারের ক্লাসটাও দেখে নেবেন।"

খান্না মাস্টারের আসল নামও খান্না। যেমন তিলক, প্যাটেল, গান্ধী, নেহরু প্রভৃতি আমাদের এখানে জাতির নাম নয়, ব্যক্তির নাম তেমনি খান্নাও তা-ই। এ দেশে জাতিভেদপ্রথা লোপ করার এটাই একটা সহজ উপায়। জাতি থেকে তার নাম কেড়ে নিয়ে তাকে কোনো লোকের নাম বানিয়ে দিলে জাতির আর কিছু থাকে না। আপনা থেকেই তা লোপ পেয়ে যায়।

খান্না মাস্টার ইতিহাসের লেকচারার। কিন্তু এখন তিনি ইণ্টার-মিডিয়েটের একটা ক্লাসে ইংরেজী পড়াচ্ছেন। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বলছেন, "হিন্দীতে তো বড়ো বড়ো প্রেমের গল্প লেখো, কিন্তু ইংরেজীতে কোনো জবাব দিতে হলে মুখ ঘোড়ার মতো নিচু হয়ে যায় কেন?"

ক্লাসের একটা ছেলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একে তো ঘি-দুধের অভাব আর খেলাধুলো না করার জন্য প্রতিটি সাধারণ ছাত্রকে দেখায় কঙ্কালসার ঘোড়ার মতো, তার ওপর ছেলেটার মুখের গড়ন এমন যে, তার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। ক্লাসের ছেলেরা জোড়ে হেসে উঠল। খান্না মাস্টার ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করল, "বলো, মেটাফর কাকে বলে।"

ছেলেটা আগের মতোই দাঁড়িয়ে রইল। কিছুদিন আগে এ দেশে একটা রব উঠেছিল যে, লেখাপড়া না জানা লোকেরা শিং-ল্যেজ-বিহীন পশু। সেই হুজুগে অনেক লেখাপড়া না জানা লোকের ছেলে দেহাতে হাল আর কোদাল ছেড়ে স্কুলের ওপর হামলা করেছে। এই রকম হাজার হাজার ছেলে স্কুল, কলেজ আর

ইউনিভার্সিটি ভরে আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তারা একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এখন আর কাউকে এ কথা বলতে শোনা যায় না যে, লেখাপড়া না জানা লোকেরা পশুর মতো হয়। বরং অনুচ্চ কণ্ঠে এ কথা বলতে শোনা যায় যে, উচ্চ শিক্ষা কেবল তাদেরই নেওয়া উচিত যারা তার উপযুক্ত, আর তার জন্য স্ক্রিনিংয়ের দরকার। এইভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই-সব দেহাতী ছেলেদের হাতে আবার হাল ধরিয়ে মাঠে পাঠাবার কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেক বছর ফেল করে, ক্লাসে সমস্ত রকম বকাঝকা সহ্য করে, আর চাষ-আবাদ সম্বন্ধে নেতাদের ঝর্নাধারার মতো বক্তৃতা শুনেও এই-সব ছেলেরা আর হাল-কোদালের জগতে ফিরে যেতে চায় না। তারা কেন্নোর মতো স্কুলের সঙ্গে সেঁটে আছে আর যা-ই হোক-না কেন, ঐভাবেই সেঁটে থাকতে চায়।

ঘোড়ার মুখের মতো মুখওয়ালা এই ছেলেটাও এই দলে। ক্লাসে রোজ তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই কথাই বলা হয় যে, "যাও বাপু, বাড়ি গিয়ে মোষ দোও আর বলদের লেজ মোচড়াও; শেলি আর কীট্‌স্‌ তোমার জন্য নয়।" কিন্তু ছেলেটা তার বাবার চেয়ে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে গেছে, এই-সব আভাস-ইঙ্গিত বুঝতে চায় না। তার বাবা এখনও বলদের জন্য দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত গড়াসা দিয়ে খড় কাটে। আর তার ছেলে ছেঁড়া-ময়লা বইয়ের ভেতর তার ঘোড়ার মতো মুখটা লুকিয়ে বিংশ শতাব্দীর কলকাতার রঙিন রাতের কথা ভাবে। এই অবস্থায় কোনো রকম পরিবর্তনের পক্ষপাতী সে নয়। আর তাই সে মেটাফরের মানে বলতে পারে না, তার মুখের গড়ন নিয়ে তর্ক করতে চায় না।

কলেজের প্রতিটি সাধারণ ছেলের মতো এই ছেলেটাও পোশাক-

আশাকের ব্যাপারে উদাসীন। খালি পা, পরনে সাদামাটা ডোরা-কাটা কাপড়ের এক ময়লা পায়জামা। শহরের লোকেরা এই রকম পায়জামাকে সাধারণত স্লিপিং স্যুট হিসাবে ব্যবহার করে। ছেলেটার গায়ে গাঢ় খয়েরী রঙের একটা মোটা জামা। তার আবার বোতাম ভাঙা। মাথায় রুক্ষ, কঠিন চুল। স্নান না করা চেহারা, চোখে পিচুটি, দেখেই মনে হয়, কোনো প্রোপ্যাগাণ্ডার হুজুগে পড়ে কলেজে এসেছে।

ছেলেটা গত গছর একটা সস্তা পত্রিকা থেকে একটা প্রেমের গল্প নকল করে নিজের নামে কলেজ পত্রিকায় ছাপিয়েছিল। খান্না-মাস্টার তার এই খ্যাতির ওপর কাদা ছিটোচ্ছিলেন। তিনি গলার স্বর বদলে বললেন, "গল্প-লেখকমশাই, কিছু বলুন, মেটাফর কী জিনিস ?"

খান্না মাস্টারের পরনে খাকী প্যাণ্ট, গায়ে নীল রঙের বুশ শার্ট, আর শুধু চোস্ত দেখানোর জন্য চোখে কালো চশমা। চেয়ারের ধার থেকে তিনি টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। টেবিলের কিনারায় তাঁর পশ্চাদ্‌ভাগের একটা অংশ ঠেকা দিলেন। ছেলেটাকে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ক্লাসের পেছন দিককার দরজায় প্রিন্সিপালসাহেবের ওপর তাঁর চোখ পড়ল। প্রিন্সিপাল-সাহেবকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা ক্লার্কের কাঁধ বরাবর দেখা গেল।

খান্না মাস্টার টেবিলের ঠেকা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "আজ্ঞে, শেলির একটা কবিতা পড়াচ্ছিলাম।"

প্রিন্সিপাল তাঁর কথা শেষ হবার আগেই জোরে বলে উঠলেন, "কিন্তু আপনার কথা শুনছে কে ? এরা তো ছবি দেখছে।"

প্রিন্সিপাল ক্লাসের ভেতরে ঢুকলেন। এক এক করে দুটো ছেলের

পিঠে তাঁর হাতের বেত কষিয়ে দিলেন। ছেলে দুটো উঠে দাঁড়াল। একটা ছেলের পরনে নোংরা পায়জামা, গায়ে বুশশার্ট, মাথার চুল থেকে তেল গড়িয়ে পড়ছে ; অন্য ছেলেটার মাথা কামানো, গায়ে জামা আর পরনে আণ্ডারওয়্যার— পালোয়ানের মতো। প্রিন্সিপাল-সাহেব তাদের বললেন, "এই পড়া হচ্ছে ?"

নিচু হয়ে তিনি প্রথম ছেলেটার চেয়ার থেকে একটা পত্রিকা তুলে নিলেন। একটা সিনেমা পত্রিকা। একটা পাতা খুলে পত্রিকাটা তিনি হাওয়ায় দোলালেন। ছেলেরা দেখল, একটা বিলিতি নারীর স্তন ছবিতে আন্দোলিত হচ্ছে। প্রিন্সিপাল পত্রিকাটা মাটিতে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "এহি পঢ়ি রহে হো ?"

সারা ঘর নিস্তব্ধ। প্রিন্সিপালসাহেব ক্লাসের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা খান্না মাস্টারকে চিৎকার করে বললেন, "আপনার ক্লাসে ডিসিপ্লিনের এই অবস্থা ! ছেলেরা সিনেমা পত্রিকা পড়ে ! আর এই যোগ্যতা নিয়ে আপনি দাবি করছেন, আপনাকে ভাইস-প্রিন্সিপাল করতে হবে ! এইভাবে আপনি ভাইস-প্রিন্সিপাল-গিরি করবেন !" এরপর আবার তিনি খড়ী বুলি আরম্ভ করলেন, "লেখাপড়ার মধ্যে কী আছে ! আসল জিনিস হচ্ছে ডিসিপ্লিন ! বুঝলেন মাস্টারমশায় ?"

এ কথা বলে প্রিন্সিপাল ওমরখৈয়ামের হিরোর মতো "আমি জলধারার মতো এসেছিলাম আর ঝড়ের মতো চলে যাচ্ছি" ভঙ্গিতে চলে গেলেন। পেছনে শুনতে পেলেন, খান্না মাস্টার বিড়বিড় করে কী বলছেন।

তিনি কলেজের ফটকের বাইরে এলেন। রাস্তা দিয়ে প্যাণ্ট-শার্ট পরা একটা লোক সাইকেলে করে যাচ্ছিল, কাছে আসতেই

প্রিন্সিপালসাহেবকে নমস্কার করল। প্রিন্সিপালসাহেবও তাকে পালটা নমস্কার করলেন। লোকটা চলে যাবার পর ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করল, "এ আবার কোন্ চিড়িমার ?"

"ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টর। নতুন এসেছে।"

"বি-ডি-ও'র ভাগ্নে মনে হচ্ছে। খুব চালাকচতুর। আমি কিছু বলছি না, শুধু ভাবছি, ভবিষ্যতে কাজে আসবে।"

ক্লার্ক বলল, "আজকাল এইরকম সব চিড়িমারদের দিয়েই কাজ হয়। ভদ্রলোকেরা তো কিছুই করে না।"

কিছুক্ষণ তাঁরা দুজনে চুপচাপ রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললেন। তারপর প্রিন্সিপাল আবার তাঁর কথা নতুন করে বলতে শুরু করলেন, "সকলের সঙ্গে ভাব রাখা দরকার। এই কলেজের জন্য গাধাকে পর্যন্ত বাবা বলতে হয়।"

ক্লার্ক বলল, "সে তো দেখতেই পাচ্ছি। সারাদিন তো আপনার তা-ই করে কাটে।"

প্রিন্সিপাল বললেন, "বলুন, আমার আগেও তো এখানে পাঁচজন প্রিন্সিপাল ছিলেন, কেউ বানাতে পেরেছেন এত বড়ো পাকা ইমারত ?"

তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন, "এখানে সামুদায়িক কেন্দ্র তৈরি করা, সে-ও আমারই কৃতিত্ব। হ্যাঁ কি না ?"

ক্লার্ক মাথা নেড়ে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে প্রিন্সিপাল আবার বললেন, "আমি এখন এই ফিকিরে আছি যে, যদি কোনো চণ্ডুলকে ফাঁসানো যায় তা হলে ইমারতের আরও এক-আধটা ব্লক বানিয়ে ফেলা যাবে।"

ক্লার্ক চুপচাপ তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল, হঠাৎ এক সময় থমকে

দাঁড়াল। প্রিন্সিপালসাহেবও থেমে পড়লেন। ক্লার্ক বলল, "দুটো ইমারত তৈরি হবার কথা আছে।"

প্রিন্সিপাল সোৎসাহে ঘাড় উঁচু করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় ?"

"একটা অচ্ছুৎদের জন্য চামড়া পরিষ্কার করার ইমারত— ঘোড়ার ডাক্তার বলছিল। আর একটা হাসপাতালের কলেরা ওয়ার্ড। হাসপাতালে জায়গার বড়ো অভাব। কৌশল করে কলেজের ধারেকাছেই এই ইমারত দুটো বানাবার ব্যবস্থা করুন-না। পরে ধীরেসুস্থে আমরা হাতিয়ে নেব।"

প্রিন্সিপালসাহেব হতাশায় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে পা বাড়ালেন। তিনি বলতে শুরু করলেন, "এই ইমারত দুটোর কথা আমি আগেই জানতাম। এর মধ্যে কৌশল খাটবে না।"

কিছুক্ষণ দুজন চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন।

রাস্তার ধারে একটা লোক দু-চারজন মজুরকে জড়ো করে তাদের ধমকাচ্ছিল। প্রিন্সিপালসাহেব কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দু-চার মিনিট বোঝবার চেষ্টা করলেন, লোকটা কেন ধমকাচ্ছে। মজুররা অনুনয়-বিনয় করছে। প্রিন্সিপাল বুঝে নিলেন যে, তেমন কোনো ব্যাপার নয়, মজুর আর ঠিকাদার তাদের রোজকার খেলা দেখাচ্ছে, আর কথায় কথায় কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে মজুরদের বললেন, "যাও, নিজের নিজের কাজ করো। ঠিকাদার-সাহেবকে ঠকালে জুতোপেটা করব।"

মজুররা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রিন্সিপালসাহেবের দিকে তাকাল। ফুরসৎ পেয়ে তারা আবার নিজের নিজের কাজে লেগে গেল। ঠিকাদার অন্তরঙ্গভাবে প্রিন্সিপালকে বলল, "সব বেইমান। একটু চোখের

পাতা বুজলেই কানের ময়লা পর্যন্ত বার করে নেবে। দেড়া মজুরি চাইবে আর কাজের নাম শুনলে ঘোঁত ঘোঁত করতে থাকবে।"

প্রিন্সিপালসাহেব বললেন, "সব জায়গায় এই একই অবস্থা। আমার ওখানেই দেখুন-না, কোনো মাস্টার থোড়াই পড়াতে চায়! পেছনে লেগে থাকি, তাই··· ।"

লোকটা হেসে বলল, "আমাকে আর কী বলছেন! আমিও তো তাই করি। সব জানি।" একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, "এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন?"

এর জবাব দিল ক্লার্ক, "বৈদ্যজীর ওখানে। চেকগুলো সই করাতে হবে।"

"করিয়ে আনুন।"—প্রিন্সিপালকে আভাসে চলে যেতে বলল। প্রিন্সিপাল যখন হাঁটতে আরম্ভ করলেন, ঠিকাদার তখন জিজ্ঞাসা করল, "আর সব খবর কী?"

প্রিন্সিপাল দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, "ভালোই। ঐ খান্না-মান্না লিবির-শিবির করছে। আপনাদের আর আমার বিরুদ্ধে প্রোপ্যাগাণ্ডা করে বেড়াচ্ছে।"

লোকটা জোর দিয়ে বলল, "আপনি ভাববেন না। ডাঁটের মাথায় প্রিন্সিপালি করে যান। ওঁকে জানিয়ে দিন যে, প্রোপ্যা-গাণ্ডার জবাব হচ্ছে ডাণ্ডা। বলে দিন যে, এটা শিবপালগঞ্জ, এখানে যেন উঁচুনিচু দেখে চলেন।"

প্রিন্সিপালসাহেব এগুতেই ক্লার্ক বলল, "ঠিকাদারসাহেবকেও কলেজ কমিটির মেম্বার করে নিন! কাজে আসবে।"

প্রিন্সিপালসাহেব চিন্তা করতে লাগলেন। ক্লার্ক আবার বলল,

"চার বছর আগের তারিখ দিয়ে রসিদ কেটে দেব। ব্যবস্থাপক সমিতিতেও এঁর থাকা দরকার। তা হলে সব ঠিক থাকবে।"

প্রিন্সিপালসাহেব এই মুহূর্তে কোনো জবাব দিলেন না। একটু থেমে বললেন, "বৈদ্যজীর সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। এটা উঁচু দরের পলিটিক্সের কথা। তুমি-আমি বললে কী হবে?"

চার

আবর্জনার স্তূপ। আবর্জনার স্তূপের চেয়েও জঘন্য কিছু, দোকান, তহসিল, থানা, তাড়িখানা, উন্নয়ন বিভাগের অফিস, শরাবখানা, কলেজ— এই রাস্তা দিয়ে যারা যায়, প্রায় এগুলোই তাদের চোখে পড়ে। কিছু দূর এগিয়ে একটা ঘন আমবনের মধ্যে একটা কাঁচা ঘরও আছে। তার পেছন দিকটা রাস্তার দিকে, আর সামনের দিকটা জঙ্গলের দিকে। দরজায় কপাট নেই। বর্ষার সময় হাল-চাষীরা গাছের তলা থেকে উঠে এই ঘরে গিয়ে জুয়া খেলে। অন্য সময় খালি পড়ে থাকে। যখন খালি থাকে তখনও লোকে ঠিক খালি থাকতে দেয় না, মেয়েপুরুষেরা সুযোগ পেলে তাদের ইচ্ছেমতো ঘরটা ব্যবহার করে। শিবপালগঞ্জে এই ঘরটার যে নাম দেওয়া হয়েছে, হেনরি মিলারকেও চমকে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট। কলেজের এক মাস্টার সেটাকে একটু শীতল করে নাম

দিয়েছে প্রেমভবন। আবর্জনার স্তূপ আর এই প্রেমভবনের মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তাটা শিবপালগঞ্জের একেবারে কিনারায় পড়ে। আসল শিবপালগঞ্জ অন্যদিকে, রাস্তা ছাড়িয়ে। এবং সত্যিকারের শিবপালগঞ্জ বৈদ্যজীর বৈঠকখানায়।

বৈঠকখানায় যেতে হলে সরু গলিটায় নামতে হয়। তার ত্বধারে খড়ের চালের বিশৃঙ্খল, এবড়োখেবড়ো সব বাড়ি। বাড়িগুলোর বাইরের দিককার চবুতরা সামনে বাড়ানো, গলির মধ্যে ঢুকে গেছে। এই-সব চবুতরা দেখে এই ফিলসফি মনে হয় যে, নিজের সীমানার আশেপাশে যেখানেই খালি জমি পাবে, চোখ বুজে সেখানকার ত্ব-চার হাত জমি ঘিরে নেবে।

এই সরু গলিটা হঠাৎ একটা মাঠে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। ঐ মাঠে তিন-চারটে নিমগাছ আছে। গাছগুলোর যে রকম বাড় তাতে মনে হয়, ওগুলো বনমহোৎসবের আগেই লাগানো, কোনো নেতা অথবা অফিসারের স্পর্শ থেকে বেঁচে গেছে এবং বৃক্ষরোপণ ও ক্যামেরা-ক্লিকের অনুষ্ঠান থেকে তাদের রেহাই দেওয়া হয়েছে।

সবুজে ভরা এই জায়গাটায় একটা বাড়ি মাঠের একটা পুরো দিক এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, ওদিক দিয়ে এগুনো কঠিন। বাড়িটা বৈদ্যজীর। বাড়িটার সামনের অংশ পাকা আর দেহাতী হিসেবে যথেষ্ট জঁাকাল। পেছন দিককার দেয়ালগুলো কাঁচা। দেয়ালগুলোর পেছনে আবর্জনার স্তূপ। ঝলমলে বিমানবন্দর আর চকচকে হোটেল দিয়ে এ দেশের যে "সিম্বলিক মডার্নাইজেশন" হচ্ছে তার প্রভাব এই বাড়ির বাস্তুকলার ওপরও পড়েছে, আর তাতে প্রমাণ হচ্ছে যে, দিল্লী থেকে শুরু করে শিবপালগঞ্জ পর্যন্ত সর্বত্র কাজ করার দেশী বুদ্ধি একই রকম।

বাড়িটার সামনের অংশটা বৈঠকখানা নামে বিখ্যাত। এই অংশে আছে চবুতরা, বারান্দা, আর একটা বড়ো কামরা। এই বাড়ি তৈরির সময় যে-সব মজুর ইঁট-কাদা বয়েছে তারাও জানে যে, এই বৈঠকখানা কেবল ইঁট আর কাদায় তৈরি ইমারতই শুধু নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। যেমন 10 নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট, হোয়াইট হাউস, ক্রেমলিন ইত্যাদি বাড়ির নাম নয়, ক্ষমতার নাম।

থানা থেকে ফিরে রুপ্পনবাবু আমদরবার অর্থাৎ বারান্দায় ভিড় দেখতে পেলেন। তাঁর পা দুটো তাড়াতাড়ি এগুতে লাগল, ধুতিতে ফড়্ফড়্ শব্দ উঠল। বৈঠকখানায় ঢুকতেই তিনি খবর পেলেন, তাঁর মামাতো ভাই রঙ্গনাথ ট্রাকে করে শহর থেকে এসেছে এবং ড্রাইভার তার কাছ থেকে দুটো টাকা আদায় করে নিয়েছে।

রোগাপটকা একটা লোক নোংরা বেনিয়ান আর ডোরাকাটা আণ্ডারওয়্যার পরে বসে ছিল। নভেম্বর মাস, এই সন্ধ্যাবেলায় বেশ শীত পড়েছে। কিন্তু তবু বেনিয়ানে লোকটিকে বেশ খুশি খুশি লাগছিল। লোকটার নাম মঙ্গল। কিন্তু লোকে তাকে শনিচর বলে ডাকে। তার চুলে পাক ধরেছে, সামনের দাঁতগুলো পড়ে গেছে। তার পেশা বৈদ্যজীর বৈঠকখানায় বসে থাকা। বেশির ভাগ সময় সে কেবল আণ্ডারওয়্যারই পরে। আজ তাকে বেনিয়ান পরতে দেখে রুপ্পনবাবু বুঝলেন যে, শনিচর "ফর্ম্যাল" হতে চাইছে। রুপ্পনবাবুকে সে এক নিশ্বাসে রঙ্গনাথের বিপদের কাহিনী বলে গেল, তারপর তার খালি উরুদুটোর ওপর তবলার কয়েকটা কঠিন বোল বার করে উৎসাহভরে বলল, "বদ্রীভাই থাকলে খুব মজা হ'ত।"

রুপ্পনবাবু রঙ্গনাথের দিকে এগুতে এগুতে বললেন, "তুমি ভালোই

করেছ রঙ্গনাথদাদা। তুটো টাকা দিয়ে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলেছ। সামান্য সামান্য ব্যাপারে খুনখারাপি করা ঠিক না।”

রুপ্পনবাবুর সঙ্গে রঙ্গনাথের দেড় বছর পরে দেখা। রুপ্পনবাবুর গম্ভীরতাকে সারাদিনের সবচেয়ে মজার ব্যাপার মনে করে রঙ্গনাথ বলল, “আমি তো মারামারি করার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু পরে চিন্তা করে থেমে গেলাম।”

রুপ্পনবাবু মারামারিতে বিশেষজ্ঞ, এইরকম ভঙ্গিতে হাত তুলে বললেন, “তুমি ঠিকই করেছ। এইরকম সব ঝগড়াতেই স্টুডেণ্ট কমিউনিটির বদনাম হয়।”

রঙ্গনাথ এবার তাঁকে গভীরভাবে লক্ষ্য করল। কাঁধের ওপর তোলা ধুতির কোঁচা, সগু খাওয়া পান, চুলে দেওয়া কয়েক লিটার তেল— গুণ্ডাগিরির যে-কোনো স্ট্যাণ্ডার্ডে তাকে বিশিষ্ট মনে হচ্ছিল। রঙ্গনাথ প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করল। জিজ্ঞাসা করল, “বদ্রীদাদা কোথায়? দেখছি না যে!”

শনিচর তার আণ্ডারওয়্যার ঝাড়তে শুরু করল, যেন পিঁপড়ে তাড়াচ্ছে। সেইসঙ্গে ভুরু কুঁচকে বলল, “আমারও বদ্রীভাইয়ের কথা মনে পড়ছে। তিনি থাকলে এতক্ষণ···!”

“বদ্রীদাদা কোথায়?” রঙ্গনাথ ওদিকে দৃষ্টি না দিয়ে রুপ্পন-বাবুকে জিজ্ঞাসা করল।

রুপ্পনবাবু তাচ্ছিল্যভরে বললেন, “শনিচর তো বলছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করে তো যান নি। গেছেন কোথাও। বাইরে গেছেন হয়তো। এসে পড়বেন। কাল, পরশু, তরশু পর্যন্ত এসেই পড়বেন।”

তাঁর কথা শুনে বোঝা মুশকিল, বদ্রী তাঁর আপন ভাই এবং

তাঁর সঙ্গে একই বাড়িতে থাকেন। রঙ্গনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তারপর অন্য একটা প্রশ্ন করল, "তুমি এখন কোন্ ক্লাসে পড়ছ রুপ্পন?"

রুপ্পনবাবুর মুখ দেখে মনে হ'ল, এ প্রশ্ন তাঁর পছন্দ হয় নি। তিনি বললেন, "ক্লাস টেনে। তুমি হয়তো বলবে, দু বছর আগেও তো আমি এই ক্লাসে ছিলাম। কিন্তু আমি শিবপালগঞ্জে এই ক্লাস থেকে বেরুবার কোনো রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি না।··· তুমি এই কলেজের অবস্থা জান না। লুচ্চা আর বদমাশের আড্ডা। মাস্টাররা পড়ানো ছেড়ে কেবল পলিটিক্স করে। দিনরাত বাবাকে জ্বালাতন করে। এখানে কি কেউ পরীক্ষায় পাস করতে পারে?"

ঘরের ভেতর বৈদ্যজী রুগীদের ওষুধ দিচ্ছিলেন। সেখান থেকেই হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "স্থির হও রুপ্পন। এই কুব্যবস্থার অবসান আসন্ন।"

মনে হ'ল যেন আকাশবাণী হচ্ছে: "ঘাবড়িয়ো না বসুদেব, কংসকে যে বধ করবে তার জন্ম আসন্ন।"

রুপ্পনবাবু স্থির হলেন। রঙ্গনাথ ঘরের দিকে মুখ করে জোরে জিজ্ঞাসা করল, "মামা, এই কলেজের সঙ্গে আপনার তাল্লুক কী?"

"তাল্লুক?" ঘরের ভেতর বৈদ্যজী সজোরে হেসে উঠলেন। "তুমি জানতে চাইছ, এই কলেজের সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ? রুপ্পন, রঙ্গনাথের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দাও।"

রুপ্পন বড়ো ব্যবসায়ীর কায়দায় বলল, "বাবা কলেজের ম্যানেজার। মাস্টারদের থাকা না-থাকা বাবারই হাতে।"

রঙ্গনাথের চোখেমুখে এ কথার প্রভাব পড়তে দেখে রুপ্পনবাবু আবার বললেন, "সারা অঞ্চলে এমন ম্যানেজার মিলবে না। যারা

সরল তাদের কাছে বাবা একেবারে সরল, আর হারামিদের কাছে খানদানী হারামি।"

রঙ্গনাথ কথাটা চুপচাপ হজম করে নিল, কেবল কথা বলার জন্যই বলল, "আর কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের কী অবস্থা? মামা তো ওটারও কিছু ছিলেন।"

"ছিলেন নয়, আছেন।" রুপ্পনবাবু কিছুটা রুক্ষস্বরে বললেন, "ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।"

বৈদ্যজী ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। ইংরেজ আমলে তিনি ইংরেজদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। দেশী আমলে তিনি দেশী হাকিমদেরও শ্রদ্ধা দেখাতে শুরু করেছেন। তিনি দেশের একজন পুরনো সেবক। বিগত মহাযুদ্ধের সময় দেশের পক্ষে জাপান যখন বিপদ সৃষ্টি করেছিল তখন তিনি সুদূর পূর্বাঞ্চলে লড়াই করার জন্য বহু সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। এখন দরকার হলে রাতারাতি তিনি তাঁর নিজের রাজনৈতিক দলে শ'য়ে শ'য়ে সদস্য ভর্তি করান। আগে তিনি জজের এজলাসে জুরর আর অ্যাসেসর হয়ে, দেওয়ানী মকদ্দমায় সম্পত্তির অছি হয়ে আর গ্রামের লোকেদের মোড়ল হয়ে জনসেবা করতেন, এখন কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর কলেজের ম্যানেজার হিসাবে দেশসেবা করেন। আসলে কিন্তু এই-সব পদে তিনি কাজ করতে চান না, কারণ পদের প্রতি তাঁর লোভ নেই। এখানে দায়িত্বপুর্ণ কাজ করার মতো কোনো লোক নেই। এখানকার তরুণরা সারা দেশের তরুণদেরই মতো নিষ্কর্মা। তাই এই বুড়ো বয়েসে তাঁকেই এই-সব পদ অলংকৃত করতে হয়।

বুড়ো বয়েস! বৈদ্যজী সম্পর্কে কথাটা কেবল অ্যারিথমেটিক

বাধ্যতার কারণেই প্রয়োগ করতে হয়, কারণ অঙ্কের হিসেবে তাঁর বয়েস বাষট্টি পার হয়ে গেলেও রাজধানীতে বাস করে যে-সব মহাপুরুষ দেশসেবা করেন তাঁদেরই মতো তিনিও বয়েস হওয়া সত্ত্বেও বুড়ো হন নি। ঐ-সব মহাপুরুষদের মতো বৈদ্যজীও প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আমি তখনই বুড়ো হব যখন মরে যাব, আর যতক্ষণ লোকে আমাকে মনে করিয়ে না দেবে যে, আমি মরে গেছি ততক্ষণ আমি বেঁচে আছি ভাবব আর দেশসেবা করে যাব।" সব বড়ো বড়ো রাজনীতিকের মতো তিনিও রাজনীতি অপছন্দ করেন আর রাজনীতিকদের নিয়ে ঠাট্টা করেন। গান্ধীর মতো তিনিও তাঁর রাজনৈতিক দলে কোনো পদ গ্রহণ করেন নি, কারণ তিনি নতুন রক্তকে উৎসাহ দিতে চান। কিন্তু কো-অপারেটিভ আর কলেজের ব্যাপারে লোকে তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করেছে আর তিনি তাদের বাধ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

বৈদ্যজীর আর-এক পেশা বৈদ্যকের। তিনি রোগের দুটো শ্রেণীবিভাগ করেছেন: স্পষ্ট রোগ আর গুপ্ত রোগ। স্পষ্ট রোগের তিনি স্পষ্টভাবে চিকিৎসা করেন, আর গুপ্ত রোগের গুপ্তভাবে। রোগের ব্যাপারে তাঁর একটা থিওরি হচ্ছে, সব রোগই ব্রহ্মচর্যের বিনাশ থেকে সৃষ্টি হয়। কলেজের ছেলেদের নিস্তেজ, রুগ্‌ণ চেহারা দেখে তিনি প্রায়ই এই থিওরির কথা বলেন। যদি কেউ বলে, দারিদ্র্য আর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই ছেলেদের স্বাস্থ্য খারাপ তা হলে তিনি মনে করেন, সে পরোক্ষে ব্রহ্মচর্যের মহত্ত্ব অস্বীকার করছে, আর যেহেতু যারা ব্রহ্মচর্য মানে না তাদের নৈতিক চরিত্র থাকে না, তাই দারিদ্র্য আর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের কথা যারা বলে তাদের নৈতিক চরিত্র নেই।

একদিন তিনি রঙ্গনাথকেও ব্রহ্মচর্যের সুফল বোঝাতে বসলেন। তিনি এক আশ্চর্য শরীরবিজ্ঞানের কথা বললেন। তাঁর এই শরীর-বিজ্ঞান অনুযায়ী কয়েক মন খাদ্য থেকে কয়েক ছটাক রস তৈরি হয়, রস থেকে রক্ত, রক্ত থেকে অন্য কিছু— এবং এইভাবে শেষ পর্যন্ত এক ফোঁটা বীর্য তৈরি হয়। তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, এক ফোঁটা বীর্য তৈরি করতে যত খরচ হয়, একটা অ্যাটম বোমা তৈরি করতেও অত খরচ হয় না। রঙ্গনাথের মনে হ'ল, ভারতে যদি কোনো দামি জিনিস থাকে তো সে বীর্য।

বৈদ্যজী বললেন, "বীর্যের হাজার শত্রু আছে আর সবাই তা লুটেপুটে নেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। যদি কেউ কোনো উপায়ে তার বীর্যটুকু বাঁচাতে পারে তা হলে মনে করবে সে তার পুরো চরিত্রটাই বাঁচাতে পেরেছে।"

তাঁর কথা শুনে মনে হ'ল আগে ভারতে বীর্যরক্ষার ওপর খুব জোর দেওয়া হত, এবং তখন একদিকে যেমন ঘি-দুধের বন্যা বইত, অন্যদিকে তেমনি বীর্যের নদী বইত। শেষে তিনি একটা শ্লোক আবৃত্তি করলেন, যার মানে এক ফোঁটা বীর্যের স্খলনে মানুষের মৃত্যু ঘটে, আর এক ফোঁটা বীর্য্যের সংরক্ষণে জীবন হাসিল হয়।

সংস্কৃত শুনতেই শনিচর হাতজোড় করে বলে উঠল, "জয় ভগবান।" তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে শ্রদ্ধাভরে শরীরের পশ্চাদ্‌ভাগ ছাদের দিকে তুলে দিল। বৈদ্যজী এতে আরও উৎসাহ পেলেন। রঙ্গনাথকে তিনি বললেন, "ব্রহ্মচর্যের তেজের কথা আর কী বলব! কিছুদিন পর আয়নায় নিজের মুখ দেখো, তা হলে বুঝতে পারবে।"

রঙ্গনাথ মাথা নেড়ে ভেতরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মামার

এই স্বভাবের কথা তার আগে থেকেই জানা ছিল। রুপ্পনবাবু দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ওপর বৈদ্যজীর বক্তৃতার কোনো প্রভাব পড়ে নি। রঙ্গনাথের কানে ফিস ফিস করে তিনি বললেন, "মুখে তেজ আনার জন্য আজকাল ব্রহ্মচর্যের দরকার কী? ক্রীম-পাউডার দিয়েই তো তা আনা যায়।"

পাঁচ

পুনর্জন্মবাদের আবিষ্কার দেওয়ানী আদালতে। বাদী আর প্রতিবাদী যাতে এই আফসোস নিয়ে না মরে যে, তাদের মকদ্দমা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, তাই এই আবিষ্কার। পুনর্জন্মবাদের আবিষ্কারের ফলে তারা এখন এ কথা ভাবতে ভাবতে নিশ্চিন্তে মরতে পারে যে, মকদ্দমার রায় শোনার জন্য পরের জন্ম তো পড়েই রয়েছে।

বৈদ্যজীর বৈঠকখানার বাইরে চবুতরার ওপর যে লোকটা এখন বসে আছে, প্রায় সাত বছর আগে সে একটা দেওয়ানী মকদ্দমা দায়ের করেছিল। তাই তার কথার মধ্যে পূর্বজন্মের পাপ, ভাগ্য, ভগবান, সামনের জন্মের কাজকর্ম ইত্যাদির উল্লেখ থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

লোকে তাকে ল্যাংড়া বলে ডাকে। কপালে তার কবীরপন্থী তিলক, গলায় তুলসীর কণ্ঠী, ঝড়-জল-খাওয়া দাড়িভরা মুখ, রোগা-

পাতলা শরীর। গায়ে মেরজাই। একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে কাটা। তার অভাব পূরণ করেছে একটা লাঠি। মুখে পুরনো দিনের সেই খৃস্টীয় সন্ন্যাসীদের ভাব, যাঁরা রোজ নিজেদের হাতে নিজেদের পিঠে জোরে একশো চাবুক মারতেন।

শনিচর তার দিকে এক গেলাস ভাং এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও ভাই ল্যাংড়া, খেয়ে নাও। এতে ভালো ভালো মাল পড়েছে।"

ল্যাংড়া জোরে একটা নিশ্বাস নিল, তারপর চোখ বুজল— ভঙ্গিটা অনেকটা আত্মগ্লানিতে পীড়িত লোকদের থেকে শুরু করে অতি-ভোজীদের ভঙ্গির মতো।

শনিচর তাকে ছেড়ে বাঁদরের মতো এক লাফ দিয়ে বৈঠক-খানার ভেতরে গিয়ে পড়ল। তার এই লাফ থেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ আরও পুষ্ট হ'ল। বৈঠকখানায় প্রিন্সিপালসাহেব, ক্লার্ক, বৈদ্যজী, রঙ্গনাথ প্রভৃতি অনেকে বসে আছেন। বেলা প্রায় দশটা।

শনিচর ভাঙের গেলাসটা প্রিন্সিপালসাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আগের কথাটারই পুনরাবৃত্তি করল, "খেয়ে নিন মাস্টারমশায়, এতে ভালো ভালো মাল পড়েছে।"

প্রিন্সিপালসাহেব বৈদ্যজীকে উদ্দেশ করে বললেন, "কলেজের কাজ ফেলে রেখে এসেছি। এটা সন্ধ্যাবেলার জন্য রেখে দেওয়া হোক।"

বৈদ্যজী সস্নেহে বললেন, "সন্ধ্যাবেলায় আবার খাবেন।"

"কলেজ ফেলে এসেছি।" তিনি আবার বললেন।

রুপ্পনবাবু কলেজ যাবার জন্য তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছেন। রোজকার মতো আজও তাঁর কাঁধে ধুতির কোঁচা, গায়ে বুশশার্ট।

বুশশার্টটা ময়লা হলেও দামি বলে তাঁর ফিলসফি অনুসারে পরা চলে। মুখে পান। মাথার চুল আঁচড়ানো। হাতে একটা মোটা বই। বইটা বিশেষ করে নাগরিকশাস্ত্রের ঘণ্টায় পড়ার জন্য। বইটার নাম "পকেটী গোয়েন্দা"। পকেটে ছুটো ফাউন্টেনপেন—একটা লাল কালির আর-একটা নীল কালির। কিন্তু কোনোটাতেই কালি নেই। মণিবন্ধে ঘড়ি। এই ঘড়ি দেখে বোঝা যায়, যারা জুয়া খেলে তাদের ঘড়ি পর্যন্ত বাঁধা পড়ে আর যারা জুয়াড়ীদের মাল বাঁধা রাখে তারা দশ টাকাতেও দামি ঘড়ি পায়।

রুপ্পনবাবু বাইরে বেরুতে বেরুতে প্রিন্সিপালসাহেবের কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন। বাইরে থেকেই তিনি বলে উঠলেন, "আপনি তো সব সময়েই কলেজ ফেলে থাকেন। কিন্তু কলেজ আপনাকে ফেলে না।"

প্রিন্সিপালসাহেব লজ্জা পেলেন, তাই হাসলেন। তারপর জোর দিয়ে বললেন, "রুপ্পনবাবু খাঁটি কথা বলেন।"

শনিচর লাফিয়ে উঠে তাঁর হাতের কব্জি ধরে ফেলল। আনন্দে চিৎকার করে বলল, "তা হলে নিন, এই কথার ওপরই চড়িয়ে যান এক গেলাস।"

বৈদ্যজী হৃষ্টচিত্তে প্রিন্সিপালের ভাং খাওয়া দেখছেন। খাওয়ার পরে প্রিন্সিপালসাহেব বললেন, "সত্যিই এতে ভালো ভালো মাল পড়েছে।"

বৈদ্যজী বললেন, "ভাং তো নামমাত্র ছিল। ছিল কি ছিল না। আসলে তো ছিল বাদাম, মনক্কা আর পেস্তা। বাদামে বুদ্ধি আর বীর্য বৃদ্ধি পায়। মনক্কা হচ্ছে রেচক। এর মধ্যে এলাচও ছিল। এর প্রভাব শীতল। এতে বীর্য পাতলা হতে পারে না, কঠিন আর

স্থির থাকে। আমি রঙ্গনাথের ওপরও এই পানীয়ের একটা ক্ষুদ্র প্রয়োগ করছি।”

প্রিন্সিপালসাহেব ঘাড় উঁচু করে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন, কিন্তু বৈদ্যজী আগের মতোই বলে চললেন, “ওঁর কিছুদিন থেকে জ্বর হচ্ছে। শরীর দুর্বল লাগছে। তাই আমি ওঁকে এখানে ডেকে এনেছি। ওঁর জন্য রোজকার একটা কার্যক্রম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে বাদামও আছে। দুপাতা ভাংও। দেখতে চাই, ছ মাস পরে যখন উনি এখান থেকে যাবেন তখন কী হয়ে যান।”

কলেজের ক্লার্ক বলে উঠল, “ছুঁচোর মতো এসেছেন, গণ্ডার হয়ে যাবেন। দেখে নিয়ো কাকা।”

যখনই ক্লার্ক বৈদ্যজীকে কাকা বলে তখনই প্রিন্সিপালসাহেবের আফসোস হয়, কেন তিনি তাঁকে বাবা বলতে পারছেন না। তাঁর চোখেমুখে বিষণ্ণতার ছাপ পড়ল। তিনি সামনের ফাইলগুলো ওলটাতে লাগলেন।

ল্যাংড়া ততক্ষণে দরজার ধারে এসে গেছে। শাস্ত্রে শূদ্রদের যে-ধরনের আচরণ করার বিধান দেওয়া হয়েছে সেই বিধান অনুসারে সে চৌকাঠের ওপর মুর্গি হয়ে বৈদ্যজীকে প্রণাম করল। এতে প্রমাণ, হ'ল যে, আমাদের এখানে আজও সবার ওপরে শাস্ত্র, আর জাতিভেদপ্রথা দূর করার সমস্ত চেষ্টা ছলনা না হলেও একটা রোম্যান্টিক কাজ। ল্যাংড়া ভিক্ষা চাওয়ার মতো করে বলল, “তা হলে যাচ্ছি বাবু!”

বৈদ্যজী বললেন, “যাও ভাই, তুমি ধর্মের লড়াই লড়ছ, লড়ে যাও। ওতে আমি কী সাহায্য করতে পারি?”

ল্যাংড়া স্বাভাবিকভাবেই বলল, "ঠিক আছে বাবু! এই ধরনের লড়াইয়ে তুমি কী করবে! যখন কোনো সুপারিশ-টুপারিশের দরকার হবে তখন তোমার দরজায় এসে মাথা ঠুকব।"

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আবার সে প্রণাম করল। তারপর এক পায়ে ভর দিয়ে লাঠির সাহায্যে ঝুলতে ঝুলতে চলে গেল। বৈদ্যজী জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, "এরও বুদ্ধি ছেলেমানুষের মতো।"

বৈদ্যজী খুব কমই হাসেন। রঙ্গনাথ চমকে উঠে দেখল, হাসিতে বৈদ্যজীর চোখমুখ মোলায়েম হয়ে উঠেছে, নেতাগিরির জায়গাটা ভালোমানুষি দখল করে নিয়েছে। একজন আচারনিষ্ঠ মহাপুরুষের জায়গায় তাঁকে একজন অসৎ লোকের মতো দেখাচ্ছে।

রঙ্গনাথ জিজ্ঞাসা করল, "ও কিসের লড়াই লড়ছে?"

প্রিন্সিপালসাহেব ছড়ানো ফাইল আর চেকবইগুলো, যেগুলোর ওজুহাতে তিনি মাঝে মাঝে সকালে এখানে ভাং খেতে আসেন, সেগুলো গোছাতে আরম্ভ করেছিলেন, রঙ্গনাথের প্রশ্ন শুনে হাতটা থামিয়ে বললেন, "ও তহসিল থেকে একটা দস্তাবেজের নকল নিতে চাইছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছে যে, কিছুতেই ঘুষ দেবে না, আইনমাফিক নকল নেবে। আবার ওদিকে নকলবাবুও প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সে-ও ঘুষ নেবে না, আইনমাফিক নকল দেবে। এরই লড়াই চলছে এখন।"

রঙ্গনাথ ইতিহাসের এম. এ., অনেক লড়াইয়ের কারণ তার পড়া আছে। সেকেন্দার শাহ্ ভারত আক্রমণ করেছিল এ দেশ দখল করার জন্য, আর সেই দখল না দেবার জন্য পুরু প্রতিরোধ

করেছিল। এই কারণেই লড়াই হয়েছিল। আলাউদ্দীন বলেছিল, আমি পদ্মিনীকে নেব ; রাণা প্রতাপ বলেছিল, আমি পদ্মিনীকে দেব না। এই কারণে লড়াই হয়েছিল। সব লড়াইয়েরই মূলে এই— এক পক্ষ বলে, নেব ; অপর পক্ষ বলে, দেব না। আর তাই নিয়েই লড়াই।

কিন্তু এখানে ল্যাংড়া বলছে, ধর্মপথে নকল নেব। নকলবাবুও বলছে, ধর্মপথে নকল দেব। তবু লড়াই চলছে।

রঙ্গনাথ প্রিন্সিপালসাহেবের কাছে এই ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করল।

প্রিন্সিপালসাহেবের পক্ষ থেকে ক্লার্ক জবাব দিল :

"এ-সব গেঁয়ো ব্যাপার। বোঝা মুশকিল।

"ল্যাংড়ার বাড়ি এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরের এক গ্রামে। ওর বউ মারা গেছে। ছেলেদের ওপর ও অসন্তুষ্ট, তারা ওর কাছে মৃত। নিজে ভক্ত মানুষ। কবীর আর দাদূর ভজন গাইত। গাইতে গাইতে ক্লান্ত হয়ে পড়ার পর আর কোনো কাজ না পেয়ে একটা দেওয়ানী মকদ্দমা দায়ের করে বসল।

"মকদ্দমার জন্য একটা পুরনো রায়ের নকল দরকার। তার জন্য প্রথমে সে তহসিলে দরখাস্ত করেছিল। দরখাস্তে কিছু কমতি থাকায় তা খারিজ হয়ে যায়। তারপর সে আর-একটা দরখাস্ত দিল। কিছুদিন আগে তহসিলে নকল নিতে গিয়ে দেখল যে, নকলনবিস একটা চিড়িমার, সে পাঁচ টাকা চায়। ল্যাংড়া বলল, রেট দু টাকা। এই নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে গেল। দু-চারজন উকিল সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা প্রথমে নকলনবিসকে বললেন, ভাই, দু টাকাই নাও, বেচারা ল্যাংড়া মানুষ ; নকল নিয়ে গিয়ে

তোমার গুণ গাইবে। কিন্তু নকলনবিস তার কথা থেকে একচুলও নড়ল না। একেবারে জিদ ধরে বসল। বলল, মরদের এক কথা। যা বলে দিয়েছি তা-ই নেব।

"তখন উকিলরা ল্যাংড়াকে বোঝালেন। তাঁরা বললেন, নকল-বাবুও গেরস্থ মানুষ। মেয়েরা বিবাহযোগ্য। তাই রেট বাড়িয়ে দিয়েছে। পাঁচ টাকাই দিয়ে দাও। কিন্তু সে-ও এঁটে বসেছে। বলল, আজকাল এইরকমই হচ্ছে, মাইনের টাকা মদ-মাংসে খরচ করে মেয়ের বিয়ের জন্য ঘুষ নিচ্ছে। নকলবাবু এ কথায় রেগে গেল। বলল, যাও, এই ব্যাপারে আমি ঘুষই নেব না। যা করার দরকার, নিয়ম অনুযায়ী করব। উকিলরা অনেক বোঝালেন, এমন কথা বোলো না, ল্যাংড়া ভক্ত মানুষ; ওর কথায় দোষ ধোরো না। কিন্তু নকলবাবুর রাগ একবার যখন চড়ে গেছে তখন আর নামল না।

"সত্যি কথা বলতে কি রঙ্গনাথবাবু, ল্যাংড়া মিথ্যে কিছু বলে নি। এদেশে মেয়ের বিয়ে দেওয়া চুরি করার একটা ছুতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন ঘুষ নেয় তো আর-একজন বলে, কী করবে বেচারা! বড়ো বংশ, মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে। সমস্ত বদমাশির ওজুহাত হয়ে দাঁড়ায় মেয়েদের বিয়ে।

"যা-ই হোক, ল্যাংড়া আর নকলবাবুর মধ্যে বেশ হুজ্জত হ'ল। আজকাল ঘুষের ব্যাপারে কথায় কথায় হুজ্জত হয়। আগে সহজেই কাজ হ'ত। পুরনো লোকেরা কথায় পাকা হ'ত। এক টাকা ঠেকিয়ে দাও তো পরের দিন নকল তৈরি। এখন স্কুল থেকে আসা নতুন নতুন ছেলে দপ্তরে ঢুকে পড়ছে আর লেনদেনের রেট নষ্ট করে দিচ্ছে। আর এদেরই দেখাদেখি পুরনো লোকেরাও

খামখেয়ালি করছে। এখন ঘুষ দেওয়া আর ঘুষ নেওয়া— তুই-ই খুব ঝঞ্ঝাটের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"ল্যাংড়ারও রাগ হয়ে গেল। সে কণ্ঠী ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল, যাও বাবু, তুমি নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে তো আমিও নিয়ম অনুযায়ীই কাজ করব। এখন আর তোমাকে এক কাণাকড়িও দেব না। আমি দরখাস্ত জমা দিয়েছি, একসময় না একসময় আমার পালা তো আসবেই।

"এরপর ল্যাংড়া তহসিলদারের কাছে সব কথা বলল। তহসিলদার প্রথমে খুব হাসল, তারপর বলল, সাবাস ল্যাংড়া, তুমি ঠিক করেছ। তোমার এই লেনদেনের মধ্যে যাবার কোনো দরকার নেই। পালা এলেই তুমি নকল পেয়ে যাবে। তারপর সে পেশকারকে বলল, দেখো, ল্যাংড়া বেচারা চারমাস ধরে ঘুরছে। এখন নিয়ম অনুসারে কাজ হওয়া চাই, একে যেন কেউ হয়রান না করে। এতে পেশকার বলল, হুজুর, এই ল্যাংড়াটার মাথা খারাপ, আপনি এর ঝামেলার মধ্যে যাবেন না। ল্যাংড়া এ কথায় পেশকারের ওপর রেগে উঠল। ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। তহসিলদার কোনো রকমে তুজনের মধ্যে একটা সন্ধি করিয়ে দিল।

"ল্যাংড়া জানে যে, নকলবাবু কোনো-না-কোনো ওজুহাতে তার দরখাস্ত খারিজ করে দেবে। দরখাস্ত বেচারার তো পিঁপড়ের প্রাণ। তাকে মারার জন্য বেশি শক্তির দরকার হয় না। দরখাস্তটা যে-কোনো সময়ে খারিজ করানো যেতে পারে। ফিয়ের টিকিট কম লাগানো হয়েছে, ফাইলের নম্বর ভুল লেখা হয়েছে, একটা ঘর ভরা হয় নি— এইরকম একটা-না-একটা কথা লিখে প্রথমে নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তারপর নোটিশে দেওয়া তারিখের

মধ্যে দরখাস্তটা ঠিক করে না দিলে দরখাস্তটা খারিজ করে দেওয়া হয়।

"তাই ল্যাংড়া এবার ভালোভাবেই সব তৈরি করে নিয়েছে। সে তার গ্রাম থেকে চলে এসেছে। বাড়িতে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। জোত-জমি, ফসল, ষাঁড়-বলদ সব ভগবানের ভরসায় ছেড়ে এসেছে। এখানে এক আত্মীয়ের কাছে এসে উঠেছে আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তহসিলের নোটিশ বোর্ডের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে কাটাচ্ছে। তার ভয়, এমন যেন না হয় যে, নোটিশ বোর্ডে তার দরখাস্তের খবর বার হ'ল আর সে তা জানতে পারল না। দেরি হয়ে গেলে দরখাস্ত খারিজ হয়ে যায়। আগে একবার এইরকম হয়েছে।

"নকল নেবার সমস্ত নিয়ম সে মুখস্থ করে ফেলেছে। ফিয়ের পুরো চার্ট তার কণ্ঠস্থ। মানুষের কর্মফল যখন খারাপ হয় তখনই তাকে থানা-কাছারির মুখ দেখতে হয়। ল্যাংড়ারও কর্মফল খারাপ। কিন্তু এবার যে রকমভাবে সে তহসিলে লেগে আছে তাতে মনে হয়, পাট্টার নিয়ম সে নিয়েই ছাড়বে।"

ক্লার্ক যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। প্রিন্সিপাল চারদিকে একবার তাকিয়ে বললেন, "বদ্রীভাইকে দেখতে পাচ্ছি না।"

বৈদ্যজী বললেন, "একজন আত্মীয় ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়েছে। পুলিসের লীলা তো অপার, জানোই। বদ্রী তাই সেখানে গেছে। আজই হয়তো ফিরে আসবে।"

শনিচর চৌকাঠের ধারে বসে ছিল। মুখ দিয়ে সিটি বাজাতে বাজাতে বলল, "যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ ভালো।"

প্রিন্সিপালসাহেব ভাং খেয়ে এতক্ষণে ভুলে বসে আছেন যে, আরাম হচ্ছে হারাম। একটা বড়ো তাকিয়া টেনে নিয়ে আরাম করে বসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপারটা কী ?"

শনিচর খুব ধীরে ধীরে বলল, "কো-অপারেটিভ ইউনিয়নে চুরি হয়েছে। বদ্রীভাই জানতে পারলে সুপারভাইজারকে খেয়ে ফেলবে।"

প্রিন্সিপাল শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনিও ঐ রকম ফিসফিস করে বললেন, "এই ব্যাপার !"

শনিচর মাথা নিচু করে কিছু বলতে শুরু করেছিল, এমন সময় বৈদ্যজী ধমকের সুরে বলে উঠলেন, "কী মেয়েদের মতো ফিসফিস করছ ! কো-অপারেটিভে চুরি হয়েছে তো কী এমন বড়ো জিনিস হয়েছে ? কোন্ ইউনিয়নে এমনটা হয় না ?"

একটু থেমে বোঝানোর মতো করে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "আমাদের ইউনিয়নে আগে কখনও চুরি হয় নি। তাই লোকে আমাদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। এখন তো আমরা বলতে পারি, আমরা খাঁটি মানুষ। আমাদের এখানে চুরি হয়েছে, কিন্তু আমরা তা গোপন করি নি। যেমনটা হয়েছে, আমরা তেমনটা বলে দিয়েছি।"

জোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন, "ভালোই হয়েছে। একটা কাঁটা বেরিয়ে গেছে। চিন্তা দূর হয়েছে।"

প্রিন্সিপালসাহেব তাকিয়া হেলান দিয়ে স্থির হয়ে বসে ছিলেন। শেষে তিনি এমন একটা কথা বললেন, যেটা সকলেরই জানা। তিনি বললেন, "আজকাল মানুষ বড়ো বেইমান হয়ে গেছে।"

কথাটা খুবই কাজের, আর প্রতিটি ভালো লোক মাল্টিভিটামিন

ট্যাবলেটের মতো দিনে তিনবার খাবার পর তা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু ক্লার্ক যেন এই কথায় ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা দুঃখিত হ'ল। সে বলল, "মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। আমাদের কলেজে তো আজ পর্যন্ত এমনটা হয় নি!"

বৈদ্যজী অন্তরঙ্গভাবে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের চুরিতে বীজগুদাম থেকে গম বার করে নেওয়া হয়েছে। সেইদিকেই ইঙ্গিত করে বৈদ্যজী বললেন, "কলেজে চুরি হবে কী করে? ওখানে তো গমের গুদাম থাকে না।"

তিনি ঠাট্টা করেই কথাটা বললেন। প্রিন্সিপালসাহেব হাসলেন, একবার হাসি শুরু হ'ল তো ভাঙের নেশায় তিনি হাসতেই থাকলেন। ক্লার্ককে দুঃখভারাক্রান্ত মনে হচ্ছিল। সে বলল, "কিন্তু কাকা, কলেজে তো শয়ে শয়ে ভুসির গুদাম আছে। প্রত্যেকের মাথায় তো কেবল ভুসি ভরা।"

এটা আমাদের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য যে, ঘণ্টা দু-চার কথা বলার পর শেষকালেই আসল কথাটা বার হয়। তাই বৈদ্যজী এবার প্রিন্সিপালসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কোনো জরুরি কথা আছে?"

"কিচ্ছু না। ঐ খান্নার ব্যাপারটা। পরশু কালো চশমা পরে ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন। আমি ওখানেই ধমকে দিলাম। ছেলেদের বখাচ্ছিলেন। আমি বললাম, 'দেখো পুত্রবর, তোমাকে আমি এখানেই ঘষটে ফিতে বানিয়ে দেব।'"

প্রিন্সিপালসাহেব খুব আত্মসংযমের পরিচয় দিলেন, কিন্তু কথাটা শেষ করতে করতে শেষ পর্যন্ত তাঁর মুখ দিয়ে ফিক্ ফিক্ হাসির মতো একটা জিনিস বেরিয়েই গেল।

বৈদ্যজী গম্ভীর হয়ে বললেন, "এরকম করা উচিত নয়। বিরোধীদের সঙ্গেও সদ্‌ব্যবহার করা উচিত। দেখো-না, প্রত্যেক বড়ো নেতার একজন করে বিরোধী আছে। সবাই স্বেচ্ছায় নিজের নিজের বিরোধীকে ধরে রেখেছে। এটাই গণতন্ত্রের নীতি। আমাদের নেতারা কত ভদ্রভাবে বিরোধীদের সহ্য করে। বিরোধীরা তাদের বক্তব্য বলেই যায় আর নেতারা চুপচাপ নিজেদের চাল চাল্‌তে থাকে। কেউ কারও দ্বারা প্রভাবিত হয় না। একেই বলে আদর্শ বিরোধ। আপনাকেও এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।"

ক্লার্কের ওপর রাজনীতির এই-সব মৌলিক সিদ্ধান্তের কোনো প্রভাব পড়ল না। সে বলল, "এতে কিছুই হয় না কাকা। খান্নামাস্টারকে আমি চিনি। ইতিহাসের এম. এ., কিন্তু নিজের বাবার নাম পর্যন্ত জানেন না। কেবল পার্টিবাজিতে ওস্তাদ। বাড়িতে ছেলেদের ডেকে নিয়ে গিয়ে জুয়া খেলান। ওঁকে ঠিক করার কেবল একটা উপায়ই আছে। একদিন ধরে দমাদম লাগিয়ে দিতে হবে।..."

বৈদ্যজী এ কথায় আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিন্তু অন্যরা উৎসাহিত হয়ে উঠল। এখন আলোচনার মোড় জুতো মারার পদ্ধতি আর রীতির দিকে ঘুরে গেল।

শনিচর খুশি হয়ে উঠে বলল, "খান্নার ওপর যখন দমাদম পড়তে আরম্ভ করবে তখন আমাকে বোলো। অনেক দিন আমি কাউকে জুতোই নি। আমিও দু-চার ঘা লাগাতে যাব।" একজন বলল, ছেঁড়া জুতো তিনদিন জলে ভিজিয়ে তারপর তা দিয়ে মারলে ভালো আওয়াজ হয়, দূরদূরান্তের লোকেরা বুঝতে পারে, জুতো চলছে। আর-একজন বলল, লেখাপড়া জানা লোককে জুতো মারতে হলে

গোরক্ষক জুতো ব্যবহার করা উচিত, যাতে মারাও হবে, বেশি বেইজ্জতিও হবে না। চবুতরার ওপর তৃতীয় একটা লোক বসে ছিল, সে বলল, জুতো মারার ঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, গুনে গুনে এক শো জুতো মারতে আরম্ভ করবে, কিন্তু নিরানব্বই পর্যন্ত আসতে আসতে আগের গোনা ভুলে যাবে এবং আবার এক থেকে গুনে গুনে নতুন করে মারতে শুরু করবে। চতুর্থজন এ কথা সমর্থন করে বলল, সত্যি-কারের জুতো মারার এটাই রীতি, আর তাই আমিও এক শো পর্যন্ত গুনতে আরম্ভ করে দিয়েছি।

ছয়

রামাধীনের পুরো নাম বাবু রামাধীন ভিখমখেড়বী। ভিখমখেড়া শিবপালগঞ্জের পার্শ্ববর্তী এক বিলুপ্ত গ্রাম। কয়েকটা কুঁড়েঘরে মাল বিভাগের নথিপত্র আর বাবু রামাধীনের পুরনো কবিতার মধ্যেই এখন এই গ্রামটা বেঁচে আছে।

ছেলেবেলায় বাবু রামাধীন ভিখমখেড়া গ্রাম থেকে বেরিয়ে রেল-লাইন ধরে শহর পর্যন্ত যান। সেখান থেকে কোনো একটা ট্রেনে বসার কথা ভেবে শেষে কিছু না ভেবেই কলকাতায় পৌঁছন। কলকাতায় প্রথমে তিনি এক ব্যবসায়ীর ওখানে চিঠি নিয়ে যাবার কাজ করেন। তারপর মাল নিয়ে যাবার পরে তিনি তার সঙ্গে

পার্টনারশিপে ব্যবসা শুরু করে দেন। এবং শেষে পুরো ব্যবসাটারই মালিক হয়ে বসেন।

ব্যবসাটা ছিল আফিঙের। পশ্চিম থেকে কাঁচা আফিং আসত, সেই আফিং কতকগুলো উপায়ে কলকাতাতেই বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী-দের কাছে পৌঁছে দেবার ভার তাঁর ওপর ছিল। সেখান থেকে দেশের বাইরে পাঠানোর কাজও তিনি নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তিনি চুপচাপ তাঁর নিজের কাজ করে যেতেন। কাজের পর যে সময়টুকু বাঁচত সেই সময়ে তিনি পশ্চিমের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা লোকদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। সেখানে তিনি তাঁর স্বক্ষেত্রের লোকদের মধ্যে যথেষ্ট বিখ্যাত ছিলেন। লোকে তাঁর অশিক্ষার তারিফ করত আর তার নাম নিয়ে বোঝার চেষ্টা করত, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী ছাড়াই আকবর প্রভৃতি অশিক্ষিত বাদশারা কী দক্ষতার সঙ্গেই না শাসন চালিয়ে গেছেন!

আফিঙের ব্যবসায় ভালো লাভ হ'ত। তবে অন্যান্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে বেশ প্রতিযোগিতা করতে হ'ত। এই ব্যবসায় একটা ছোট্ট দোষ ছিল এই যে, এটা আইনবিরুদ্ধ ছিল। প্রসঙ্গটা উঠলেই বাবু রামাধীন তাঁর বন্ধুদের বলতেন, "এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি? আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে তো আর আইন তৈরি করা হয় নি।"

বাবু রামাধীনকে যখন আফিং আইনে গ্রেপ্তার করে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আনা হয়েছিল তখনও তিনি এ কথা বলেছিলেন। ইংরেজদের তৈরি আইনের নিন্দা করে তিনি মহাত্মা গান্ধীর দোহাই দিয়ে বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, বিদেশী আইন খামখেয়ালিভাবে তৈরি করা হয়েছে আর প্রত্যেকটা ছোটোখাটো ব্যাপারকে অপরাধ নাম দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "জনাব, আফিং এক রকম গাছ থেকে

তৈরি হয়। গাছ জন্মাবার পর তাতে সুন্দর সুন্দর সাদা ফুল ধরে। ইংরেজীতে তাকে পপি বলে। এর একটা অন্য জাতও আছে, তাতে লাল ফুল হয়। সাহেবরা এই গাছ তাঁদের বাংলোতে লাগান। এই ফুলের আরও একটা জাত আছে। তাকে ডবল পপি বলা হয়। হুজুর, এ-সব ফুলপাতার ব্যাপার, এর সঙ্গে অপরাধের কী সম্পর্ক? ঐ সাদা ফুলওয়ালা পপিগাছ থেকে পরে এই কালো কালো জিনিস তৈরি হয়। এটা ওষুধে লাগে। এর ব্যবসা অপরাধ হতে পারে না। যে আইনে একে অপরাধ বলা হয়েছে সে আইন কালা আইন। আমাদের ধ্বংস করার জন্যই ঐ আইন তৈরি করা হয়েছে।"

এই বিরাট লেকচার সত্ত্বেও বাবু রামাধীনের দু বছরের জেল হয়ে গেল। সে আমলে জেল তো হ'তই, কিন্তু আসল জিনিস ছিল জেলের আগে এজলাসে দেওয়া লেকচার। বাবু রামাধীন জানতেন যে, এইরকম লেকচার দিয়ে শয়ে শয়ে লোক— বিপ্লবীদের থেকে শুরু করে অহিংসাবাদীদের পর্যন্ত— শহিদ হয়েছেন। তাই তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, এই লেকচার দিয়ে শহিদ হওয়া তাঁর পক্ষেও সহজ হবে। কিন্তু জেল খেটে বেরিয়ে আসার পর তিনি জানতে পারলেন যে, শহিদ হবার জন্য তাঁর আফিং আইন নয়, লবণ আইন ভাঙা উচিত ছিল। কিছুদিন কলকাতায় ঘোরাঘুরি করে তিনি দেখতে পেলেন যে, বাজার থেকে তিনি উচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। মনের দুঃখে তিনি কয়েকটা কবিতা আওড়ালেন, তারপর টিকিট কেটে নিজের গ্রামে ফিরে এলেন। এবং শেষে শিবপাল-গঞ্জেই বসতি করলেন।

লোকদের তিনি কিছুটা সত্যি কথা বললেন, তাঁর আড়ত বন্ধ

হয়ে গেছে। এর বেশি আর কিছু বলার দরকার ছিল না। তিনি শিবপালগঞ্জে ছোটো রকম একটা কাঁচাপাকা বাড়ি বানিয়ে নিলেন। কিছু জমি নিয়ে চাষ-আবাদও শুরু করে দিলেন। গ্রামের ছেলেদের কড়ির বদলে তাস দিয়ে জুয়াখেলা শিখিয়ে দিলেন। এবং দরজার ধারে চারপায়াতে পড়ে পড়ে কলকাতার গল্প শোনানোর দক্ষতা অর্জন করলেন। সেই সময়ে গ্রাম-পঞ্চায়েত হ'ল, আর কলকাতার কেরামতির সাহায্যে তিনি তাঁর এক খুড়তুতো ভাইকে তার সভাপতি বানিয়ে দিলেন। গোড়ার দিকে লোকেরা জানত না সভাপতি কী, তাই তাঁর ভাইকে এই পদের জন্য নির্বাচনে লড়তে পর্যন্ত হয় নি। কিছুদিন পরেই লোকেরা জানতে পারল যে, গ্রামে দুজন সভাপতি আছেন— গ্রামসভার জমি পাট্টা দেবার জন্য বাবু রামাধীন আর দরকার হলে চুরির মামলায় জেল যাবার জন্য তাঁর খুড়তুতো ভাই।

একটা সময় গ্রামে বাবু রামাধীনের খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর বাড়ির সামনে খড়ের চালের একটা বাংলো ছিল। গ্রামের ছেলেরা তার ভেতরে জুয়া খেলত। বাংলোর এক দিকে ভাঙের টাটকা পাতা বাঁটা হ'ত। পরিবেশটা বেশ কাব্যিকই ছিল। এই গ্রামে তিনিই প্রথম ক্যানা, ন্যাস্টারশিয়াম, লার্কস্পার প্রভৃতি বিলিতি ফুল লাগান। তার মধ্যে লাল রঙেরও কিছু ফুল ছিল। সেই ফুল সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই বলতেন, "এটা পপি, আর এই শালা ডবল পপি।"

বাইরে থেকে ফেরার সময় গ্রামের বাইরে একজন লোক বদ্রী পালোয়ানের রিকশা থামাল। একটু অন্ধকার হয়ে এসেছিল,

তাই লোকটাকে দূর থেকে দেখা গেল না। বদ্রী পালোয়ান বলে উঠলেন, "কে রে?"

"রে-টে কোরো না পালোয়ান। আমি রামাধীন।" —বলতে বলতে লোকটা রিকশার কাছে এসে দাঁড়াল। রিকশাওয়ালা একেবারে রাস্তার মাঝখানে রিকশাটা থামাল। লোকটার পরনে ধুতি-জামা। আবছা অন্ধকারে অন্য লোকদের মধ্যে তাকে চেনা যায় ধুতিজামায় নয়, কামানো মাথায়। রিকশার হ্যাণ্ডেলটা ধরে সে বলল, "আমার বাড়িতে ডাকাত পড়ছে, শুনেছ?"

পালোয়ান রিকশাওয়ালার পিঠে একটা আঙুলের খোঁচা মেরে এগুনোর ইঙ্গিত দিলেন। তারপর বললেন, "তা এখন থেকে হৈচৈ শুরু করে দিয়েছ কেন? যখন ডাকাত পড়বে তখন আমাকে ডেকো।"

রিকশাওয়ালা প্যাডলে চাপ দিল, কিন্তু রামাধীন হ্যাণ্ডেলটা এত জোরে ধরে রেখেছিলেন যে, রিকশা এগুতে পারল না, আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। বদ্রী পালোয়ান বিড়বিড় করে বললেন, "এ আবার কোন্ আপদ, রাস্তার মাঝখানে রিকশা ধরে ষাঁড়ের মতো কাঁদতে শুরু করে দিলে।"

রামাধীন বললেন, "কাঁদছি না, অভিযোগ করছি। বৈদ্যজীর বাড়িতে তুমিই একমাত্র মানুষ, আর সবাই তো ভুসি। তাই তোমাকে বলছি। একটা চিঠি এসেছে, তাতে ডাকাতরা আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছে। বলেছে, অমাবস্যার রাত্রে দক্ষিণদিকের টিলার ওপর দিয়ে যেয়ো··· ।"

বদ্রী পালোয়ান উরু চাপড়ে বললেন, "ইচ্ছে হলে দিয়ে এসো, আর যদি ইচ্ছে না হয় তা হলে এক কাণাকড়িও দেবার দরকার নেই। এর বেশি আর কী বলব। চলো রিকশাওয়ালা।"

কাছেই বাড়ি। বাইরে ভাং হয়তো তৈরিই আছে। ভাং খেয়ে, চানটান করে, কোমরে ভালো করে ল্যাঙট কষে, ওপর থেকে একটা জামা চড়িয়ে বৈঠকখানায় আরাম করে বসা যাবে। লোকে জিজ্ঞাসা করবে, পালোয়ান কী করে এলে?— তিনি চোখ বুজে অন্যদের প্রশ্ন শুনবেন, তাদেরই জবাব দিতে দেবেন। দেহের শক্তি আর ভাঙের ঘুম-ঘুম ভাবের মধ্যে সারা পৃথিবীর আওয়াজ তাঁর কাছে মশার ভনভনানির মতো মনে হবে।

বদ্রী স্বপ্নের মধ্যে ডুবে ছিলেন, এমন সময় রাস্তার ওপর রিকশা দাঁড় করানোটা তাঁর খুব খারাপ লাগল। রিকশাওয়ালাকে ধমক দিয়ে আবার তিনি বললেন, "তোমাকে বলছি, চলো।"

কিন্তু যাবে কী করে? রামাধীন এখনও রিকশার হ্যাণ্ডেলটা ধরে আছেন। তিনি বললেন, "টাকার কথা নয়, আমার কাছ থেকে টাকা নেওয়া সোজা ব্যাপার নয়। আমি তোমাকে বলতে চাইছি, রুপ্পনকে আটকাও। নিজেকে ও বড়ো বেশি লায়েক ভাবতে শুরু করেছে। নিচু দিয়ে চলে, আকাশের··· ।"

বদ্রী পালোয়ান উরুতে জোর দিয়ে রিকশা থেকে নিচে নামলেন। রামাধীনকে ধরে রিকশাওয়ালার কাছ থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "কেন মুখ নষ্ট করতে যাচ্ছ? কী করেছে রুপ্পন?"

রামাধীন বললেন, "আমার বাড়িতে ডাকাতির এই চিঠি রুপ্পনই পাঠিয়েছে। আমার কাছে প্রমাণ আছে।"

পালোয়ান বিড়বিড় করে বললেন, "দু-চার দিনের জন্য যে একটু বাইরে যাব তার উপায় নেই। ওদিকে গেলাম তো এদিকে ন্যাকামি শুরু হয়ে গেল।" খানিক চিন্তা করে তিনি বললেন, "তোমার কাছে প্রমাণ আছে তো ঘাবড়াবার কী আছে?"

রামাধীনকে অভয় দিয়ে তিনি জোরে বলে উঠলেন, "তা হলে তোমার ওখানে ডাকাতটাকাত পড়বে না। যাও, নিশ্চিন্তে গিয়ে ঘুমোও। রুপ্পন ডাকাতি করবে না। ছেলেমানুষ, হয়তো ঠাট্টা করেছে।"

রামাধীন কিছুটা রুক্ষ হয়ে বললেন, "সে তো আমিও জানি, রুপ্পন ঠাট্টা করেছে। কিন্তু এ কি একটা ঠাট্টা হ'ল?"

বদ্রী পালোয়ান তাঁর কথায় সায় দিলেন। বললেন, "তুমি ঠিকই বলছ। বড়ো মামুলি ঢঙের ঠাট্টা।"

রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে একটা ট্রাক আসছে। তার আলোয় চোখ ঝলসে গেল। বদ্রী রিকশাওয়ালাকে বলল, "রিকশা এক কিনারায় রাখো। রাস্তাটা তোমার বাপের নয়।"

রামাধীন বদ্রীর স্বভাব জানতেন। এই ধরনের কথা শুনে তিনি বললেন, "অসন্তুষ্ট হবার কথা নয় পালোয়ান। ভেবে দেখো, এটা কি একটা কথা হ'ল।"

বদ্রী পালোয়ান রিকশার কাছে এগিয়ে এসেছেন। রিকশায় বসতে বসতে বললেন, "যখন ডাকাতই পড়ছে না তখন তর্ক কিসের! চলো রিকশাওয়ালা।" এগুতে এগুতে আবার বললেন, "রুপ্পনকে বুঝিয়ে বলব, এটা ঠিক নয়।"

পেছন থেকে রামাধীন গলা চড়িয়ে বললেন, "ও আমার ওখানে ডাকাতির চিঠি পাঠিয়েছে, আর তুমি ওকে শুধু বোঝাবে? এটা বোঝাবার কথা নয়, জুতোবার কথা।"

রিকশা এগিয়ে চলেছে। পালোয়ান মাথা না ঘুরিয়েই জবাব দিলেন, "খুব খারাপ লেগে থাকলে তুমিও আমার ওখানে এ রকম চিঠি পাঠিয়ে দিয়ো।"

সাত

ছাদের ওপর এই ঘরটা যৌথ পরিবারের পাঠ্য বইয়ের মতো সব সময় খোলা পড়ে থাকে। ঘরের এককোণে একজোড়া মুগুর রাখা আছে। তাতে প্রমাণ হচ্ছে যে, সরকারীভাবে ঘরটা বদ্রী পালোয়ানের। তবে বাড়ির অন্যরাও নিজের নিজের ভাবে ঘরটা ব্যবহার করে। বাড়ির মেয়েরা কাঁচ আর মাটির বাসনে করে রাশি রাশি আচার ছাদে রোদ্দুরে দেয় আর সন্ধে হতে হতেই তুলে এনে এই ঘরের ভেতর রেখে দেয়। ছাদে কাপড়ও শুকোনো হয়। ঘরের এক দিকে একটা দড়ি টাঙানো। সন্ধ্যাবেলায় তার ওপর গামছা আর পেটিকোটের সঙ্গে ল্যাঙট আর কাঁচুলিও ঝুলতে দেখা যায়। বৈদ্যজীর ওষুধঘরের অনাবশ্যক শিশিগুলোও ঘরের এক আলমারির মধ্যে জমা করে রাখা হয়েছে। প্রায় সব শিশিই খালি। শিশিগুলোর গায়ে সচিত্র বিজ্ঞাপন: "ব্যবহারের আগে" -শীর্ষক বিজ্ঞাপনে একটা আধমরা অর্ধমানবের ছবি, আর "ব্যবহারের পরে" -শীর্ষক বিজ্ঞাপনে এমন একটা লোকের ছবি, যার পাকানো গোঁফ আর কষা ল্যাঙট— অর্থাৎ খুব ভালো স্বাস্থ্য। এই-সব বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয়, শিশিগুলো হাজার হাজার মানুষকে সিংহ বানায়, তবে তারা তাদের স্নানঘরে আর শোবার

ঘরেই সিংহের মতো কোমর বেঁকিয়ে চলে, বাইরে ছাগলেরও অধম।

বাড়ির সকলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা করছে এই ঘরটা। ঘরটাকে দেখে লোকের মনে এখানকার সংস্কৃতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জন্মাতে পারে। ঘরটাকে দেখার পর কোনো সমাজ-সংস্কারকই বলতে পারবেন না যে, পূর্ব গোলার্ধে যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় কোনো দিক দিয়ে কোনোরকম বিপদ আছে।

এই ঘরটাতেই রঙ্গনাথকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। তাকে এখানে চার-পাঁচ মাস থাকতে হবে। বৈদ্যজী ঠিক কথাই বলেছেন, এম. এ. পড়তে পড়তে যে-কোনো সাধারণ ছাত্রের মতো রঙ্গনাথেরও শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে, জ্বর হচ্ছে ; যে-কোনো সাধারণ ভারতীয়ের মতো ডাক্তারি চিকিৎসায় বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও সে ডাক্তারি ওষুধ খেয়েছে, কিন্তু তাতে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি ; যে-কোনো সাধারণ শহুরের মতো সে-ও মনে করে শহরের ওষুধ আর গ্রামের ওষুধ একই রকম, তাই সে এখানে থাকার জন্য চলে এসেছে ; যে-কোনো সাধারণ মূর্খের মতো সে-ও এম. এ. পাস করার পর চাকরি না পেয়ে রিসার্চ শুরু করেছিল, কিন্তু যে-কোনো সাধারণ বুদ্ধিমানের মতো সে-ও জানত যে, রিসার্চ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার আর রোজ লাইব্রেরিতে বসার দরকার নেই। তাই সে ঠিক করেছে, কিছুদিন গ্রামে থেকে বিশ্রাম করবে, স্বাস্থ্য ফেরাবে, পড়াশোনা করবে, দরকার হলে শহরে গিয়ে বই বদল করে আনবে আর বৈদ্যজীকে প্রতিটি স্তরে ভদ্রভাষায় এ কথা বলার সুযোগ দেবে যে, আমাদের যুবকরা যদি নিষ্কর্মা না হ'ত তা হলে আমাদের মতো বুড়োদের এই-সব দায়িত্ব পালন করতে হ'ত না।

ওপরের ঘরটা বেশ বড়ো। রঙ্গনাথ এসেই ঘরটার একটা অংশে তাঁর দখল কায়েম করল। জায়গাটা পরিষ্কার করিয়ে তার নির্দেশে সেখানে স্থায়ীভাবে একটা চারপাই এনে রাখা হ'ল। তার ওপর স্থায়িভাবে একটা বিছানাও পাতা হ'ল। পাশের আলমারিতে বইগুলো রাখা হ'ল। আর তার মধ্যে পকেটী গোয়েন্দা অথবা গুপ্ত সাহিত্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হ'ল। কলেজ থেকে একটা ছোটো টেবিল আর চেয়ারও এনে বসানো হ'ল। চার-পাইয়ের ধারেই দেওয়ালে একটা জানলা আছে। জানলাটা খুললেই সামনের বাগান আর ক্ষেত দেখা যায়।

রুপ্পনবাবু কোথা থেকে কিছু ইঁটপাথর এনে সেগুলো জোড়া-তাড়া দিয়ে একটা রেডিওর মতো তৈরি করেছেন। ঘরটার ওপর বাঁশ আর ধারেকাছের গাছপালার সাহায্যে লম্বা লম্বা তারও টাঙিয়ে দিয়েছেন। তাতে মনে হচ্ছে, এখানে এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো ট্রান্সমিশন সেণ্টার আছে। কিন্তু ভেতরের রেডিও একটা হেডফোন দিয়েই শুনতে হয়। রঙ্গনাথ মাঝে মাঝে হেডফোনটা কানের সঙ্গে এঁটে ধরে স্থানীয় সংবাদ আর বৈষ্ণব সাধুদের শোকাবিষ্ট ভজনগান শোনে আর ভাবে, অল ইণ্ডিয়া রেডিও এখনও আগেরই মতো হাজার গালাগালি খেয়েও বেহায়ার মতো তার পুরনো পথ থেকে একচুল নড়ে নি।

কিছুদিন পরে রঙ্গনাথ নিজে একটা শস্তা রেডিও সেট আনিয়ে নিল।

রঙ্গনাথের কর্মসূচী বৈদ্যজীর পরামর্শ অনুযায়ীই তৈরি করা হয়েছে। খুব সকালে ওঠা, উঠে চিন্তা করা যে, কাল যা খেয়েছে সব হজম হয়ে গেছে (ব্রাহ্ম মুহূর্তে উত্তিষ্ঠেত জীর্ণাজীর্ণ নিরূপয়ন্),

তামার ঘটিতে রাখা ঠাণ্ডা জল খাওয়া, অনেকদূর বেড়াবার জন্য বেরিয়ে যাওয়া, নিত্যকর্ম করা (কারণ, পৃথিবীতে এই একটা কর্মই নিত্য, বাকিসব অনিত্য), বেড়াতে বেড়াতে ফিরে আসা (পরং চক্রমণং হিতম্), মুখহাত ধোয়া, দাঁতন চিবিয়ে তা দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা (নিম্বস্য তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে বব্বুলস্তথা), ঈষদুষ্ণ জলে কুলকুচি করা (সুখোষ্ণোদক গণ্ডূষৈঃ জায়তে বক্ত্র লাঘবম্), ব্যায়াম করা, দুধ খাওয়া, পড়াশোনা করা ; দুপুরে আহার করা, বিশ্রাম নেওয়া, পড়াশোনা করা ; সন্ধ্যায় বেড়াতে যাওয়া, ফিরে আবার সাধারণ ব্যায়াম করা, বাদাম-মনক্কা ইত্যাদি খাওয়া, পড়াশোনা করা, খাওয়া, পড়াশোনা করা, তারপর শোয়া।

রঙ্গনাথ খুব নিষ্ঠার সঙ্গে এই কর্মসূচী পালন করতে লাগল। এতে সংশোধন শুধু এইটুকু হ'ল যে পড়াশোনার জায়গাটা দখল করল বৈদ্যজীর বৈঠকখানায় গ্রামবাসী অর্থাৎ শিবপালগঞ্জবাসীদের সঙ্গে আড্ডা।

কিছুদিনের মধ্যে শিবপালগঞ্জ সম্বন্ধে রঙ্গনাথের মনে হতে লাগল যে, এটা মহাভারতের মতো। যা কোথাও নেই তা এখানে আছে আর যা এখানে নেই তা কোথাও নেই। তার মনে হ'ল, আমরা ভারতবাসীরা এক, আর সব জায়গায় আমাদের বুদ্ধি একই রকম। রঙ্গনাথ দেখল, সমস্ত বড়ো বড়ো খবরের কাগজ প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই বড়ো বড়ো হরফে যার প্রশংসা করতে শুরু করে, যার সাহায্যে বড়ো বড়ো নিগম, আয়োগ আর প্রশাসন ওঠে, পড়ে, ঘষটায়—সেই দাঁও-প্যাঁচ আর কলাকৌশলের সর্বভারতীয় প্রতিভা এখানেও কাঁচা মালের মতো প্রচুর পড়ে রয়েছে। এ কথা ভাবতেই

ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতি তার আস্থা আরও মজবুত হয়ে গেল।

শিবপালগঞ্জ একটা গ্রাম। তবে শহর থেকে কাছে আর রাস্তার ধারে। তাই বড়ো বড়ো নেতা আর অফিসারদের এখানে আসতে নীতিগতভাবে কোনো আপত্তি হয় না। কুয়ো ছাড়া কয়েকটা হ্যাণ্ডপাম্পও আছে এখানে। তাই বাইরে থেকে আসা বড়ো বড়ো লোকদের জলপিপাসা পেলে প্রাণ বিপন্ন না করেই তাঁরা এখানে জল খেতে পারেন। খাবার-দাবরেরও এখানে সুবিধা আছে। এখানকার ছোটোখাটো অফিসারদের মধ্যে এমন কেউ-না-কেউ থাকেই যার ঠাটবাট দেখে এখানকার লোকেরা তাকে একজন প্রথম সারির দুর্নীতিপরায়ণ লোক বলে মনে করেন আর বাইরের লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, "লোকটা কত ভদ্র! খুব বড়ো-বংশের ছেলে। জানো তো, এর সঙ্গে চীকোসাহেবের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে।" তাই ক্ষিধে পেলে তাঁরা তাঁদের সততা না খুইয়েও এখানে খেতে পারেন। কারণ যা-ই হোক, এই সময় শিবপালগঞ্জে জন-নায়ক আর জনসেবকদের আসা-যাওয়া বেশ জোরেই শুরু হয়েছে। তাঁদের সকলের চিন্তা, কী করে শিবপালগঞ্জের উন্নতি করা যায়। আর তার ফলে তাঁরা খালি লেকচার দেন।

এইসময় গ্রামে লেকচারের প্রধান বিষয় কৃষি। তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, আগে অন্য বিষয় ছিল। আসলে কয়েকবছর যাবৎ গ্রামের লোকদের বলা হচ্ছে যে, ভারতবর্ষ একটা কৃষিপ্রধান দেশ। গ্রামের লোকেরা এ কথায় আপত্তি তোলে না; কিন্তু প্রত্যেক বক্তাই প্রথম থেকে মনে করেন যে, তারা এতে আপত্তি

তুলবে। তাই তাঁরা একটার পর একটা যুক্তি খুঁজে বার করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, ভারতবর্ষ সত্যিই এক কৃষিপ্রধান দেশ। তারপর তাঁরা বলেন, কৃষির উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। তারপর আর কিছু বলার আগেই দুপুরের খাবার সময় হয়ে যায় আর ঐ ভদ্র ছেলেটা, যে সম্পন্ন ঘরের ছেলে আর যার সঙ্গে চীকোসাহেবের মেয়ের বিয়ে হবে, সে বক্তার পিঠের কাপড়ে টান দিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে বলতে থাকে, "কাকা, খাবার তৈরি।" কখনও কখনও কোনো কোনো বক্তা আগের কথাও বলতে থাকেন আর তখন মনে হয়, তাঁর আগের কথার সঙ্গে পরের কথার কোনো পার্থক্য নেই, কারণ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাঁরা সেই একই কথা বলেন, "ভারত একটা কৃষিপ্রধান দেশ। তোমরা কৃষক, তোমাদের ভালোভাবে চাষ-আবাদ করতে হবে, অধিক ফসল ফলাতে হবে।" প্রত্যেক বক্তাই যেন এই সন্দেহে আটকে আছেন যে, চাষীরা বেশি ফসল ফলাতে চায় না।

লেকচারের অভাব বিজ্ঞাপন দিয়ে পূরণ করা হয়। আর, শিবপালগঞ্জের দেওয়ালে দেওয়ালে লাগানো অথবা লেখা বিজ্ঞাপন-গুলো এখানকার সব সমস্যা আর তাদের সমাধানের সত্যিকারের পরিচয় দিচ্ছে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে : সমস্যা হচ্ছে, ভারতবর্ষ একটা কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু তার কৃষকরা বদমাশি করে অধিক ফসল ফলাচ্ছে না। এর সমাধান হচ্ছে, কৃষকদের কাছে লেকচার দেওয়া আর তাদের ভালো ভালো ছবি দেখানো। এবং এ-সবের সাহায্যে তাদের বলা যে, "তোমরা যদি তোমাদের নিজেদের জন্য ফসল ফলাতে না চাও তা হলে দেশের জন্য ফলাও।" তাই জায়গায় জায়গায় পোস্টার লাগানো হয়েছে। এই-সব পোস্টারে চাষীদের দেশের জন্য বেশি করে ফসল ফলাতে বলা হয়েছে।

লেকচার আর ছবির প্রভাব চাষীদের উপর বেশ প্রবলভাবেই পড়ে আর সহজ সরল চাষীরাও ভাবে, নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো চাল আছে।

শিবপালগঞ্জে একটা বিজ্ঞাপন বিশেষভাবে বিখ্যাত হয়েছে, এতে একজন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চাষী— তার মাথায় গামছা বাঁধা, কানে বালা ঝোলানো আর গায়ে মেরজাই পরা— গমের উঁচু উঁচু গাছগুলো কাস্তে দিয়ে কাটছে। একজন নারী তার পেছনে দাঁড়িয়ে। আপনা থেকেই খুব খুশি, মুখে তার কৃষিবিভাগের অফিসারদের মতো হাসি। নিচে আর ওপরে ইংরেজী আর হিন্দী অক্ষরে লেখা, "অধিক ফসল ফলাও।" মেরজাই পরা আর বালা ঝোলানো চাষীদের মধ্যে যারা ইংরেজীতে পণ্ডিত তাদের ইংরেজী দিয়ে আর যারা হিন্দীতে পণ্ডিত তাদের হিন্দী দিয়ে পরাস্ত করার কথা ভাবা হয়েছে। আর যারা ঐ দুটো ভাষার কোনোটাই জানে না, তারা পুরুষ আর নারী তো চিনতে পারে। তাদের কাছে আশা করা হয়, পুরুষটার পেছনে হাসতে থাকা নারীর ছবি দেখেই অমনি চাষীরা পেছন ফিরে উন্মাদের মতো অধিক ফসল ফলাতে শুরু করে দেবে। ছবিটা আজকাল শিবপালগঞ্জের অনেক জায়গায় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এখানকার লোকেদের চোখে ছবির পুরুষটার চেহারা অনেকটা বদ্রী পালোয়ানের মতো। নারীর চেহারার ব্যাপারে গভীর মতভেদ আছে। তার চেহারা গ্রামের দেহাতী মেয়েদের মধ্যে কার মতো তা এখনও স্থির হয় নি।

অমনিতে সবচেয়ে জোরাল বিজ্ঞাপন যেটা, সেটা কৃষির নয়, ম্যালেরিয়ার। জায়গায় জায়গায় বাড়ির দেওয়ালে গিরিমাটি দিয়ে লেখা, "ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদে আমাদের সাহায্য করো, মশা নির্বংশ

করো।” এখানেও মনে হয়, চাষীরা গোরুমোষের মতো মশাও পালতে উৎসুক আর তাদের মারার আগে চাষীদের হৃদয়-পরিবর্তন করতে হবে। হৃদয়-পরিবর্তনের জন্য প্রভাব বিস্তার করা দরকার, প্রভাব বিস্তার করার জন্য ইংরেজীর দরকার— এই ভারতীয় যুক্তি অনুসারে মশা মারতে আর ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ করতে সাহায্য করার জন্য সব আবেদনই প্রায় ইংরেজীতে লেখা হয়েছে। তাই প্রায় সকলেই তাকে কবিতার আকারে নয়, চিত্রকলার আকারে মেনে নিয়েছে আর গিরিমাটি দিয়ে দেওয়াল রাঙিয়ে ইচ্ছেমতো ইংরেজী লেখে যারা তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। দেওয়ালে রঙ চড়ে চলেছে, মশা মরে চলেছে। কুকুর ডেকে যাচ্ছে, লোকেরা তাদের পথ দিয়ে হেঁটেই যাচ্ছে।…

একটা বিজ্ঞাপন সরলভাবে বলছে যে, আমাদের অর্থ সঞ্চয় করা উচিত। এই সঞ্চয় করার কথা গ্রামের লোকদের তাদের পূর্ব-পুরুষরা মরার আগেই বলে গেছে আর প্রায় প্রত্যেকেই তা ভালো করে জানে। এতে শুধু এইটুকু নতুনত্ব আছে যে, এখানেও দেশের দোহাই দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও আভাস দেওয়া হয়েছে যে, “যদি তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করতে না পারো তো দেশের জন্য করো।” কথাটা খুবই খাঁটি, কারণ শেঠ-মহাজন, বড়ো বড়ো ওয়াদ্দেদার, উকিল, ডাক্তার সবাই তো নিজেদের জন্য সঞ্চয় করছে, তাই দেশের জন্য ছোটো ছোটো চাষীদের সঞ্চয় করতে কী আপত্তি থাকতে পারে। সবাই নীতিগতভাবে একমত যে, সঞ্চয় করা উচিত। সঞ্চয় করে তা কীভাবে কোথায় রাখতে হবে তা-ও বিজ্ঞাপন আর লেকচারে পরিষ্কার করে বলা হয়। লোকেরা তাতেও কোনো আপত্তি জানায় না। লোকেদের শুধু এই কথাটাই বলা হয় না

যে, "কিছু সঞ্চয় করার আগে তোমাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে তোমাদের কত পাওয়া উচিত।"

কিন্তু রঙ্গনাথকে যে বিজ্ঞাপনগুলো আকর্ষণ করল সেগুলো পাবলিক সেক্টরের বিজ্ঞাপন নয়, প্রাইভেট সেক্টরের। ঐ-সব বিজ্ঞাপনে যে-সব কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে : এই অঞ্চলে সবচেয়ে ব্যাপক রোগ হচ্ছে দাদ। এমন একটা ওষুধ আছে যা দাদের ওপর লাগালে দাদ একেবারে নির্মূল হয়ে সেরে যায়, খেলে সর্দিকাশি দূর হয়, বাতাসায় ভরে জল দিয়ে গিলে ফেললে কলেরায় উপকার হয়। এইরকম ওষুধ পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই ওষুধের আবিষ্কারক আজও বেঁচে আছেন। এটা বিলিতি লোকদের নষ্টামি যে, এখনও তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নি।

এদেশে আরও বড়ো বড়ো ডাক্তার আছেন, যাঁরা নোবেল পুরস্কার পান নি। তাঁদের একজন শহর জাহানাবাদে থাকেন। সেখানে এখন বিদ্যুৎ আসায় পুরুষত্বহীনতার চিকিৎসা তিনি বিদ্যুতের সাহায্যেই করেন। পুরুষত্বহীনদের এখন আর চিন্তা করার দরকার নেই। আর একজন ডাক্তার আছেন, যিনি অন্তত সারা ভারতবর্ষে তো বিখ্যাত বটেনই বাইরেও হয়তো বিখ্যাত। তিনি বিনা অপারেশনে অণ্ডকোষবৃদ্ধি রোগের চিকিৎসা করেন। এ-সব কথা শিবপালগঞ্জের যে-কোনো দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে লেখা দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শিশুদের শুকিয়ে যাওয়া, চোখের অসুখ, পেট খারাপ প্রভৃতি রোগের ওষুধেরও অনেক বিজ্ঞাপন আছে। কিন্তু আসল রোগ মাত্র তিনটি— দাদ, অণ্ডকোষ-বৃদ্ধি আর পুরুষত্বহীনতা। এ-সব রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি শিবপাল-

গঞ্জের ছেলেরা অক্ষরজ্ঞানের পরেই দেওয়ালের লেখা থেকে জানতে শুরু করে।

বিজ্ঞাপনের এই ভিড়ে বৈদ্যজীর "যুবকদের জন্য আশার খবর" -শীর্ষক বিজ্ঞাপনের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। এই বিজ্ঞাপন দেওয়ালে লেখা "বিদ্যুতের সাহায্যে পুরুষত্বহীনতার চিকিৎসা"-র মতো অশ্লীল লেখার পর্যায়ে পড়ে না। তাঁর এই বিজ্ঞাপন ছোটো ছোটো রাস্তার মোড়ে, দোকানে আর সরকারী ভবনে যেখানে যেখানে প্রস্রাব করা আর বিজ্ঞাপন লাগানো নিষেধ— সেখানে সেখানে টিনের সুন্দর সুন্দর তক্তার ওপর লাল-সবুজ অক্ষরে লেখা, এবং তাতে শুধু বলা হয়েছে, "যুবকদের জন্য আশার খবর।" তার নিচে বৈদ্যজীর নাম ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

একদিন রঙ্গনাথ দেখল, রোগের চিকিৎসায় একটা নতুন সংযোজন হচ্ছে। সকাল থেকেই কয়েকজন লোক একটা দেওয়ালে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখছে: অর্শ! এটা শিবপালগঞ্জের উন্নতির লক্ষণ। অর্শ— এই দুটো অক্ষর চিৎকার করে বলছে, এখানে অতিসারের যুগ শেষ হতে চলেছে। নরম শরীর, অফিসের চেয়ার, ভদ্র জীবন-যাপন, চব্বিশ ঘণ্টা খাওয়া-দাওয়া আর হাল্‌কা পরিশ্রমের যুগ ধীরে ধীরে সংক্রামিত হচ্ছে, আর আধুনিকতার প্রতীক অর্শ সর্বব্যাপী পুরুষত্বহীনতার মোকাবিলা করতে রণক্ষেত্রে ধেয়ে আসছে। সন্ধ্যার আগেই ঐ দৈত্যাকার বিজ্ঞাপন একটা দেওয়ালে রঙবেরঙের ছাপ ফেলে দিল আর দূর দূর পর্যন্ত ঘোষণা করে দিল: অর্শের অব্যর্থ চিকিৎসা!

দেখতে দেখতে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই গোটা যুগটা অর্শ আর

তার অব্যর্থ চিকিৎসার তলায় চাপা পড়ে গেল। সব জায়গায় ঐ বিজ্ঞাপন দেখা যেতে লাগল। শেষে যখন ঐ বিজ্ঞাপন একটা খবরের কাগজে বেরুল তখন রঙ্গনাথের আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। ঐ খবরের কাগজ রোজ সকাল দশটা নাগাদ শহর থেকে শিবপালগঞ্জে আসে। রঙ্গনাথ দেখল সেদিন খবরের কাগজটার প্রথম পৃষ্ঠার একটা খুব বড়ো অংশ কালো রঙে রাঙানো আর তারও পর বড়ো বড়ো সাদা অক্ষরে জ্বল্ জ্বল্ করছে একটা কথা: অর্শ! অক্ষর তুটোর গড়ন এখানকার দেওয়ালে লেখা বিজ্ঞাপনেরই মতো। তবে ঐ অক্ষরতুটো অর্শকে এক নতুন রূপ দিয়েছে, যার ফলে আশপাশের সব-কিছু অর্শের প্রভাবাধীনে এসে গেছে। খবরের কাগজের পাতায় কালো পটভূমিতে উজ্জ্বল অক্ষরে ছাপা "অর্শ" দূর থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এমন-কি যে শনিচরের বড়ো বড়ো অক্ষরও পড়তে অত্যন্ত কষ্ট হয়, সে-ও খবরের কাগজটার ধারে সরে এল এবং তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ ধরে দেখে শেষে রঙ্গনাথকে বলল, "ঐ জিনিসই।"

এই কথার মধ্যে গর্বের ঝিলিক ছিল: শিবপালগঞ্জের দেওয়ালে যে-সব বিজ্ঞাপন জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বলে তা কোনো সাধারণ জিনিস নয়। বাইরের খবরের কাগজে তা ছাপা হয়। আর এইভাবে যা শিবপালগঞ্জে আছে তা বাইরের খবরের কাগজেও আছে।

রঙ্গনাথ চৌকির ওপর বসে আছে। তার সামনে খবরের কাগজের পাতাটা তেরছা হয়ে আছে। অ্যামেরিকা একটা নতুন উপগ্রহ ছেড়েছে, পাকিস্তান-ভারত সীমানায় গুলি চলছে, গমের ঘাটতির দরুন রাজ্যগুলোর কোটা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নিরাপত্তা পরিষদে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে— এই-সব

খবরকে ঐ সাদা-কালো বিজ্ঞাপনটা একটা দৈত্যাকার বাজের মতো তার পাঞ্জায় চেপে তেরছা অক্ষরগুলোতে চিৎকার করে বলছে: অর্শ ! অর্শ ! খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটা ছাপায় শিবপালগঞ্জ আর আন্তর্জাতিক জগতের সম্পর্কে অর্শ একটা সফল মাধ্যম হয়ে গেল।

ডাকাতদের নির্দেশ ছিল, এক বিশেষ দিনে বিশেষ স্থানে রামাধীনের তরফ থেকে টাকার থলি রেখে দিয়ে আসতে হবে। ডাকাতি করার এই পদ্ধতি আজও দেশের কোনো কোনো অংশে প্রচলিত আছে। কিন্তু আসলে এই পদ্ধতিটা মধ্যযুগীয় পদ্ধতি, কারণ এর জন্য রুপো অথবা নিকেলের টাকা আর থলি দরকার। কিন্তু আজকাল নোটের আকারে টাকা দেওয়া যেতে পারে এবং পাঁচ হাজার টাকা একটা প্রেমপত্রের মতো খামে ভরেও দেওয়া যেতে পারে। দরকার হলে টাকাটা চেকেও দেওয়া যায়। এই-সব কারণে "পরশুদিন রাতে অমুক টিলার ওপর পাঁচ হাজার টাকার একটা থলি রেখে দিয়ে চুপচাপ চলে যাও", এই নির্দেশ পালনে বাস্তব দিক থেকে অসুবিধা থাকতে পারে। টিলার ওপর রেখে আসা নোটের খাম হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে, চেক জাল হতে পারে। সংক্ষেপে— শিল্প, সাহিত্য, প্রকাশন, শিক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ডাকাতির ক্ষেত্রেও আধুনিক যুগে মধ্যযুগীয় পদ্ধতির প্রয়োগে বাস্তব অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

যা-ই হোক, ডাকাতরা এ-সব কথা চিন্তা করে নি, কারণ রামাধীনের ওখানে ডাকাতি করার জন্য যারা চিঠি পাঠিয়েছে তারা আসল ডাকাত নয়। এই সময় গ্রামসভা আর কলেজের রাজনীতি নিয়ে রামাধীন ভিখমখেড়ুবী আর বৈদ্যজীর মধ্যে কিছু বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

যদি এটা শহর হ'ত আর রাজনীতি উঁচু স্তরের হ'ত তা হলে এই সুযোগে রামাধীনের বিরুদ্ধে কোনো মহিলার তরফ থেকে পুলিসে রিপোর্ট করা হ'ত যে, তিনি মহিলার শ্লীলতাহানি করার প্রবল চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মহিলার সক্রিয় বাধাদানের ফলে তিনি কিছু করতে পারেন নি আর মহিলাটি তার শ্লীলতা পুরো বজায় রেখে সোজা থানায় চলে এসেছে। কিন্তু এটা দেহাত, রাজনৈতিক যুদ্ধে মহিলাদের শ্লীলতাহানি এখনও এখানে হ্যাণ্ড গ্রেনেডের মর্যাদা পায় নি। তাই এখানে পুরনো পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়েছে আর বাবু রামাধীনের ওপর ডাকাতির সঙ্কট সৃষ্টি করে তাঁকে একটা যন্ত্রণাকর অবস্থার মধ্যে ফেলা হয়েছে।

পুলিস, রামাধীন ভিখমখেড়বী আর বৈদ্যজীর পুরো দল— সবাই জানে যে, ডাকাতির এই চিঠি নকল। এই ধরনের চিঠি এর আগেও কয়েকবার কয়েকজনের কাছে এসেছে। সুতরাং রামাধীনের ওপর এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে, তাঁকে নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে টাকা নিয়ে টিলার ওপর যেতে হবে। চিঠি যদি নকল না-ও হ'ত, তবু রামাধীন চুপচাপ টাকা দেবার বদলে বাড়িতে ডাকাতদের ডেকে আনা বেশি ভালো মনে করতেন। কিন্তু যেহেতু থানায় রিপোর্ট দায়ের করা হয়েছে, তাই পুলিস তাদের তরফ থেকে কিছু করতে বাধ্য হয়েছে।

নির্দিষ্ট দিনে টিলা থেকে আরম্ভ করে গ্রাম পর্যন্ত পুরো স্টেজটাই পুলিসকে সমর্পণ করা হ'ল আর সেই স্টেজে পুলিস 'ডাকাত-ডাকাত' খেলা খেলতে শুরু করে দিল। টিলার ওপর তো একটা পুরো থানাই বসে গেল। তারা আশপাশের উষর জমি, পতিত জমি, জঙ্গলঝাড়, ক্ষেতখামার, ফসলের গোলা সব একেবারে ছেঁকে ফেলল।

কিন্তু কোথাও ডাকাতদের চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। তারা টিলার ধারের গাছগুলোর ডালপালা ঝাঁকিয়ে, শেয়ালের গর্তে সঙিন ঢুকিয়ে আর সমতল জায়গায় নিজেদের চোখ দিয়ে হিপনোটাইজ করে নিশ্চিন্ত হ'ল যে, ঐসব জায়গায় যারা আছে তারা ডাকাত নয়, তারা পাখি, শেয়াল আর পোকামাকড়। রাতে যখন কিছু প্রাণী তারস্বরে চিৎকার করে উঠল তখন বোঝা গেল যে, তারাও ডাকাত নয়, শেয়াল। আর পাশের বাগানে অন্য এক ধরনের জীব ডাকতে আরম্ভ করলে কিছুক্ষণ পরে বোঝা গেল, তারা আর কিছু নয়, বাদুড়। এদিন ডাকাত আর রামাধীন ভিখমখেড়বীর কুস্তি সমান-সমান হয়ে শেষ হ'ল। কারণ, টিলার ওপর না ডাকাতরা টাকা নিতে এল আর না রামাধীন টাকা দিতে গেল।

থানার ছোটো দারোগা অল্পদিন হ'ল চাকরিতে ঢুকেছেন। টিলার ওপর ডাকাতদের ধরার কাজ তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সব-কিছু করার পরও এমন-কিছু হ'ল না, যা তিনি তাঁর মাকে লিখতে পারেন : "মা ডাকাতরা মেশিনগান পর্যন্ত ব্যবহার করেছিল, কিন্তু সেই ভয়ংকর গোলাগুলির মধ্যেও তোমার আশীর্বাদে তোমার ছেলের গায়ে আঁচড়টুকু পর্যন্ত পড়ে নি।" রাত প্রায় একটার সময় তিনি টিলার ওপর থেকে মাঠে নেমে এলেন। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে, চারদিক অন্ধকার। ছোটো দারোগার শহরবাসী প্রেয়সীর কথা মনে পড়ে গেল, বি. এ.তে তিনি হিন্দীসাহিত্যও পড়েছিলেন। এইসব কারণে তিনি ধীরে ধীরে গুন্ গুন্ করতে আরম্ভ করলেন, শেষে গান গাইতে লাগলেন, 'হায় মেরা দিল! হায় মেরা দিল!'

তাঁর সামনে দুজন সেপাই, পেছনেও দুজন সেপাই। দারোগা

সাহেব গাইতে থাকলেন আর সেপাইরা ভাবতে থাকল, কিচ্ছু না, কয়েকদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মাঠ পার হতে হতে দারোগাসাহেবের গান কিছুটা উঁচুতে চড়ে গেল। তাতে প্রমাণ হ'ল, যে-সব বোকা বোকা কথা বলা যায় না তা বেশ মজা করে গাওয়া যেতে পারে।

তাঁরা রাস্তার ধারে এসে পড়েছেন। হঠাৎ সেখানে এক গর্তের ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'কোফে´ন শাফ´লা?' দারোগা সাহেবের হাত তাঁর রিভলভারের ওপরে চলে গেল। সেপাইরা ইতস্তত করে রাইফেল ধরল। ততক্ষণে আবার গর্ত থেকে আওয়াজ শোনা গেল, 'কোফে´ন শাফ´লা?'

একজন সেপাই দারোগাসাহেবের কানে কানে বলল, 'গুলি চলতে পারে হুজুর। গাছের আড়ালে যাই, চলুন!'

গাছটা প্রায় পাঁচ গজ দূরে। দারোগাসাহেব সেপাইকে ফিসফিস করে বললেন, 'তোমরা গাছের আড়ালে চলে যাও, আমি দেখছি।'

তারপর তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'গর্তের ভেতর কে? যে-ই থাকো, বেরিয়ে এসো।' এমন সময় সিনেমায় দেখা একটা দৃশ্যের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি তাঁর আগের কথার পিঠে আবার বললেন, 'তোমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। আধমিনিটের মধ্যে তোমরা যদি বেড়িয়ে না আস তা হলে গুলি চালানো হবে।'

গর্তের ভেতরটা কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল, তারপর আওয়াজ শোনা গেল, 'মফ´রে গেফে´ছি শাফ´লা, গুফু´লী চাফ´লানেওয়ালা।'

বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে প্রত্যেক ভারতীয়ই ভাষার ব্যাপারে বড়ো বেশি ঘাবড়ে যায়। এত রকমের বুলি তার কানে আসে যে, শেষে হার মেনে সে চিন্তা করাই ছেড়ে দেয় যে, তা নেপালী,

না গুজরাতী। কিন্তু এই ভাষা দারোগাসাহেবকে সতর্ক করে দিল, তিনি ভাবতে লাগলেন। ব্যাপারটা কী? এটুকু তো বুঝতে পারলেন যে, এর মধ্যে গালাগাল নেই, কিন্তু কেন তিনি বুঝতে পারছেন না এটা কোন্ বুলি? এরপরে, যেখানে কথা বোঝা যায় না সেখানে গুলি চলে— এই আন্তর্জাতিক নীতি শিবপালগঞ্জে প্রয়োগ করে দারোগাসাহেব রিভলভার বার করলেন, চিৎকার করে বললেন, 'গর্ত থেকে বেরিয়ে এসো, নয়তো আমি গুলি চালাব।'

কিন্তু গুলি চালাবার দরকার হ'ল না; একজন সেপাই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'গুলি চালাবেন না হুজুর, ও হচ্ছে যোগনাথিয়া। মদ খেয়ে গর্তে পড়ে আছে।'

সেপাইরা উৎসাহভরে গর্ত ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। দারোগাসাহেব বললেন, "কে যোগনথিয়া?"

একজন পুরনো সেপাই জবাব দিল, "ও শ্রীরামনাথের ছেলে যোগনাথ। একা মানুষ। বড়ো বেশি মদ খায়।"

সেপাইরা যোগনাথকে তুলে তার পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল। কিন্তু যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় না, অন্যে তাকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে? তাই সে নড়বড় করে আবার পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝখানে তাকে ধরে ফেলা হ'ল। শেষে সে গর্তের বাইরে এসে পরমহংসের মতো বসে পড়ল। বসে চোখ মিটমিট করে, হাত নেড়ে গলা দিয়ে বাদুর আর শিয়ালের মতো কিছু শব্দ বার করে নিজেকে যখন মানুষের স্তরে কথা বলার মতো অবস্থায় আনল তখন তার মুখ দিয়ে সেই কথাটাই আবার বেরুল, "কোফে́ন শাফ́লা?"

একজন সেপাই বলল, "এখন ওর হুঁশ নেই। তাই গালাগাল দিচ্ছে।"

দারোগাসাহেব বোধহয় গালাগাল দেবার ব্যাপারে যোগনাথের এই নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হলেন, কারণ বেহুঁশ অবস্থাতেও অন্তত এটুকু তো সে করছে। তিনি তার গলাটা সজোরে ঝাঁকিয়ে ধমকের সুরে বললেন, "হুঁশে আয়।"

কিন্তু যোগনাথ হুঁশে আসতে অস্বীকার করল। শুধু বলল, "শার্ফালা।"

সেপাইটা হাসতে লাগল। দারোগাসাহেবও মুচকি হেসে বললেন, "এই শালা আমাদের শালা বলছে।"

তিনি তাকে মারার জন্য হাত উঠালেন, কিন্তু একজন সেপাই বাধা দিল। বলল, "যেতে দিন হুজুর।"

দারোগাসাহেব সেপাইয়ের এই দরদ পছন্দ করলেন না। তিনি হাত থামালেন বটে, কিন্তু আদেশের সুরে বললেন, "ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে হাজতে বন্ধ করে রাখো। 100 নম্বর ফৌজদারী ধারা লাগিয়ে দিয়ো।"

একজন সেপাই বলল, "সেটা হতে পারবে না হুজুর, ও এখানকার বাসিন্দা। দেওয়ালে ইস্তাহার লেখে! বদমাস সত্যি, কিন্তু দেখানোর জন্য একটা কাজ তো করে।"

তারা যোগনাথকে তুলে তাকে নিজের পায়ে হাঁটতে বাধ্য করল। রাস্তার দিকে যেতে যেতে দারোগাসাহেব বললেন, "বোধহয় মদ খেয়েই গালাগাল করছে। একটা-না-একটা অপরাধের ধারা বেরিয়েই যাবে। এখন নিয়ে গিয়ে হাজতে রাখো, কাল চালান করে দেওয়া যাবে।"

সেপাইটা বলল, "হুজুর, শুধু শুধু ঝামেলার মধ্যে গিয়ে কী লাভ? এখন গ্রামে গিয়ে ওকে ওর বাড়িতে ফেলে দিয়ে আসব। ওকে হাজতে রাখব কী করে, ও বৈদ্যজীর লোক।"

দারোগাসাহেব নতুন চাকরিতে ঢুকেছেন, সেপাইদের এত দরদের কারণ তিনি এতক্ষণে বুঝতে পারলেন। তিনি কিছু বললেন না। সেপাইদের কাছ থেকে কিছু পিছু হটে আবার অন্ধকার, হালকা ঠাণ্ডা, শহরবাসী প্রেয়সী আর "হায় মেরা দিল" থেকে তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আট

কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের চুরি খুবই সাদাসিধেভাবে হয়েছে। রোজ যে শয়ে শয়ে চুরি হয় তার থেকে এর বিশেষত্ব এই যে, এটা বিশুদ্ধ চুরি, এর মধ্যে বেশি ঘোরানো-পেঁচানো কিছু নেই।

কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের একটা বীজগুদাম আছে। তাতে গম ভর্তি ছিল। একদিন ইউনিয়নের সুপারভাইজার রামস্বরূপ তুটো ট্রাক নিয়ে এই বীজগুদামে এল। তার নির্দেশে ট্রাক তুটোর ওপর গমের বস্তা বোঝাই করা হ'ল। দূর থেকে যারা তা দেখল তারা মনে করল, এমন তো কো-অপারেটিভে রোজই হয়।

গমের বস্তাগুলো কাছেই আর একটা বীজগুদামে পৌঁছে দেবার

রামস্বরূপ নিজে একজন ড্রাইভারের পাশে বসল। ট্রাক চলতে আরম্ভ করল। এক জায়গায় রাস্তা থেকে নেমে কাঁচা পথে বাঁক নিলে পাঁচ মাইল দূরে ঐ বীজগুদাম। কিন্তু ট্রাক ঐ জায়গায় মোড় নিল না, সোজা চলে গেল। এখান থেকেই চুরির শুরু।

ট্রাক সোজা শহরের শস্যমণ্ডীতে গিয়ে পৌঁছল। ওখানে গমের বস্তাগুলো নামিয়ে দিয়ে ছুটো ট্রাকই চুরির ব্যাপারটা একেবারে ভুলে গেল এবং পরের দিন যথারীতি আগের মতো কয়লা আর কাঠ বইতে লাগল। এরপরে বেশ কিছুদিন রামস্বরূপের পাত্তা পাওয়া গেল না। লোকে মনে করল, গম বেচে সে কয়েক হাজার টাকা পকেটে পুরে বোম্বাইয়ের দিকে পালিয়ে গেছে। এই পুরো ঘটনাটা এখানকার থানায় চুরি বলে রিপোর্ট করা হয়েছে। বৈদ্যজীর মনে হ'ল, তাঁর একটা কাঁটা বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু, ইউনিয়নের একজন ডাইরেক্টর কাল শহরে গিয়ে এমন এক দৃশ্য দেখেছেন যাতে জানা গেছে যে, রামস্বরূপ ঐ টাকা খরচ করার জন্য বোম্বাই নয়, এখানকারই এক শহর বেছে নিয়েছে। ডাইরেক্টরসাহেব কেবল শহর দেখার উদ্দেশ্যেই শহর দেখতে গিয়েছিলেন। এইরকম বিনা কাজেই হোক কি কাজে, শহরে গেলে তাঁর অন্তত একটা স্থায়ী কর্মসূচী থাকে : কোনো পার্কে যাওয়া,সেই পার্কে একটা গাছের তলায় বেঞ্চে বসা, বাদাম-ছোলা চিবোনো, রঙিন ফুল আর মেয়েদের দিকে তাকানো, এবং কমবয়েসী কোনো ছোকরাকে দিয়ে মাথায় তেল মালিশ করানো। কাল অন্যসব কাজের পর যখন তিনি একেবারে শেষ কাজটা ধরলেন তখন একটা ঘটনা ঘটল।

ডাইরেক্টর গাছের তলায় বসে আছেন। চোখ দুটো বোজা। একটা ছোকরা তাঁর মাথায় তার সরু মোলায়েম আঙুলগুলো তিড়্ তিড়্ তিড়্ তিড়্ আওয়াজ করছে। ছেলেটা পরমানন্দে তাঁর চুলের ওপর তবলার উলটোপালটা বোল বার করছে আর তিনি চোখ বুজে সক্ষোভে ভাবছেন, ছোকরাটা শিগ্গিরই হয়তো তেল মালিশ শেষ করে ফেলবে।

হঠাৎ তিনি দেখলেন, সামনে আর-একটা গাছের তলায় একটা বেঞ্চের ওপর রামস্বরূপ সুপারভাইজর বসে আছে। সে-ও একটা ছেলেকে দিয়ে মাথায় তেল মালিশ করাচ্ছে আর তার তিড়্ তিড়্ তিড়্ শব্দে সুখসাগরে ডুবে আছে। দু পক্ষই তখন পরমহংসের ভাবে আপন আপন জগতে লীন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে এটা একটা আদর্শ পরিবেশ। সুতরাং কেউ কারও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন না। প্রায় পনেরো মিনিট তাঁরা নিজের নিজের বেঞ্চে সুপ্রতিবেশীর মতো বসে পরস্পরকে দেখে না-দেখার ভান করতে থাকলেন। তারপর দু জনই গামোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ছোকরা দুজনকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে আবার ওখানেই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে বলে পঞ্চশীলের নীতি অনুসারে নিজের নিজের পথ ধরলেন।

শিবপালগঞ্জের দিকে ফেরার সময় ডাইরেক্টরের খেয়াল হ'ল, মালিশের সুখসাগরে ভেসে তিনি কো-অপারেটিভ আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। তাঁর মনে পড়ল, রামস্বরূপ ফেরার হয়ে আছে, পুলিস তাকে খুঁজছে। যদি তিনি রামস্বরূপকে ধরিয়ে দিতেন তা হলে চুরির মকদ্দমাটা চালানো যেত। তাঁর নামটা হয়তো খবরের কাগজে ছাপা হ'ত। এ-সব কথা ভেবে তাঁর আফসোস

হ'ল। তাঁর আত্মা যেন কাঁটা ফোটাতে লাগল। সুতরাং ফিরে এসেই তিনি আত্মার সন্তুষ্টির জন্য বৈদ্যজীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং এক পুরিয়া হিঙ্গাষ্টক চূর্ণ গলাধঃকরণ করে বললেন, "আজ পার্কে একজন লোককে দেখলাম, একেবারে রামস্বরূপের মতো দেখতে।"

বৈদ্যজী বললেন, "হবে। কিছু কিছু লোকের চেহারা এক রকম হয়।"

ডাইরেক্টরের মনে হ'ল, এইটুকুতে তাঁর আত্মা তাঁর পিছু ছাড়বে না। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক দেখে আবার তিনি বললেন, "আমার তখনই মনে হয়েছিল, হয়তো ও রামস্বরূপই।"

বৈদ্যজী ডাইরেক্টরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ডাইরেক্টর আবার বললেন, "রামস্বরূপই ছিল। আমি ভাবলাম, এ শালা এখানে কী করছে। মালিশ করাচ্ছিল।"

"তুমি কী করছিলে?"

ডাইরেক্টর আনমনাভাবে বললেন, "আমি পরিশ্রান্ত হয়ে একটা গাছের তলায় বিশ্রাম করছিলাম।"

বৈদ্যজী বললেন, "তখনই পুলিসে খবর দেওয়া উচিত ছিল।"

ডাইরেক্টর কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, "আমি মনে করলাম, রামস্বরূপ যেন জানতে না পারে আমি তাকে দেখে ফেলেছি, তাই পুলিসে এত্তেলা দেই নি।"

চুরির ব্যাপারে অভিযুক্ত লোকটা বোম্বাইয়ে নয়, পনেরো মাইল দূরে আছে আর তেল মালিশ করানোর জন্য তার মাথাটা এখনও কাঁধের ওপর বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে— এই খবর বৈদ্যজীকে চিন্তার মধ্যে ফেলল। ডাইরেক্টরদের বৈঠক ডাকা জরুরি হয়ে

পড়ল। সব কথা তিনি খালি পেটে শুনেছেন। ভাং খেয়েও যাতে তা শোনা যায় সেজন্য তিনি সন্ধ্যাবেলায় বৈঠক ডাকলেন।

শনিচর পৃথিবীতে বৈদ্যজীকেই একমাত্র মানুষ আর স্বর্গে হনুমান-জীকেই একমাত্র দেবতা বলে মনে করে। আলাদা আলাদা ভাবে দুজনেরই প্রভাব তার ওপর পড়েছে। হনুমানজী শুধু ল্যাঙট পড়েন, তাই শনিচরও কেবল আনডার-ওয়্যার দিয়ে কাজ চালায়। যদি কখনও কোথাও সেজেগুজে যাবার দরকার হয়, কেবল তখনই সে গায়ে একটা বেনিয়ান চড়ায়। এ-ই হচ্ছে হনুমানজীর প্রভাব, বৈদ্যজীর প্রভাবে সে যে-কোনো পথ-চলা মানুষকে দেখে কুকুরের মতো ডাকতে পারে, কিন্তু বৈদ্যজীর বাড়িতে যদি কুকুর থাকত তা হলে তার সামনে সে লেজ নাড়াতে শুরু করত। বৈদ্যজীর বাড়িতে কুকুর নেই আর শনিচরেরও লেজ নেই, সে অন্য কথা।

শহরের প্রতিটি জিনিসের প্রতি এবং যেহেতু রঙ্গনাথ শহরের লোক তাই রঙ্গনাথের প্রতি শনিচরের প্রবল আকর্ষণ। রঙ্গনাথ বাড়ি থাকলে শনিচরকে তার চারপাশে দেখা যায়। আজও যাচ্ছে। বৈদ্যজী কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের বৈঠকে গেছেন। বাড়িতে আছে কেবল রঙ্গনাথ আর শনিচর। সূর্য ডুবছে। শীতের সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বাড়ি থেকে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া উঠে বাড়িগুলোর ওপর আটকে রয়েছে।

রাস্তা দিয়ে কে যেন খট্ খট্ শব্দ করে হেঁটে যাচ্ছে। শারীরিক বিকারের জন্য আমাদের ভারতীয়দের মনে যে সাত্ত্বিক ঘৃণা জন্মায় তা থু করে ফেলে দিয়ে শনিচর বলল, "ল্যাংড়া যাচ্ছে, শালা।" বলেই

অমনি লাফ দিয়ে বাইরের চবুতরার ওপর এসে ব্যাঙের মতো বসে পড়ল।

রঙ্গনাথ ডাক দিয়ে বলল, "ল্যাংড়া নাকি?"

ল্যাংড়া কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। ডাক শুনে থেমে পড়ল। পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ বাবু, আমি ল্যাংড়াই।"

"নকল পেয়ে গেছ?"

ল্যাংড়া বলল, "নকল তো পেলাম না বাবু, তবে নোটিসবোর্ডে আপত্তিটা টাঙিয়ে দিয়েছে।"

"কী হ'ল? আবার ফী কম পড়ে গেছে নাকি?"

"ফী নয় বাবু," কথাটা শোনাবার জন্য সে চিৎকার করে বলতে লাগল, "এবার মকদ্দমার ঠিকানায় কিছু ভুল আছে। প্রার্থীর সই ভুল জায়গায় করা হয়েছে। তারিখের জায়গাটাতে দুটো অঙ্ক মিশে এক হয়ে গেছে। এক জায়গায় একটু কাটাকুটি হয়েছে, তার ওপর সই নেই। অনেক ভুল বার করেছে।"

রঙ্গনাথ বলল, "অফিসওয়ালারা বড়ো জ্বালাতন করছে তো! কী-সব ভুল বার করছে।"

গান্ধীজী যেমন তাঁর প্রার্থনাসভায় বোঝাতেন ইংরেজদের ঘৃণা করা আমাদের উচিত নয়, সেই রকম ল্যাংড়া মাথা নেড়ে বলল, "না বাবু, অফিসওয়ালারা তো তাদের কাজ করছে। সমস্ত গোলমাল ঐ আর্জি-নবিস করছে। বিদ্যা লোপ পাচ্ছে, নতুন আর্জিনবিসরা ভুলভাল লিখছে।"

বিদ্যা যে লোপ পাচ্ছে, রঙ্গনাথ এ কথা মনে মনে স্বীকার করল, কিন্তু ল্যাংড়া যে-সব কারণের কথা বলল তার সঙ্গে সে একমত হতে পারল না। রঙ্গনাথ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ততক্ষণে ল্যাংড়া

জোর দিয়ে বলল, "কোনো চিন্তা নেই বাবু, কাল দরখাস্ত ঠিক হয়ে যাবে।"

খট্ খট্ করতে করতে ল্যাংড়া চলে গেল। শনিচর বলল, "জানি না, কোথাকার সব গাড়ল। এই শিবপালগঞ্জে এসে জড়ো হচ্ছে।"

রঙ্গনাথ তাকে বোঝাল, "সব জায়গাতেই এরকম। দিল্লীরও এই অবস্থা।"

শনিচরকে সে দিল্লীর গল্প শোনাতে লাগল। ভারতীয়দের বুদ্ধি যেমন ইংরেজীর জানলা দিয়ে উ কি মেরে পৃথিবীর খবর সংগ্রহ করে তেমনি শনিচরের বুদ্ধি রঙ্গনাথের জানলা দিয়ে কি দিয়ে দিল্লীর খবর সংগ্রহ করতে লাগল। কিছুক্ষণ দুজনে ঐ নিয়েই আটকে রইল।

অন্ধকার হয়ে এসেছে, কিন্তু এমন অন্ধকার নয় যে, চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ আর পশুর পার্থক্য বোঝা যায় না। বৈদ্যজীর বৈঠকখানায় একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। সামনে রাস্তা দিয়ে তিনজন যুবক জোরে জোরে হাসতে হাসতে চলেছে। তারা এমন একটা ব্যাপারে কথা বলছে যাতে দুপুর, ফাণ্টুশ, চকাচক, তাস, পয়সা ইত্যাদি কথাগুলো বড়ো বেশি শোনা যাচ্ছে, যেমন প্ল্যানিং কমিশনের অফিসারদের মধ্যে "ইভ্যালুয়েশন", "কো-অর্ডিনেশন", "ডাভটেলিং" অথবা সাহিত্যিকদের মধ্যে "পরি-প্রেক্ষিত", "আয়াস", "যুগবোধ", "সন্দর্ভ" ইত্যাদি কথা শোনা যায়।

যুবক তিনজন কী-সব বলতে বলতে বৈঠকখানা ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। শনিচর বলল, "বদ্রীভাই, এই জানোয়ারদের কুস্তি শেখাচ্ছে। বুঝে নাও, বাঘের হাতে বন্দুক দিচ্ছে। এমনিতেই তো শালাদের জ্বালায় রাস্তা চলা মুশকিল, এরপর দাঁওপ্যাঁচ শিখে নিলে তো গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে।"

যুবক তিনজনের মধ্যে একজন বৈঠকখানার দরজায় এসে দাঁড়াল। খালি গা। গায়ে আখড়ার মাটি লেগে আছে। ল্যাঙটের পট্টি কোমর থেকে পা পর্যন্ত হাতির শুঁড়ের মতো ঝুলছে। শিবপালগঞ্জে যারা ল্যাঙট পরে চলাফেরা করে তাদের মধ্যে এমনটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শনিচর জিজ্ঞাসা করল, "কী ব্যাপার ছোটে পালোয়ান?"

পালোয়ান তার গায়ের দাদ চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "বদ্রী-ভাই আজ আখড়ায় এলেন না! কোথায় ডুব মেরেছেন?"

"কোথায় আবার ডুব মারবেন, এদিক-ওদিক আছেন কোথাও।"

"কোথায় আছেন?"

"ইউনিয়নের সুপারভাইজর গম বোঝাই করে পালিয়ে গেছে. সেই ব্যাপারে ইউনিয়নে মিটিং হচ্ছে। বদ্রীও হয়তো গেছেন।"

ততক্ষণে বৈঠকখানার সামনে অনেকের আসার শব্দ শোনা গেল। চবুতরার ওপর খদ্দরের ধুতি, কুর্তা, সদরী, টুপি আর চাদরে ভব্য-মূর্তি বৈদ্য মহারাজকেও দেখা গেল। তাঁর পেছনে কয়েকজন চেলা-চামুণ্ডা। বদ্রী পালোয়ান সবার পেছনে। তাঁকে দেখেই ছোটে বললেন, "ওস্তাদ, একটা বড়ো ফাণ্টুশ ব্যাপার হয়েছে। তোমাকে বলার জন্য অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি।"

"দাঁড়িয়ে আছ তো কী হয়েছে, গলে যাচ্ছ? কী ব্যাপার?"— বদ্রী পালোয়ান এইভাবে ছোটেকে সম্ভাষণ জানালেন। তারপর গুরুশিষ্য কথা বলার জন্য চবুতরার অন্য দিকে চলে গেলেন।

বৈদ্যজী আর তাঁর সঙ্গে চার-পাঁচজন লোক ভেতরে এসে পড়ে-ছেন। একজন স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। দীর্ঘনিশ্বাসটা শেষ হতে হতেই তা ফোঁপানিতে পরিণত হ'ল। আর একজন চৌকির

ওপরে বসে এত জোরে হাই তুললেন যে, প্রথমে তা হাই বলেই মনে হ'ল, কিন্তু পরে তা সিটিতে এসে শেষ হ'ল। বৈদ্যজীও তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে এমনভাবে তাঁর টুপি আর কুর্তা চৌকির অন্যদিকে ছুঁড়ে দিলেন যেন কোনো বড়ো গাইয়ে একটা লম্বা তান ধরার পর সমে এসে গেছেন। বোঝা গেল, সবাই একটা বড়ো কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। শনিচর বলল, "মহারাজ, খুব ক্লান্ত হয়ে থাকলে আর-একবার লাগিয়ে দিই।"

বৈদ্যজী কিছু বললেন না। ইউনিয়নের এক ডাইরেক্টর বললেন, "ইউনিয়নেই তো দুবার হয়ে গেছে। ভালো মাল। দুধিয়া। এখন তো বাড়ি যাবার পালা।"

বৈদ্যজী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে অন্যদের কথা শুনতে লাগলেন। এ স্বভাব তাঁর অনেক দিনের, যখন থেকে তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, যে নিজে কম খায়, অন্যকে বেশি খাওয়ায় ; নিজে কম কথা বলে, অন্যকে বেশি বলতে দেয়, সে নিজে কমই বোকা হয়, অন্যকেই বেশি বোকা বানায়। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "রঙ্গনাথ, তোমার কী মত?"

বৈদ্যজী যেমন কিছু না বলেই মত চাইলেন, রঙ্গনাথও তেমনি কিছু না বুঝেই উত্তর দিল, "আজ্ঞে, যা হয়, ভালোই হয়।"

বৈদ্যজী গোঁফের আড়ালে একটু হাসলেন। বললেন, "তুমি খুব উচিত কথাই বলেছ। বদ্রী প্রস্তাবটার বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু পরে সে-ও চুপ হয়ে গেল। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাস হয়ে গেছে। যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে।"

রঙ্গনাথের এখন খেয়াল হ'ল সে না জেনেশুনে মত দিয়েছে। সে কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করল, "কী প্রস্তাব করেছেন আপনারা?"

“আমরা প্রস্তাব করেছি যে, সুপারভাইজর আমাদের যে আট হাজার টাকা ক্ষতি করেছে তা পূরণের জন্য রাজ্য সরকারকে অনুদান দিতে হবে।”

রঙ্গনাথ এই যুক্তিতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলল, “সরকারের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? চুরি আপনাদের ইউনিয়নের সুপারভাইজর করেছে আর তার ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার?”

“তা হলে কে দেবে? সুপারভাইজর তো পালিয়ে গেছে। আমরা পুলিসে খবর দিয়েছি। এখন সরকারের দায়িত্ব। আমাদের হাতে কিছু নেই। যদি থাকত তা হলে সুপারভাইজরকে ধরে এনে তার কাছ থেকে আমরা গমের দাম উশুল করে নিতাম। এখন যা করার, সরকারকেই করতে হবে। সরকার হয় সুপারভাইজরকে ধরে এনে আমাদের সামনে হাজির করুক অথবা অন্য কিছু করুক। যা-ই হোক, যদি সরকার চায়, আমাদের ইউনিয়ন বেঁচে থাকুক আর তার সাহায্যে জনগণের কল্যাণ হোক তা হলে সরকারকেই এই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নইলে এই ইউনিয়ন উঠে যাবে। আমরা আমাদের কাজ করেছি, এখন যা করার সরকারকে করতে হবে। সরকারের অকর্মণ্যতার কথাও আমরা জানি।”

বৈদ্যজী এমন যুক্তিসম্মতভাবে কথাগুলো বলছিলেন যে, রঙ্গনাথের মাথা ঘুরে গেল। বৈদ্যজী “সরকারের অকর্মণ্যতা”, “জনগণের কল্যাণ”, “দায়িত্ব” ইত্যাদি শব্দ বারবার বলছিলেন। রঙ্গনাথের মনে হ'ল, আধুনিক যুগের লোকেরা যে-রকম ভাষা বোঝে, তার মামা পুরনো দিনের লোক হয়েও সেইরকম ভাষা বলতে পারেন।

বদ্রী পালোয়ান ছোটের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে ফিরে এসেছেন।

তিনি বললেন, "রামাধীনের ওখানে ডাকাত অবশ্য পড়ে নি, তবে এদকি ওদিক থেকে চুরির খবর এসেছে।"

বাবার সামনে তিনি সাধারণত নম্রভাবে কথা বলেন। এই কথাটাও তিনি এমনভাবে বললেন, যেন ছোটে আর তাঁর মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে এটাই তার উপসংহার এবং তা জানানো তাঁর কর্তব্য।

বৈদ্যজী বললেন, "চুরি, ডাকাতি— সর্বত্র এই কথাই শোনা যাচ্ছে। দেশ রসাতলে যাচ্ছে।"

বদ্রী পালোয়ান কথাটা না-শোনার ভান করে, যেন কোনো হেল্থ্ ইন্সপেক্টর কলেরা থেকে রক্ষা পাবার উপায় বলছেন, এমনিভাবে জনসাধারণকে বললেন, "সারা গ্রামে চুরি নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। জেগে জেগে ঘুমোনো উচিত।"

তারপর তিনি চবুতরার ওপর অন্ধকারে ছোটে পালোয়ানের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

নয়

ছঙ্গামল বিদ্যালয় ইণ্টার কলেজ স্থাপিত হয়েছিল "দেশের নতুন নাগরিকদের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত করার এবং তাদের সৎশিক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রের উন্নতি বিধানের জন্য"। উজ্জ্বল কমলা রঙের কাগজে

ছাপা কলেজের "সংবিধান এবং নিয়মাবলী" পড়ে সত্যিকারের নোংরা মনও নির্মল আর পবিত্র হয়, যেমন হয় ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার-সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি পড়ে।

এই কলেজ রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য স্থাপিত। তাই এখানে আর কিছু হোক বা না হোক, দলাদলি হয় খুব। এমনিতে যতখানি দলাদলি আছে তাকে খুব ভালো হয়তো বলা যায় না, তবে যতটা কম সময়ের মধ্যে তার বিকাশ ঘটেছে তাতে মনে হয় কাজ ভালোই হয়েছে। দু-তিন বছরের মধ্যেই এখানকার দলাদলি আশপাশের কলেজগুলোর চেয়ে অনেক বেশি জোরালভাবে দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো ব্যাপারে তো সর্বভারতীয় সংস্থাগুলোর মোকাবিলাও করতে আরম্ভ করেছে।

ব্যবস্থাপক সমিতিতে বৈদ্যজীর প্রবল আধিপত্য। কিন্তু রামাধীন ভিখমখেড়বী এই সমিতির ভেতর নিজের দল পাকিয়ে ফেলেছেন। তারজন্য তাঁকে অবশ্য অনেক সাধনা করতে হয়েছে। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি একাই ঐ দল ছিলেন। পরে এক-আধজন মেম্বার তাঁর দলে ভিড়েছেন। এখন অনেক পরিশ্রমের পর কলেজের চাকরদের মধ্যে দুটো দল সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তবে কাজ বিশেষ হয় নি। প্রিন্সিপালসাহেব পুরোপুরি বৈদ্যজীর ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু খান্না মাস্টার এখনও পর্যন্ত ঐরকমভাবে রামাধীনের দলের ওপর নির্ভরশীল হতে পারেন নি। তাঁকে এখনও দলে টানা যায় নি। ছেলেদের মধ্যেও এখনও দু দলের প্রতি সহানুভূতির ভিত্তিতে আলাদা আলাদা দল সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। তারা পরস্পর গালিগালাজ আর মারপিট করে থাকে, কিন্তু এ-সব কাজে এখনও পর্যন্ত সঠিক পথ মেলে নি। এই গালিগালাজ আর মারপিট তারা দলাদলির জন্য করে না, করে

ব্যক্তিগত কারণে। এইভাবে ছেলেদের গুণ্ডাবাজির শক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে নষ্ট হয়, রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণে তা ব্যবহৃত হতে পারে না। যারা দলাদলি করে, এ ব্যাপারে তাদের অনেক কিছু করার আছে।

এ কথা ঠিক যে, কলেজের দলাদলিতে বৈদ্যজী ছাড়া আর কারও তেমন অভিজ্ঞতা নেই। কলেজের দলবাজদের মধ্যে এখনও পরিপক্কতা আসে নি, তবে তাদের প্রতিভা আছে। বছরে এক-আধবার যখন তার বিস্ময় আত্মপ্রকাশ করে তখন তার ঢেউ শহর পর্যন্ত পৌঁছয়। কখনও কখনও এমন চালও দেখা যায়, যা জাতি-দলবাজদের পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দেয়। গত বছর রামাধীন বৈদ্যজীর ওপর এমন এক চাল চেলেছিলেন। যদিও সেই চাল ব্যর্থ হয়েছিল, তবু অনেক দূর দূর পর্যন্ত তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। খবরের কাগজেও তা ছাপা হয়েছিল। তাতে একজন দলবাজ এতই অভিভূত হয়েছিল যে, সে শহর থেকে এই কলেজে ছুটে এসেছিল শুধু দু দলের পিঠ চাপড়ে দেবার জন্য। সে একজন সিনিয়র দলবাজ, অধিকাংশ সময়ে রাজধানীতেই থাকে। গত চল্লিশ বছর ধরে সে তার চব্বিশটা ঘণ্টা কেবল দলবাজি করেই কাটাচ্ছে। তার জীবনটাই দলবাজির একটা ভ্রাম্যমাণ প্রতীক হয়ে পড়েছে। সে সর্বভারতীয় স্তরের মানুষ, রোজ খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় তার বক্তব্য ছাপা হয়। তাতে দেশভক্তি আর দলবাজির এক অভিনব সম্মেলন হয়। একবার সে এই কলেজে এলে লোকেদের বিশ্বাস জন্মাল যে, এখন এই কলেজ যদি উঠেও যায় তবু দলাদলি শেষ হবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দলাদলি কী? এ যেন জিজ্ঞাসা করা, বৃষ্টি কেন হয়? সত্যি কথা কেন বলা উচিত? বস্তু কী আর ঈশ্বরই বা কী?

আসলে এটা একটা সামাজিক-মনোবৈজ্ঞানিক অর্থাৎ খানিকটা দার্শনিক প্রশ্ন। এর উত্তর জানবার জন্য দর্শনশাস্ত্র জানা দরকার।

বেদান্ত অনুসারে— বৈদ্যজী আয়ুর্বেদের প্রতিশব্দ হিসাবে বেদান্তর উল্লেখ করে থাকেন— দলাদলি পরাত্মানুভূতির চরম দশার এক নাম। এতে প্রত্যেক "আমি" "তুমি"-কে নিজের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় দেখে। ঐ অবস্থাকে সে ধরতে চায়। "আমি" "তুমি"-কে আর "তুমি" "আমি"-কে নিশ্চিহ্ন করে "আমি" "তুমি"-র জায়গা আর "তুমি" "আমি"-র জায়গা দখল করতে চায়।

বেদান্ত হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য, আর যেহেতু দলাদলির অর্থ বেদান্ত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে, তাই দলাদলি তো আমাদের ঐতিহ্য। আর দুই-ই আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা আমাদের অনেক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য খুঁজে বার করেছি। এই কারণে আমরা হাওয়াই জাহাজে ইয়োরোপ যাই, কিন্তু যাত্রার দিনক্ষণ ঠিক করি জ্যোতিষীকে দিয়ে; ফরেন এক্সচেঞ্জ আর ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা দূর করার জন্য সাধুর আশীর্বাদ চাই; স্কচ হুইস্কি খেয়ে ভগন্দর পুষি আর তার চিকিৎসার জন্য যোগাশ্রমে গিয়ে নিশ্বাস ফুলোই, পেট কুঁচকাই। সেইরকম বিলিতি শিক্ষায় পাওয়া গণতন্ত্রকে স্বীকার করি আর তা চালানোর জন্য নিজেদের দলাদলির আশ্রয় নিই। আমাদের ইতিহাসে— তা যুদ্ধকালের ইতিহাসেই হোক কি শান্তিকালের— রাজপ্রাসাদ থেকে শুরু করে গোলাবাড়ি পর্যন্ত সব-কিছুই দলাদলির দ্বারা 'আমি'-কে 'তুমি' আর 'তুমি'-কে 'আমি' বানানোর উজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে। ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজদের তাড়াবার গোলযোগের সময় কিছুদিন আমরা তা ভুলে ছিলাম। স্বাধীনতা পাবার পর নিজেদের আর ঐতিহ্যগুলোর সঙ্গে

এটাও আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি। এখন আমরা দলাদলিকে তুমি-তুমি, আমি-আমি, লাল জুতো সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি সব-কিছুর চেয়ে আগে বাড়িয়ে দিচ্ছি। এটা আমাদের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস। এটা বেদান্তের জন্মদাতা দেশের উপলব্ধি। সংক্ষেপে এই-ই দলাদলির দর্শন, ইতিহাস আর ভূগোল।

কলেজের দলাদলির এই-সব মূল কারণের সঙ্গে আর-একটা কারণ লোকে মনে করে, কিছু হতে থাকা দরকার। এখানে সিনেমা নেই, হোটেল নেই, কফিহাউস নেই, মারপিট, ছুরিবাজি, পথদুর্ঘটনা, নতুন নতুন ফ্যাশানের মেয়ে, এগজিবিশন, গালিগালাজপূর্ণ সার্বজনিক সভাসমিতি— কিছুই নেই। লোকেরা কোথায় যাবে? কী দেখবে? কী শুনবে? তাই কিছু হতে থাকা দরকার।

চারদিন হ'ল কলেজে এক প্রেমপত্র ধরা পড়েছে। চিঠিটা একটা ছেলে একটা মেয়েকে লিখছে। ছেলেটা একটু চালাকি করেছে, চিঠিটা এমন ভাবে লিখেছে যে, পড়ে মনে হয় সে মেয়েটির চিঠির উত্তর দিয়েছে। চালাকিতে কাজ হ'ল না। ছেলেটাকে ধমকানো হ'ল, মারা হ'ল, কলেজ থেকে বার করে দেওয়া হ'ল; আবার তার বাবা যখন প্রতিশ্রুতি দিল যে, ছেলে আর কখনও প্রেম করবে না এবং কলেজের নতুন ব্লকের জন্য পঁচিশ হাজার ইঁট দেবে তখন তাকে কলেজে ফিরিয়ে নেওয়া হ'ল।

এই ঘটনাটার জের চারদিনের বেশি রইল না। এর আগে আর-একটা ছেলের কাছে একটা দেশী পিস্তল পাওয়া গিয়েছিল। পিস্তলের ভেতরে কার্তুজ ছিল না। পিস্তলটা দেখতে এমন ভোঁদা যে, এদেশের কামারদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা চলে যায়। কিন্তু তা

সত্ত্বেও কলেজে পুলিস এল, ছেলেটাকে এবং বৈদ্যজীর লোক হওয়া সত্ত্বেও ক্লার্কসাহেবকে তারা থানায় নিয়ে গেল। লোকে একটা কিছু ঘটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হ'ল, যেন চার-পাঁচ দিন ধরে একটা কিছু ঘটবে। কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যেই জানা গেল যে, ওটা পিস্তল নয়, লোহার একটা ছোটো টুকরো আর ক্লার্কসাহেব পুলিসের কথায় থানায় যান নি, গিয়েছিলেন নিজে থেকে, মজা দেখতে ; আর ছেলেটা মোটেই গুণ্ডাবাজি করে না, সে খুব ভালো বাঁশি বাজায়। সন্ধ্যার সময় যখন ক্লার্ক মজা করতে করতে আর ছেলেটা বাঁশি বাজাতে বাজাতে থানা থেকে বেরিয়ে এল তখন লোকেরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা বুঝল, এ তো কিছুই হ'ল না। তাদের সামনে সেই শাশ্বত প্রশ্ন দেখা দিল : এখন কী হবে ?

এই অবস্থায় লোকেদের দৃষ্টি প্রিন্সিপালসাহেব আর বৈদ্যজীর ওপর পড়ল। বৈদ্যজী তাঁর স্বস্থানে মদনমোহন মালবীয়র মতো মাথায় পাগড়ি বেঁধে নিশ্চিন্তে বসে ছিলেন। কিন্তু প্রিন্সিপাল-সাহেবকে দেখে মনে হ'ল, তিনি কোনো কিছুর সাহায্য না নিয়েই ইলেকট্রিকের থামের ওপর উঠে দূর থেকে কাউকে দেখে চিৎকার করে বলছেন : "দেখো, দেখো, ও কোনো ক্ষতি করতে চাইছে।" তাঁর দৃষ্টিতে সন্দেহ, আর নিজের জায়গায় লেপটে থাকা প্রত্যেক ভারতবাসীর মতো মনে ভয় যে, কেউ তাঁকে টেনে নামিয়ে না দেয়। লোকে তাঁর দুর্বলতা বুঝে ফেলল এবং তাঁকে ও সেইসঙ্গে বৈদ্যজীকে ঠাট্টা করতে লাগল। ওদিকে তাঁরাও যাতে মারা না পড়েন, সেই ভয়ে আগে থেকেই মারার জন্য তৈরি হলেন।

এই সময় খান্না মাস্টারকে গিয়ে কে যেন বলল, সব কলেজেই একজন প্রিন্সিপাল আর একজন ভাইস-প্রিন্সিপাল থাকেন। খান্না

মাস্টার ইতিহাস পড়ান। তিনি নিজেকে কলেজের সবচেয়ে বড়ো লেকচারার মনে করে একদিন বৈদ্যজীকে গিয়ে বললেন, তাঁকে ভাইস-প্রিন্সিপাল করা উচিত। বৈদ্যজী মাথা নেড়ে বললেন, এ এক নতুন কথা। তরুণদের নতুন চিন্তাই করা উচিত, তাদের প্রত্যেকটা নতুন চিন্তার তিনি মর্যাদা দিয়ে থাকেন—কিন্তু এই ব্যাপারটা ব্যবস্থাপক সমিতির বিচার্য বিষয়। ব্যবস্থাপক সমিতির পরবর্তী বৈঠকে বিষয়টা যদি ওঠে তা হলে তা নিয়ে যথোচিত বিচার-বিবেচনা করা যাবে।

খান্না মাস্টার এ কথা ভাবলেন না যে, ব্যবস্থাপক সমিতির পরবর্তী বৈঠক কখনও হয় না। তিনি তখুনি ভাইস-প্রিন্সিপালের পদটা পাবার জন্য একটা দরখাস্ত লিখলেন আর প্রিন্সিপালের কাছে এই প্রার্থনা জানালেন যে, তাঁর দরখাস্তটা যেন ব্যবস্থাপক সমিতির পরবর্তী বৈঠকে পেশ করা হয়।

প্রিন্সিপালসাহেব খান্না মাস্টারের এই কাজে বিস্মিত হলেন। তিনি বৈদ্যজীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "খান্নাকে এই দরখাস্ত লেখার পরামর্শ আপনি দিয়েছেন?

বৈদ্যজী মাত্র তিনটি কথায় এর জবাব দিলেন, "এখনও বয়েস অল্প।"

এর পরে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত প্রিন্সিপালসাহেব শিবপালগঞ্জের রাস্তায় যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকে প্রাণিশাস্ত্র বোঝান: আজকালকার লোকেরা না-জানি কেমন হয়ে গেছে। খান্না মাস্টারের এই কাজের বর্ণনা তিনি গোটাকয়েক প্রবাদবাক্যের সাহায্যে দিতে আরম্ভ করেছেন, যেমন—"মুখে রাম হাতে ছুরি", "আমার পোষা শেয়াল, আমার ঘরেই হুয়া হুয়া" (যদিও শেয়াল হুয়া হুয়া করে না),

"পেছন দিক থেকে ছুরি চালানো", ব্যাঙের সর্দি হয়েছে"। একদিন তিনি চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতীকবাদী ঢঙে বললেন, "একদিন এক ঘোড়ার খুরে নাল লাগানো হচ্ছিল। তাই না দেখে একটা ব্যাঙের খুব শখ হ'ল, আমিও নাল লাগাব। অনেক করে বলার পর নালওয়ালা ব্যাঙের পায়ে ছোট্ট একটা পেরেক ঠুকে দিল। ব্যস্, ব্যাঙ ভাই ওখানেই পটল তুললেন। শখের পরিণাম মারাত্মক হয়।"

এই পঞ্চতন্ত্রের পেছনে ভয় ছিল : আজ যে ভাইস-প্রিন্সিপাল হতে চায়, কাল সে প্রিন্সিপাল হতে চাইবে। তার জন্য সে ব্যবস্থাপক সমিতির সদস্যদের নিজের দিকে টানবে। মাস্টারদের নিয়ে দল করবে। ছেলেদের মারপিট করার জন্য উস্কাবে। ওপরে অভিযোগ পাঠাবে। সে ইতর, এবং ইতরই থাকবে।

কৃত্রিমতা দিয়ে সত্যকে ঢাকা যায় না,
কাগজের ফুল থেকে গন্ধ বার হয় না।

এই কবিতাটিতে অনুপ্রাণিত হয়ে রামাধীন ভিখমখেড়বী বৈদ্যজীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার বিষয়বস্তু ছিল, ব্যবস্থাপক সমিতির বৈঠক, যা গত তিন বছর যাবৎ হয় নি, দশদিনের মধ্যেই ডাকতে হবে, আর কলেজের সাধারণ সমিতির বার্ষিক সভা, যা কলেজ স্থাপিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত একবারও হয় নি, সে সম্বন্ধে ওখানে বিবেচনা করতে হবে। বিচার্য বিষয়গুলির মধ্যে তিনি ভাইস-প্রিন্সিপালের প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করেছিলেন।

প্রিন্সিপালসাহেব চিঠিখানা পকেটে পুরে যখন বৈদ্যজীর বাড়ি থেকে বেরুলেন তখন হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, চিঠির ভেতর থেকে যেন আগুন বার হচ্ছে। কলেজের দরজায় এসে রুপ্পনবাবুর সঙ্গে

তাঁর দেখা হয়ে গেল। রুপ্পনবাবুকে তিনি বললেন, "দেখেছ, খান্না রামাধীনের খুঁটি ধরে বসে পড়েছে। তার ভাইস-প্রিন্সিপাল হবার শখ জেগেছে। একবার এক ব্যাঙ দেখল, ঘোড়ার ক্ষুরে নাল লাগানো হচ্ছে। সে-ও অমনি…।"

রুপ্পনবাবু কলেজ কেটে বাইরে কোথাও যাচ্ছিলেন, তাঁর খুব তাড়া ছিল। তিনি বললেন, "জানি। এখানকার সকলেই ব্যাঙের ঐ গল্প জানে। কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। খান্নার প্রতি আমার সহানুভূতি নেই, তবু আমি মনে করি, এখানে একজন ভাইস-প্রিন্সিপাল থাকা দরকার। আপনি যখন থাকেন না তখন এখানকার সব মাস্টার কুকুর-বেড়ালের মতো লড়াই করে। টিচার্স রুমে যে গুণ্ডাবাজি হয়, সে বলা যায় না।"

রুপ্পনবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন, আদেশের সুরে বললেন, "প্রিন্সিপালসাহেব, আমি মনে করি, আমাদের এখানে একজন ভাইস-প্রিন্সিপাল থাকা দরকার। খান্না সকলের চেয়ে সিনিয়র। তাঁকেই ভাইস-প্রিন্সিপাল হ'তে দিন। এ তো কেবল নামের ব্যাপার, মাইনে তো বাড়বে না।"

প্রিন্সিপালসাহেবের বুকটা ধড়াস করে উঠল। তিনি বললেন, "এমন কথা ভুলেও কখনও বোলো না রুপ্পনবাবু। এখনই ঐ খান্না-মান্না চেঁচাতে শুরু করে দেবে যে, তুমি ওদের দলে আছ। এটা শিবপালগঞ্জ, এখানে ঠাট্টাও চিন্তা করে করা উচিত।"

"আমি তো সত্যি কথা বলছি। যাক, পরে দেখা যাবে।"

রুপ্পনবাবু চলে গেলেন। প্রিন্সিপালসাহেব পা চালিয়ে তাঁর ঘরে এলেন। শীত ছিল, তবু তিনি কোটটা খুলে ফেললেন। স্কুলের জিনিসপত্র সাপ্লাই করে, এমন একটা দোকান থেকে একটা

ক্যালেণ্ডার দিয়েছিল। সেটা তাঁর চোখের সামনে দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। তাতে নগ্নদেহে একান্ত হেলাভরে স্বচ্ছ শাড়ি জড়ানো একজন ফিল্ম অ্যাকট্রেস একটা লোকের দিকে লাড্ডুর মতো কী একটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। লোকটার গালে বড়ো বড়ো দাড়ি, একটা হাত চোখের সামনে তোলা, আর মুখটা এমন করে রেখেছে, যেন লাড্ডুটা খেয়ে তার বদহজম হয়েছে। তারা মেনকা আর বিশ্বামিত্র।

প্রিন্সিপালসাহেব খানিকক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর চাপরাসীকে ডেকে বললেন, "খান্নাকে ডাকো।"

চাপরাসী রহস্যপূর্ণ স্বরে বলল, "ফিল্ডের দিকে গেছেন। মালবীয়জী সঙ্গে আছেন।"

প্রিন্সিপালসাহেব বিরক্তিভরে সামনের কলমদানটা দূরে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। কলমদানটাও কোনো এডুকেশন এম্পোরিয়ম বিনা মূল্যে নমুনা হিসাবে দিয়েছিল। প্রিন্সিপালসাহেব এমনভাবে ওটা দূরে আছাড় মারলেন, যেন ঐ এম্পোরিয়মের কোনো জিনিসই এই কলেজে কেনা হবে না। কিন্তু প্রিন্সিপালসাহেবের উদ্দেশ্য তা ছিল না। তিনি চাপরাসীকে বলতে চাইছিলেন যে, তিনি এখন তার গোয়েন্দা-রিপোর্ট শুনতে রাজী নন। তিনি ধমকে উঠে বললেন, "আমি বলছি, খান্নাকে এখুনি ডেকে নিয়ে এসো।"

চাপরাসী পরিষ্কার জামাকাপড় পরে ছিল, তার পায়ে খড়ম আর কপালে তিলক। শান্তভাবে সে বলল, "যাচ্ছি। খান্নাকে ডেকে নিয়ে আসছি। এত রাগ করছেন কেন?"

প্রিন্সিপালসাহেব দাঁতে দাঁত ঘষে আড়চোখে টেবিলের ওপর রাখা একটা টিনের টুকরো দেখতে লাগলেন। টিনটা পালিশ করে তার ওপর একটা লাল গোলাপফুল আঁকা হয়েছে। তার নিচে

তারিখ আর মাসের ক্যালেণ্ডার বসানো। মদ তৈরির একটা বিখ্যাত ফার্ম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর স্মরণে এই ক্যালেণ্ডার তৈরি করে চারদিকে পাঠিয়েছে। তাদের হয়তো বিশ্বাস, যেখানে এই ক্যালেণ্ডার যাবে সেখানকার লোক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আদর্শ আর এই ফার্মের মদকে কখনও ভুলবে না। কিন্তু এখন প্রিন্সিপালসাহেবের ওপর এই ক্যালেণ্ডারের কোনো প্রভাব পড়ল না। পণ্ডিত নেহরুর লাল গোলাপ তাঁকে শান্তি দিতে পারল না। সফেন বিয়ারের কল্পনাও তাঁর চোখদুটো বুজিয়ে দিতে পারল না।

চাপরাসী বলল, "আপনিও বামুন, আমিও বামুন। নুন দিয়ে নুন খাওয়া যায় না।"

চাপরাসী এ কথা বলে চলে গেল। প্রিন্সিপালসাহেব শুনতে পাচ্ছেন, খড়মের খট্‌খট্‌ শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। এবার তাঁর দৃষ্টি অন্য একটা ক্যালেণ্ডারের ওপর গিয়ে পড়ল। এই ক্যালেণ্ডারটাতে বছর পাঁচেকের দুটি শিশু দুটো বড়ো বড়ো রাইফেল নিয়ে বরফের ওপর শুয়ে আছে, হয়তো চীনা সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করছে। ক্যালেণ্ডারটা এইভাবে বেশ শিল্পসম্মতভাবে ঘোষণা করছে, কোন্‌ ফ্যাক্টরিতে পাটের থলে সবচেয়ে ভালো তৈরি হয়।

প্রিন্সিপালসাহেব ক্যালেণ্ডারের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খান্নার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন আর ভাবতে লাগলেন, তার ভাইস-প্রিন্সিপাল হবার শখ না জাগলে কতই-না ভালো হ'ত!

ওদিকে, আসন্ন ঘটনাকে একটা ঐতিহাসিক ঘটনার রূপ দেবার জন্য বাইরে বারান্দায় ক্লার্কসাহেব এসে দাঁড়ালেন। দেওয়ালের পেছনে, জানলার নিচে ড্রিল মাস্টার পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

পেচ্ছাব করার জন্য বিড়ি খেতে আরম্ভ করলেন। খান্না আর প্রিন্সিপালসাহেবের খবরটা জনসাধারণের কাছে পৌঁছনোর আগেই যে তা হাওয়ায় উড়ে যাবে, এ ব্যাপারে কোনো সংশয় রইল না।

রাত্রে রঙ্গনাথ আর বদ্রী ছাদের ওপরে শুয়েছিলেন। ঘুমোনোর আগে এমনি গল্প করছিলেন। রঙ্গনাথ তার কথা শেষ করে বলল, "প্রিন্সিপাল আর খান্নার মধ্যে কী কথা হ'ল, বোঝা গেল না। ড্রিলমাস্টার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। খান্নামাস্টার চিৎকার করে বলল, 'এই আপনার মনুষ্যত্ব?'" সে শুধু এইটুকুই শুনতে পেয়েছে।

বদ্রী একটা হাই তুলে বললেন, "প্রিন্সিপাল গালাগালি দিয়েছিল হয়তো। আর তারই জবাবে হয়তো মনুষ্যত্বের কথা উঠেছিল। খান্না তো এই রকমই কথা বলে। শালা একটা গাড়ল।"

রঙ্গনাথ বলল, "গালাগালের জবাব তো জুতো।"

বদ্রী এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না। রঙ্গনাথ আবার বলল, "আমি তো দেখছি, এই মনুষ্যত্বের কথা তোলাটাই বেকার।"

বদ্রী ঘুমোবার জন্য পাশ ফিরে শুলেন। গুডনাইট বলার কায়দায় বললেন, "সে তো সত্যি কথা। কিন্তু এখানে যে-ই ক খ গ ঘ পড়তে শেখে সে-ই উর্দু কপ্‌চাতে শুরু করে। কথায় কথায় মনুষ্যত্ব-মনুষ্যত্ব করে।"

রঙ্গনাথ কম্বল গায়ে দিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইল। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ সে সোফিয়া লরেন আর এলিজাবেথ টেলরের কথা চিন্তা করল। একটু পরেই এটাকে সে চরিত্রহীনতার লক্ষণ মনে করে তার

শহরের ধোপার মেয়ের কথা ভাবতে লাগল। মেয়েটা ধোলাইয়ের কাপড় থেকে তার পরার জন্য পোশাক বাছার সময় বগলকাটা ব্লাউজই বেশি পছন্দ করে। খানিক পরে এ-সবকে সে শস্তা মনে ক'রে আবার ফিল্মের অভিনেত্রীদের ওপর দৃষ্টি দিল, এবং এবার জাতীয়তা আর দেশপ্রেমের নামে লিজ টেলর প্রভৃতিকে ভুলে ওয়াহিদা রহমান আর সায়রা বানুকে নিয়ে পড়ল। দু-চার মিনিট পরেই সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল যে, সব ব্যাপারে বিলেত থেকে প্রেরণা নেওয়া ঠিক নয়, একবার ভালো লেগে গেলে দেশপ্রেমেও অনেক আনন্দ। হঠাৎ তার ঘুম আসতে লাগল এবং অনেক চেষ্টা করার পরও সায়রা বানুর গোটা চেহারার সামনে তার চিন্তার পরিধি ছোটো হয়ে আসতে লাগল। তার মধ্যে কয়েকটা সিংহ আর ভাল্লুক লাফাতে লাগল। বহু চেষ্টা করে একবার সে হঠাৎ করে সায়রা বানুকে ধরে টানতে চাইল, কিন্তু হাত পিছলে গেল আর সেই সুযোগে সিংহ ও ভাল্লুকও বাইরে বেরিয়ে গেল। সেই সময় তার মাথায় খান্নামাস্টারের ভাঙাগড়ার ছবি দু-একবার ভেসে উঠল আর একটা শব্দ অনুরণিত হতে লাগল, "মনুষ্যত্ব!" "মনুষ্যত্ব!"

প্রথমে মনে হ'ল, কেউ যেন ফিসফিস করে কথাটা বলছে। তারপর মনে হ'ল, যেন কেউ মঞ্চে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে কথাটা বলে যাচ্ছে। শেষে মনে হ'ল, কোথাও বোধ হয় দাঙ্গা হচ্ছে আর চারদিক থেকে লোকেরা চিৎকার করছে, "মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব!"

রঙ্গনাথের ঘুম ভেঙে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে শুনতে পেল, "চোর! চোর! চোর! যেন পালিয়ে না যায়। ধরো। চোর! চোর! চোর!"

একটু পরেই সমস্ত কথা শুধু একটি কথায় পরিণত হ'ল, "চোর! চোর! চোর!" যেন গ্র্যামোফোনের পিন রেকর্ডের এই জায়গাটায় এসে আটকে গেছে। রঙ্গনাথ শুনল, গ্রামের অন্য দিক থেকে গোলমাল আসছে। বদ্রী পালোয়ান আগেই চারপায়া থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে পড়েছেন। রঙ্গনাথ উঠে বসল। বদ্রী বললেন, "ছোটে .বলছিল, একদল চোর আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে। মনে হচ্ছে, তারা গ্রামে এসে গেছে।"

তাড়াতাড়ি করে তুজনে কাপড় পরে বাইরে এলেন। দরজা পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতেই তাঁদের পা আরও জোরে জোরে চলতে শুরু করল। ততক্ষণে চারদিক থেকে "চোর, চোর, চোর" শব্দ শুরু হয়ে গেছে। লোকপরম্পরায় আওয়াজ এত বেড়ে গেল যে, 1921 সালে ইংরেজরা যদি তা শুনত তা হলে তখনই তারা ভারত ছেড়ে নিজেদের দেশে চলে যেত।

তুজনেই নিচে নেমে এলেন। বৈঠকখানা থেকে বাইরে বেরুতে বেরুতে বদ্রী পালোয়ান রঙ্গনাথকে বললেন, "তুমি এখানে দরজা বন্ধ করে ঘরেই বোসো, আমি বাইরে গিয়ে দেখছি।"

ওদিকে রুপ্পনবাবু ঘরের ভেতর থেকে ধুতির কোঁচা কাঁধের ওপর ফেলে ফড়্‌ফড়্‌ করতে করতে এসে পৌঁছুলেন। বললেন, "আপনারা তুজন বাড়িতেই থাকুন, আমি বাইরে যাচ্ছি।"

মনে হচ্ছে, বাইরে যাবার অর্থ বীরত্ব দেখানো অথবা চক্রব্যূহ ভেদ করা। তু-ভাই-ই বাইরে যাবার জন্য জিদ্‌ ধরলেন। রঙ্গনাথ শহিদদের মতো বলল, "এই ব্যাপার! তা হলে যান আপনারা বাইরে, আমি বাড়ি থাকব।"

সামনের রাস্তা দিয়ে চাঁদের আলোয় তিনজন লোক "চোর, চোর,

চোর” বলে চেঁচাতে চেঁচাতে চলে গেল। তাদের পেছনে আরও দুজন ঐরকম “চোর, চোর” রব তুলে ছুটল। শেষে একা একজন “চোর, চোর” বলে চিৎকার করতে করতে তার পিছু ধরল। তারপর আবার তিনজন এল। সবার হাতেই লাঠি। সবাই দৌড়ুচ্ছে। সবাই চোর তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

মিছিলের সবশেষে যারা বেরুল তাদের মধ্যে একজনকে বদ্রী চিনতে পারলেন। সে-ও দৌড়ে আগের লোকেদের সঙ্গে মিশে গেল। বদ্রী চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, “কে? ছোটে? কোথায় চোর?”

ছোটে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, “সামনে। সামনে পালিয়েছে।”

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর রুপ্পনবাবু আর রঙ্গনাথ বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করে, তালা লাগিয়ে ছাদে ফিরে এলেন। নিচে থেকে বৈদ্যজী গলা কেশে বললেন, “কে?”

রুপ্পনবাবু জবাব দিলেন, “চোর, বাবা।”

বৈদ্যজী ঘাবড়ে গিয়ে গর্জন করে বললেন, “কে? রুপ্পন? তুমি ছাদে আছ?”

গ্রামে যে শোরগোল উঠেছে, রুপ্পন তার ওপর তাঁর গলা চড়িয়ে বললেন, “হ্যাঁ, আমি। কেন জেনেশুনে জিজ্ঞাসা করছেন? যান না, চুপ করে শুয়ে থাকুন।”

বৈদ্যজী তাঁর ছোটো ছেলের এইরকম সাদর বাণী শুনে চুপ করে গেলেন। ছাদের ওপর রুপ্পনবাবু আর রঙ্গনাথ সারা গ্রামে ছড়াতে থাকা আওয়াজ শুনতে লাগলেন।

কে একজন বাড়ির পেছন দিক থেকে চেঁচিয়ে উঠল, “মেরে ফেলল।”

আরও হৈচৈ উঠল। একজন চিৎকার করে বলল, "আরে, ছোটে, এ নয়। এ তো ভগবতী।"

"ছেড়ে দাও, একে ছেড়ে দাও। ওদিকে, ওদিকে। চোর ওদিকে গেছে।"

কে যেন কাঁদছিল। একজন তাকে সান্ত্বনা দিল, "কেন ষাঁড়ের মতো কাঁদছ? একটা ডাণ্ডা পড়েছে, তাতেই কেঁই কেঁই করছ!"

কাঁদতে কাঁদতে সে জবাব দিল, "আমিও এর প্রতিশোধ নেব। দেখে নেব।"

রঙ্গনাথ উৎসাহ সহকারে মজা দেখতে লাগল। রুপ্পনবাবু বললেন, "ভগবতী আর ছোটের মধ্যে ঝগড়া চলছে। মনে হচ্ছে, এই গণ্ডগোলের মধ্যে ছোটে কিছু করে বসেছে।"

রঙ্গনাথ বলল, "এটা খুব খারাপ কথা।"

রুপ্পনবাবু আপত্তি জানিয়ে বললেন, "খারাপ কেন? দাঁও পেয়ে যাবার ব্যাপার। ছোটে দেখতেই ভোঁদা, কিন্তু আসলে অত্যন্ত চালাক।"

দুজনে আবার চারদিকের ছোটাছুটি আর চেঁচামেচির দিকে কান দিলেন। রঙ্গনাথ বলল, "চোর বোধহয় পালিয়ে গেছে।"

"ও তো এখানে সব সময়েই হয়।"

কথাবার্তা এখানেই থেমে গেল। চেঁচামেচির শেষ পর্যায় চলছে। লোকেরা আকাশ ফাটানোর উদ্দেশ্যে সমস্বরে বজরঙ্গবলীর জয়ধ্বনি করতে শুরু করেছে। রঙ্গনাথ বলল, "মনে হচ্ছে, চোর ধরা পড়েছে।"

রুপ্পনবাবু বললেন, "না। গ্রামের লোকদের আমি ভালো করেই জানি। চোরকে তারা গ্রামের বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে এসেছে হয়তো।

চোর যে তাদেরই গ্রাম থেকে বাইরে তাড়িয়ে দেয় নি, এটাই কি কম কথা? সেই আনন্দেই লোকেরা জয়-জয়কার শুরু করেছে।"

চাঁদের আলোয় লোকেরা দুজন-চারজনের জোট বেঁধে কিচমিচ করতে করতে পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে। রুপ্পনবাবু ছাদের কার্নিসে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন। একটা দল নিচে থেকে বলল, "জেগে থেকো রুপ্পনবাবু।"

কিছুক্ষণের মধ্যে সারা গ্রামে ঐ কথাটাই গুঞ্জরিত হ'তে শুরু করল, "জেগে থাকো", "জেগে থাকো।"

এখন থেমে থেমে চেঁচামেচি উঠছে। চারদিকে হুইস্‌ল্‌ও শোনা যাচ্ছে। রঙ্গনাথ বলল, "এই হুইস্‌ল্‌ কিসের?"

রুপ্পনবাবু বললেন, "তোমাদের শহরে কি পুলিস টহল দেয় না?"

"ও, তা হলে পুলিসও এখন সময়মতো এসে পড়েছে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। পুলিসই তো গ্রামের লোকদের সাহায্য নিয়ে ডাকাতদের সঙ্গে মোকাবিলা করল। পুলিসই তো তাদের এখান থেকে মেরে তাড়াল!"

রঙ্গনাথ বিস্মিত হয়ে রুপ্পনের দিকে তাকিয়ে রইল, "ডাকাত?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাকাতি নয়তো কী? চাঁদনি রাতে কখনও চোর আসে? ওরা তো ডাকাতই ছিল।"

রুপ্পনবাবু জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, "দাদা, এটা গ্রামের লোকেদের কথা। বোঝা মুশকিল। খবরের কাগজে যা ছাপা হবে, আমি তা-ই তোমাকে বললাম।"

বাড়ির একেবারে নিচে রাস্তার ওপর একটা হুইস্‌ল্‌ বাজল। রুপ্পন বললেন, "তুমি মাস্টার মোতিরামকে দেখেছ? পুরনো লোক।

দারোগাসাহেব তাঁকে খুব সম্মান করেন। তিনিও দারোগাসাহেবকে সম্মান করেন। প্রিন্সিপালসাহেব এঁদের দুজনকেই সম্মান করেন। কোনো শালা কাজ করে না, কেবল পরস্পরকে সম্মান করে। এই মাস্টার মোতিরাম শহরের খবরের কাগজের সংবাদদাতা। তিনি যদি চোরকে ডাকাত না বানাতে পারেন তা হলে মাস্টার মোতিরাম হয়ে লাভ কী হ'ল?"

হুইস্‌ল্ আর "জেগে থাকো" চিৎকার দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এদিক-ওদিক করে বাড়িগুলোতে লোকেরা দরজা খোলানোর জন্য চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। বৈদ্যজীর বাড়িতেও কে যেন সদর দরজার ছিটকিনি খটখট করছে। বাইরে একজন হালচাষী শুয়ে ছিল, সে জোরে কেশে উঠল। আবার ছিটকিনির শব্দ হ'ল। রঙ্গনাথ বলল, "বোধহয় বদ্রীদাদা। চলো, তালা খুলে দিই।"

তারা নিচে এসে গেল। তালা খুলতে খুলতে রুপ্পন জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হ'ল দাদা? সব চোর পালিয়ে গেল?"

বদ্রী পালোয়ান কোনো জবাব দিলেন না। তিনি চুপচাপ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে এলেন। রুপ্পনবাবু নিচেই ভেতরে চলে গেলেন। ওপরের ঘরে রঙ্গনাথ আর বদ্রী পালোয়ান যে-ই নিজের নিজের চারপায়ার ওপর গিয়ে শুলেন অমনি নিচে গলির ভেতর থেকে কে যেন ডাকল, "ওস্তাদ, নিচে এসো। ব্যাপারটা বড়ো গোলমেলে হয়ে পড়েছে।"

বদ্রী ঘরের দরজা থেকেই চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছে ছোটে? শুতে দেবে, না সারা রাত এই করতে থাকবে?"

ছোটে ওখান থেকেই জবাব দিল, "ওস্তাদ, শোয়াটোয়ার কথা ছাড়ো, এখন রিপোর্টের কথা হচ্ছে। এদিকে তো শালা গলি গলি দৌড়ে "চোর, চোর" করতে থাকলাম, আর ওদিকে এই গোল-মালের মধ্যে কে যেন হাত মেরে দিয়েছে। গয়াদীনের ওখানে চুরি হয়ে গেছে। নেমে এসো।"

দশ

এই গ্রামে একজন লোক আছেন, তাঁর নাম গয়াদীন। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগে তিনি খুব ওস্তাদ, কারণ তাঁর পেশা সুদখোরি। তাঁর একটা দোকান আছে, সেখানে কাপড় বিক্রি হয় আর টাকা-পয়সার লেনদেন হয়। তাঁর এক বয়স্থা মেয়ে আছে, নাম বেলা; আর এক বিধবা বোন আছে। তাঁর বউ অনেকদিন আগেই মারা গেছে। বেলা স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, এবং রামায়ণ আর "মায়া", "মনোহর কহানিয়াঁ" ইত্যাদি পত্রিকা পড়ার মতো বিদ্যাও তার আছে। তার জন্য একটা সুন্দর ও সুযোগ্য পাত্র সন্ধান করা হচ্ছে। বেলার মুখশ্রী আর শরীরের গড়ন দুই-ই প্রেম করার মতো। রুপ্পনবাবু তাকে ভালোবাসেন। কিন্তু বেলা তা জানে না। রুপ্পনবাবু রোজ রাত্রে ঘুমোবার আগে তার দেহ ধ্যান করেন, এবং সেই ধ্যান শুদ্ধ রাখার জন্য ধ্যানে কেবল তার

দেহই দেখেন, তার ওপরকার কাপড় নয়। বেলার পিসি গয়াদীনের বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করে, বেলাকে বাড়ির বার হতে দেয় না। বেলা বড়োদের কথা শোনে, দরজার বার হয় না। কখনও বাইরে যাবার দরকার হলে ছাদের রাস্তা ধরে, লাগানো ছাদ পার হয়ে, কোনো প্রতিবেশীর বাড়ি পর্যন্ত যায়।

রুপ্পনবাবু বেলার জন্য খুবই ব্যাকুল। সপ্তাহে তাকে তিন-চারখানা চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেলে দেন।

এ-সব কথার কোনো তাৎক্ষণিক গুরুত্ব নেই। গয়াদীন সুদের কারবার করেন আর কাপড়ের দোকান চালান, এর মধ্যেই যত গুরুত্ব। কো-অপারেটিভ ইউনিয়নও সুদের কারবার করে এবং কাপড়ের দোকান চালায়। দুইয়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলছে। বৈদ্যজীর সঙ্গে গয়াদীনের ভালো সম্পর্ক। গয়াদীন কলেজের ব্যবস্থাপক সমিতির উপসভাপতি। তাঁর পয়সা আছে, মানমর্যাদা আছে; তাঁর ওপর বৈদ্যজী, পুলিস, রুপ্পন, স্থানীয় এম. এল. এ. আর জেলা বোর্ডের ট্যাক্স কালেক্টরের কৃপা আছে।

এ-সব সত্ত্বেও তিনি নিরাশাবাদী। তিনি খুব সতর্ক হয়ে চলেন। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব সাবধান। তিনি উড়দ ডাল পর্যন্ত খান না। একবার তিনি শহরে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে খাবার সময় উড়দ ডাল দেওয়া হয়েছিল। গয়াদীন আস্তে করে থালাটা দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর আচমন করে অভুক্ত উঠে এসেছিলেন। পরে তাঁকে অন্য ডাল দিয়ে আবার খাবার দেওয়া হয়েছিল। সেবার তিনি আচমন করে খাবার খেয়ে নিয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় আত্মীয়টি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন

উড়দ ডালে তাঁর আপত্তি কেন? কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় তিনি বলেছিলেন, উড়দ ডাল খেলে পেটে বায়ু হয় আর তাতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

আত্মীয়টি জানতে চেয়েছিলেন, ক্রোধ উৎপন্ন হলে কী হয়েছে? ক্রোধ তো আর সিংহ বা চিতা নয়! তাতে এত ঘাবড়াবার কী আছে?

আত্মীয়টি একটি অফিসে কাজ করতেন। গয়াদীন তাকে বুঝিয়েছিলেন, তাঁর কথা ঠিক নয়। ক্রোধ সবাইকে মানায় না। কেবল হাকিমদেরই মানায়, কারণ হুকুমৎ চলে গেলেও হাকিমি থাকে। কিন্তু তাঁরা ব্যবসায়ী মানুষ। তাঁদের ক্রোধ উৎপন্ন হতে শুরু করলে ভুলেও কেউ তাঁদের দোকানে আসবে না। আর কে বলতে পারে, কখন কী ঝঞ্ঝাট এসে উপস্থিত হবে।

সেই গয়াদীনের ওখানে চুরি হয়ে গেল। কিছু গয়নাপত্র আর কাপড়ই শুধু চুরি হয়েছে, এবং পুলিসের পক্ষে এটা মনে করাই বেশি সুবিধাজনক যে, ঐ রাত্রে চোর তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছিল যারা তাদেরই কেউ চুরি করেছে। চোর ছাদের ওপর থেকে উঠোনে লাফিয়ে পড়লে গয়াদীনের মেয়ে আর বোন তাকে দেখতে পায় নি। তখন দেখতে পেলে তার মুখটা দেখা যেত। পরে যখন চোরটা লাঠির ওপর ভর দিয়ে দেওয়ালে উঠে ছাদের ওপর দিয়ে চলে গেল তখন তারা তাকে দেখতে পেয়েছিল। তবে তারা পিঠটাই শুধু দেখতে পেয়েছিল। পুলিস এতে খুবই বিরক্ত। পুলিস গত তিনদিন ধরে বেশ কয়েকজন চোরকে তাদের দুজনের সামনে এনে হাজির করেছে আর তাদের মুখ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে পিঠও দেখিয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজনকেও পাওয়া

গেল না, বেলা অথবা তার পিসি যার পিঠের দিক থেকে গলায় জয়মালা দিয়ে বলতে পারে, "দারোগাবাবু, এই আমার সেই রাতের চোর।"

পুলিস এতে খুবই অসন্তুষ্ট। দারোগাবাবু বিড়বিড় করতে শুরু করে দিয়েছেন, গয়াদীনের মেয়ে আর বোন জেনে শুনে চোরটাকে ধরিয়ে দিতে চাইছে না। কে জানে, কী ব্যাপার।

গয়াদীন আরও নিরাশাবাদী হয়ে পড়লেন। কারণ, গ্রামে এত বাড়ি থাকতে শেষ পর্যন্ত তাঁর বাড়িতেই চোর এল! আর এলই যখন, নিচে নামার সময় বেলা আর তাঁর বোন খুব ভালোভাবেই তার মুখটা দেখতে পারত, কিন্তু দেখতে পেল কেবল তার পিঠ। দারোগাবাবু সবার সঙ্গে হেসে কথা বলেন, কিন্তু এখন তিনি বাঁকা কথা বলার লোক পেয়েছেন গয়াদীনকে।

এই গ্রামে কয়েকজন মাস্টারও থাকেন। তাঁদের মধ্যে একজন খান্না মাস্টার। তিনি একটা নির্বোধ। দ্বিতীয় আছেন মালবীয়, তিনিও নির্বোধ। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ আর সপ্তম মাস্টারের নাম গয়াদীন জানেন না, তবে তাঁরাও নির্বোধ। ঠিক এই মুহূর্তে গয়াদীনের নিরাশা আরও গভীর হতে শুরু করল, কারণ ঐ সাত-জন মাস্টার একসঙ্গে তাঁর বাড়ির দিকেই আসছেন। নিশ্চয় তাঁরা প্রথমে চুরির ব্যাপারে সহানুভূতি দেখিয়ে তারপর কলেজের ব্যাপারে নির্বোধের মতো কথা বলতে শুরু করবেন।

তা-ই হ'ল। মাস্টাররা আধঘণ্টা ধরে গয়াদীনকে বোঝালেন যে, তিনি কলেজের ব্যবস্থাপক সমিতির উপাধ্যক্ষ এবং যেহেতু অধ্যক্ষ কয়েক বছর যাবৎ বোম্বাইয়ে আছেন আর ওখানেই

থাকবেন, তাই ম্যানেজার আর প্রিন্সিপালের অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁর কিছু করা দরকার।

গয়াদীনও বেশ ঠাণ্ডাভাবে সর্বোদয়ী সভ্যতা অনুসারে তাঁদের বোঝালেন যে, উপাধ্যক্ষ তো কেবল নামেই, আসলে এটা কোনো পদের মতো পদ নয়। তাঁর কোনো ক্ষমতা নেই। আর মাস্টারমশায়, এই খেলা তোমরাই খেলো, আমাকে এর মধ্যে টেনো না।

তখন নাগরিক শাস্ত্রের মাস্টার গম্ভীরভাবে তাঁকে বোঝাতে লাগলেন, উপাধ্যক্ষের ক্ষমতা কত। তাঁর ধারণা ছিল, গয়াদীন এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। তিনি ভারতীয় সংবিধান অনুসারে উপাধ্যক্ষের ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে শুরু করে দিলেন। আর গয়াদীন জুতোর ডগা দিয়ে মাটিতে একটা বৃত্ত আঁকতে থাকলেন। তার মানে এই নয় যে, তিনি জ্যামিতি জানেন, বরং এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি কোনো একটা ফন্দির কথা চিন্তা করছেন।

হঠাৎ গয়াদীন মাস্টারকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হলে এই প্রসঙ্গে বলো মাস্টারমশায়, ভারতের উপাধ্যক্ষ কে?"

প্রশ্নটা শুনেই মাস্টারদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু হয়ে গেল। কেউ এদিকে তাকান, কেউ ওদিকে তাকান। কিন্তু কোনো দেওয়ালেই ভারতের উপাধ্যক্ষের নাম লেখা নেই। শেষে নাগরিক শাস্ত্রের মাস্টার বললেন, "আগে তো রাধাকৃষ্ণন্‌জী ছিলেন, এখন তিনি বদলি হয়ে গেছেন।"

গয়াদীন আস্তে করে বললেন, "এখন বুঝে নাও মাস্টারমশায়, উপাধ্যক্ষের কী ক্ষমতা।"

অন্তত কলেজের ব্যবস্থাপক সমিতির একটা বৈঠক গয়াদীনজী ডাকুন। গয়াদীন গ্রামের মহাজন ঠিকই, কিন্তু এমন মহাজন নন যে, কোনো একটা দিকে বার হলেই অমনি পথ তৈরি হয়ে যাবে। তিনি সেই জাতের মহাজন নন, যাঁরা অজানা রাস্তায় প্রথমে ভাড়াটে লোক পাঠান, তারপর যখন দেখেন তার ওপর পাক্‌দণ্ডী তৈরি হয়ে গেছে আর তার ধসে পড়ার আশঙ্কা নেই তখন মহাজনের মতো ছড়ি টুক্‌ টুক্‌ করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যান। তাই মাস্টারদের জিদের কোনো বিশেষ প্রভাব তাঁর ওপর পড়ল না। তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন, "বৈঠক ডাকার জন্য রামাধীনকে লাগিয়ে দাও মাস্টারমশায়। এই-সব কাজে তিনিই উপযুক্ত লোক।"

"তাঁকে তো লাগিয়েই দিয়েছি।"

"ব্যস, লাগিয়েই রাখো। ফস্কে যেতে দিয়ো না।"

কথাগুলো বলে গয়াদীন আশেপাশে বসে থাকা অন্য লোকদের দিকে তাকালেন। তারা কাছের সব গ্রাম থেকে এসেছে। কেউ এসেছে পুরনো প্রোনোটের মেয়াদ বাড়াতে, কেউ এসেছে নতুন প্রোনোট লেখাতে, আবার কেউ এসেছে কোনো ভাবে না কোনো ভাবে প্রোনোট থেকে রেহাই পেতে। খান্না মাস্টার স্থির করেই রেখেছিলেন, আজ গয়াদীনের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে কথা ঠিক করে ফেলতেই হবে। তাই আবার তিনি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "মালবীয়জী, এবার আপনিই গয়াদীনজীকে বোঝান। এই প্রিন্সিপাল তো আমাদের পিষে মারছে।"

গয়াদীন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ভাবলেন, বোধ হয় ভাগ্যে এই লেখা আছে; এই নিষ্কর্মা মাস্টাররা এখান থেকে যাবে না। তিনি নড়েচড়ে চারপায়ার ওপর অন্য ভঙ্গিতে বসলেন। অন্যসব

গ্রাম থেকে আসা লোকদের বললেন, "তা হলে যাও ভাই তোমরাই যাও। কাল সকালে একটু তাড়াতাড়ি এসো।"

গয়াদীন আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে খান্না মাস্টারের দিকে মুখ করে বসলেন। খান্না মাস্টার বললেন, "আপনি অনুমতি দিলে গোড়া থেকে বলতে আরম্ভ করি।"

"কী বলবে মাস্টারমশায়?" গয়াদীন বিরক্ত হয়ে বললেন, "প্রাইভেট স্কুলের মাস্টারি, সে তো পিষ্ট হবারই কাজ। কোথায় পালাবে?"

খান্না বললেন, "অসুবিধে হচ্ছে, গত পাঁচ বছর যাবৎ এই কলেজের জেনারেল বডির মিটিং হয় নি। বৈদ্যজীই ম্যানেজার রয়েছেন। নতুন সাধারণ নির্বাচন হয় নি, যা কিনা প্রত্যেক বছর হওয়া উচিত।"

গয়াদীন কিছুক্ষণ রামলীলার রামলক্ষ্মণের মতো ভাবলেশহীন মুখ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, "আপনারা তো লেখা-পড়া জানা লোক, আমি আপনাদের কী বলব! কিন্তু এমন শয়ে শয়ে সংস্থা আছে, যেখানে বার্ষিক বৈঠক বছরের পর বছর হয় নি। এখানকার জেলা বোর্ড! এক যুগ থেকে নির্বাচন না করিয়েই একে বছরের পর বছর টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।" তারপর গাল ফুলিয়ে চাপা গলায় বললেন, "সারা দেশেই এই হাল।" গলাটা দেশভক্তির জন্য নয়, কাশির জন্য আটকে গিয়েছিল।

মালবীয়জী বললেন, "প্রিন্সিপাল হাজার হাজার টাকা ইচ্ছেমতো খরচ করে। প্রত্যেক বছরই অডিটওয়ালারা এতে আপত্তি করে আর প্রত্যেক বছরই সে ফাঁকি দিয়ে যায়।"

গয়াদীন খুব নির্দোষভাবে বললেন, "আপনি কি অডিটের ইন-চার্জ?"

মালবীয়জী গলাটা একটু চড়িয়ে জবাব দিলেন, "আজ্ঞে না, কথা তা নয় ; কিন্তু জনসাধারণের টাকা এভাবে নষ্ট হবে, এটা আমরা দেখতে পারি না। শেষ পর্যন্ত··· ।"

গয়াদীন তাঁর কথায় বাধা দিয়ে আগের মতোই ধীর কণ্ঠে বললেন, "তা হলে কীভাবে জনসাধারণের টাকা নষ্ট হবে আপনারা চান ? বড়ো বড়ো ইমারত বানিয়ে ? সভা ডেকে ? নেমন্তন্ন খাইয়ে ?"

এ কথার কাছে মালবীয়জী নতি স্বীকার করলেন। গয়াদীন উদারভাবে বোঝালেন, "মাস্টারমশায়, আমি বেশি লেখাপড়া জানি না ঠিক, কিন্তু ভালো সময়ে কলকাতা, বোম্বাই দেখেছি। কম বেশি আমিও বুঝি। জনসাধারণের টাকার ওপর এত দরদ দেখানো ঠিক নয়। সে তো নষ্ট হবেই।" একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার তিনি খান্না মাস্টারকে সস্নেহে বললেন, "না মাস্টারমশায়, জনসাধারণের টাকা নিয়ে এত চিন্তাভাবনা কোরো না, অনেক কষ্ট পেতে হবে।"

মালবীয়জীর মনে হ'ল, গয়াদীনের চিন্তাধারা খুবই গভীর। সত্যিই গভীর। কিন্তু তিনি এখনও নদীর তীরে বালির ওপরই ঘোরাফেরা করছেন। তিনি বললেন, "গয়াদীনজী, আমি জানি, এ-সব কথার মধ্যে আমাদের মাস্টারদের থাকার দরকার নেই। কলেজের বদলে বৈদ্যজী আটাচাকির মেশিন বসান, কি প্রিন্সিপাল তাঁর মেয়ের বিয়ে দিন, এই প্রতিষ্ঠানটা তো আপনাদেরই। এখানে এমন ঢালাওভাবে অন্যায় চলবে ? নৈতিকতার নামমাত্র থাকবে না ?"

এতক্ষণে প্রথম গয়াদীনের মুখে কিছুটা ক্লান্তির ছায়া পড়ল। কিন্তু যখন তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন তখন আওয়াজ

আগেরই মতো শোনাল, "নৈতিকতার নাম উচ্চারণ কোরো না মাস্টারমশায়, কেউ শুনে ফেললে চালান করে দেবে।"

সবাই চুপ করে রইলেন। গয়াদীনের দৃষ্টি এক কোণে চলে গেল। সেখানে কাঠের একটা ভাঙা চৌকি পড়ে আছে। গয়াদীন তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "নৈতিকতা ঐ চৌকিটার মতো। এক কোণে পড়ে রয়েছে। সভা-সমিতির সময় এর ওপর চাদর পেতে দেওয়া হয়। তখন খুব সুন্দর দেখায়। এর ওপর দাঁড়িয়ে লেকচার দেওয়া হয়। এটা তারই জন্য।"

এই কথাটায় মাস্টাররা একেবারেই চুপ হয়ে গেলেন। গয়াদীনই তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আর কিছু বলো মাস্টারমশায়, তোমাদের নিজেদের কী অসুবিধা আছে? এতক্ষণ পর্যন্ত তো তোমরা কেবল জনসাধারণের অসুবিধার কথাই বললে!"

খান্না মাস্টার হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠলেন, "আপনার কাছে কোনো অসুবিধার কথা বলা বৃথা। আপনি কোনো জিনিসকেই অসুবিধা বলে স্বীকার করছেন না।"

"কেন স্বীকার করব না!" গয়াদীন সস্নেহে বললেন, "নিশ্চয়ই স্বীকার করব। তুমি বলো না।"

মালবীয়জী বললেন, "প্রিন্সিপাল আমাদের হাত থেকে সমস্ত কাজ নিয়ে নিয়েছে। খান্নাকে আর হস্টেল ইন-চার্জ রাখে নি, আমার কাছ থেকে গেমের চার্জ নিয়ে নিয়েছে। রায়সাহেব বরাবর পরীক্ষার সুপারইনটেনডেণ্ট ছিলেন, তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এ-সব কাজ সে নিজের লোকদের দিচ্ছে।"

গয়াদীনের কাছে কথাগুলো যুক্তিবিরুদ্ধ মনে হ'ল। তিনি বললেন, "আমি কিছু বললে তো আপনারা অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু

প্রিন্সিপালসাহেবের যখন তাঁর ইচ্ছেমতো ইন-চার্জ বাছাই করার এক্তিয়ার আছে তখন এতে আপত্তি কিসের?"

মাস্টাররা একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। গয়াদীন আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "পৃথিবীতে সব কাজ তোমার ইচ্ছেমতো থোড়াই হবে মাস্টারমশায়! গত বছরের কথা মনে করো তো, ঐ বৈজেগাঁওয়ের লালসাহেবকে লাটসাহেব ভাইস-চ্যান্সেলর করে দিয়েছিলেন কিনা? লোকেরা এত লাফালাফি করল, কিন্তু কেউ কিছু করতে পারল? পরে সবাই চুপ করে গেল। তোমরাও চুপ করে যাও। চেঁচামেচি করে কিছু হবে না। লোকে তোমাদেরই খারাপ বলবে।"

একজন মাস্টার পেছন থেকে বলে উঠলেন, "এর কী করা যায়, প্রিন্সিপাল ছেলেদের আমাদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়। মা-বোন তুলে গালাগাল দেয়। মিথ্যে রিপোর্ট করে। আমরা কিছু লিখে দিলে কাগজটাই গুম করে দেয়। পরে কৈফিয়ৎ তলব করে।"

গয়াদীন চারপায়ার ওপর আস্তে করে নড়ে বসলেন। চারপায়াটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে উঠল। তাতে তিনি একটু লজ্জিত হলেন। একটু চিন্তা করে বললেন, "এ তো তোমরা আমাকে অফিসের নিয়মকানুন বলছ। ওখানে তো এ-সব হয়েই থাকে।"

মাস্টার রাগতভাবে বললেন, "পাঁচ-দশটা লাশ যখন পড়বে তখন আপনি বুঝবেন যে, নতুন কিছু হয়েছে।"

গয়াদীন মাস্টারের রাগকে দয়ার দৃষ্টিতে দেখলেন। বুঝলেন, মাস্টার আজ উড়দ ডাল খেয়েছেন। তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন, "সে-ও বা নতুন কী? চারদিকে পট্ পট্ করে লাশই তো পড়ছে।"

খান্না মাস্টার ব্যাপারটা সামলে নিলেন। বললেন, "এঁর কথায় কিছু মনে করবেন না। আমরা সত্যিই বিরক্ত। অনেক অসুবিধা আছে। আপনি দেখুন না, এই জুলাই মাসেই সে তার তিনজন আত্মীয়কে মাস্টার রেখেছে। আমাদের চেয়ে তাদের সিনিয়র বানিয়ে সমস্ত কাজ দিচ্ছে। স্বজনপোষণের ঢালাও কারবার। বলুন, আমাদের খারাপ লাগবে না।"

"খারাপ কেন লাগবে ভাই?" গয়াদীন কাশতে লাগলেন, "তুমিই তো বলছ, স্বজনপোষণের ঢালাও কারবার চলছে। হয়তো বৈদ্যজীর কোনো আত্মীয়কে পাওয়া যায় নি, তাই বেচারা নিজের আত্মীয়দের লাগিয়ে দিয়েছে।"

দু-একজন মাস্টার হাসতে লাগলেন। গয়াদীন আগের মতো বলতে শুরু করলেন, "হাসির কথা নয়। এটাই এখন যুগধর্ম। যা সকলে করে, প্রিন্সিপালও তা-ই করেছে। বেচারা তার আত্মীয়দের কোথায় নিয়ে যাবে?"

খান্না মাস্টারকে উদ্দেশ করে তিনি আবার বললেন, "তুমি তো ইতিহাস পড়াও, না মাস্টারমশায়? সিংহগড় বিজয় কীভাবে হয়েছিল?"

খান্না মাস্টার চিন্তা করতে লাগলেন। গয়াদীন বললেন, "আমিই বলছি। তানাজী কী নিয়ে গিয়েছিলেন? একটা গোসাপ। গোসাপটাকে তিনি একটা দড়ির সঙ্গে বেঁধে দুর্গের দেওয়ালের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। গোসাপটা যেখানে লেগে বসে গিয়েছিল, সেখানেই বসে ছিল। সঙ্গে যে-সব সৈন্য ছিল তারা ঐ দড়ির সাহায্যে সর্ সর্ করে ছাদে পেঁ ৗছে গিয়েছিল।"

এতখানি বলতে বলতে তিনি বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন,

হয়তো এ কথা ভেবে যে, মাস্টাররা কিছুটা বুঝেছেন। গয়াদীন তাঁদের মুখের দিকে তাকালেন। তাঁরা নির্বিকার। গয়াদীন তাঁর কথাটা বুঝিয়ে দিলেন, "আমাদের এখানকারও ঐ হাল মাস্টার-মশায়। যে যেখানে আছে, সেখানেই নিজের জায়গায় গোসাপের মতো লেগে বসে আছে। তাকে যত খোঁচাও, যত তাড়াও— সে তার জায়গায় এঁটে বসে থাকবে আর যত আত্মীয়স্বজন আছে, সবাই ঐ লেজের সাহায্যে সর্ সর্ করে ওপরে চলে যাবে। কলেজের কেন বদনাম করছ, সব জায়গায় এই একই অবস্থা।"

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বলো তো মাস্টারমশায়, এ জিনিস কোথায় নেই?"

মাস্টারদের দল চামরাহীর পাশ দিয়ে বেরুলেন। সবার মাথা নিচের দিকে ঝুলে আছে, যেন এখুনি টুপ্ করে পায়ের ওপর খসে পড়বে।

চামরাহী এই গ্রামের এক মহল্লার নাম। সেখানে চামারেরা থাকে। চামার এক জাতির নাম, তাদের অচ্ছুৎ বলা হয়। অচ্ছুৎ একরকম দোপায়া জীবের নাম, সংবিধান চালু হবার আগে লোকে তাদের ছুঁত না। সংবিধান এক কবিতার নাম, তার 17 নম্বর অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটানো হয়েছে। যেহেতু এদেশে লোকে কবিতার আশ্রয়ে নয়, বরং ধর্মের আশ্রয়ে বাস করে এবং যেহেতু অস্পৃশ্যতা এ দেশের এক ধর্ম, তাই শিবপালগঞ্জেও অন্যসব গ্রামেরই মতো অচ্ছুৎদের আলাদা আলাদা মহল্লা আছে। আর তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মহল্লা হচ্ছে চামরাহী। কোনো এক সময় জমিদাররা অনেক আশা নিয়ে এই চামরাহীর পত্তন করেছিলেন।

জমিদাররা চর্মশিল্পের উন্নতির জন্য এখানে এই চামরাহীর পত্তন করেন নি, তাঁরা চেয়েছিলেন, এখানে যারা বসতি করতে আসবে তারা ভালো লাঠি চালাতে পারবে।

সংবিধান চালু হবার পর চামরাহী আর শিবপালগঞ্জের বাকি অংশের মাঝখানে একটা ভালো কাজ করা হয়েছে ; ওখানে একটা চবুতরা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার নাম গান্ধী চবুতরা। আজও হয়তো অনেকের মনে আছে, গান্ধী ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন এবং তাঁর অস্থি-কলসের সঙ্গেই তাঁর বাণীগুলোও সংগমে বিসর্জন দেবার পর স্থির করা হয়েছে যে, গান্ধীর স্মরণে এখন কেবল পাকা ইমারতই বানানো হবে। আর সেই সুবাদেই শিবপালগঞ্জে এই চবুতরা বানানো হয়েছে। শীতের সময় রোদ পোহাবার পক্ষে এই চবুতরাটা খুবই ভালো, আর এর ওপর বেশির ভাগ কুকুরই রোদ পোহায়, এবং যেহেতু কুকুরদের জন্য বাথরুম বানানো হয় না, তাই তারা রোদ পোহাতে পোহাতে চবুতরার কোণে পেচ্ছাবও করে আর তাদের দেখাদেখি কখনও কখনও মানুষও চবুতরার আড়ালে ঐ কাজটি সম্পন্ন করে।

মাস্টাররা দেখলেন, এই চবুতরার ওপর আজ ল্যাংড়া আগুন জ্বালিয়ে বসে আছে আর তার ওপর কিছু ভাজছে। কাছে এসে তাঁরা দেখতে পেলেন, সে গোল গোল নিরেট রুটি ভাজছে, এবং নিশ্চয় তা সে আশেপাশে যে-সব কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের জন্য ভাজছে না। ল্যাংড়াকে দেখেই মাস্টারদের মন হালকা হয়ে গেল। তাঁরা থেমে পড়লেন। ল্যাংড়ার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। দু মিনিটের কথাতেই তাঁরা জানতে পারলেন, ল্যাংড়া যে নকলটার জন্য তহসিলে দরখাস্ত করেছিল সেটা সে একেবারে

নিয়মমাফিক, এক কাণাকড়িও অন্যায়ভাবে খরচ না করে, পেতে যাচ্ছে।

কিন্তু মাস্টারদের তা বিশ্বাস হ'ল না।

ল্যাংড়ার কথাবার্তায় আজ নিরাশাবাদ-যোগ-নিয়তিবাদ-বিয়োগ-পরাজয়বাদ-ভাগ-কুণ্ঠাবাদের কোনো প্রভাব নেই। সে জানাল, "বিশ্বাস করো বাবু, আজ আমি সব ঠিক করে এসেছি। দরখাস্তে আবার দুটো ভুল পাওয়া গিয়েছিল, তা ঠিক করে দিয়েছি।"

একজন মাস্টার বিরক্তভরে বললেন, "আগেও তো তোমার দরখাস্তে ভুল ছিল। ঐ নকলনবিসটা বারবার ভুল করছে কেন? চোট্টা কোথাকার!"

ল্যাংড়া বলল, "গালাগাল দিয়ো না বাবু। এ ধর্মযুদ্ধ, গালি-গালাজের কাজ নয়। নকলনবিস বেচারা কী করবে, কলম-ওয়ালাদের জাতই এই রকম।"

"তা হলে নকলটা কবে পর্যন্ত পাওয়া যাবে?"

"এখন পেয়েই গেছি মনে করো। এই পনেরো-কুড়ি দিন। ফাইল সদরে গেছে, এখন দরখাস্তটাও সদরে যাবে। নকল ওখানেই তৈরি হবে, তারপর ওখান থেকে ফেরত আসবে, তারপর রেজিস্টারে উঠবে···।"

ল্যাংড়া নকল নেবার পরিকল্পনা শোনাচ্ছিল। সে জানতেও পারে নি যে, মাস্টাররা কখন চলে গেছেন। যখন সে মাথাটা ওঠাল তখন চারপাশে সে-ই চিরপরিচিত কুকুর, শুওর আর আবর্জনার স্তূপ দেখতে পেল। এতক্ষণ এদেরই কাছে সে দপ্তরের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ চালাবার কথা বলছিল।

সন্ধ্যা সমাসন্ন। একটা বাছুর অত্যন্ত উগ্রভাবে শিং নেড়ে,

একসঙ্গে চার পা উঁচিয়ে লাফাতে লাফাতে চবুতরার পাশ দিয়ে চলে গেল। খানিকক্ষণ দৌড়ুতে থাকল, তারপর সামনে এক সবুজ গমের ক্ষেতে গিয়ে থেমে পড়ল। ল্যাংড়া হাতজোড় করে বলল, "ধন্য তুমি দারোগাসাহেব।"

এগারো

তহসিলের সদর দপ্তর হওয়া সত্ত্বেও শিবপালগঞ্জ এত বড়ো গ্রাম নয় যে, টাউন এরিয়ার অধিকার পেতে পারে। শিবপালগঞ্জে একটা গ্রামসভা আছে, গ্রামের লোকেরা সেটাকে গ্রামসভা হিসাবেই রাখতে চায়, যাতে তাদের টাউন এরিয়ার ট্যাক্স দিতে না হয়।

এই গ্রামসভার প্রধান রামাধীন ভিখমখেড়বীর ভাই। তাঁর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য, এত বছর প্রধান থেকেও তিনি পাগলাগারদে যান নি। জেলখানাতেও না। গ্রামে তিনি তাঁর নির্বুদ্ধিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং সেই কারণে প্রধান হবার আগে পর্যন্ত সকলের প্রিয় ছিলেন। বাইরে থেকে কোনো অফিসার এলে গ্রামের লোকেরা তাঁকে একরকম তস্তরির ওপর রেখে তাঁর সামনে হাজির করে। কখনও কখনও বলে, "সাহেব, শহরে বাছাই করা যে-সব লোক তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে যায় তাদের তো তোমরা হাজার বার দেখেছ, এখন একবার এখানকার জিনিসও দেখে যাও।"

গ্রামসভার নির্বাচন জানুয়ারি মাসে হবার কথা ছিল, আর এটা নভেম্বর মাস। সমস্যা দেখা দিয়েছে, কাকে প্রধান করা হবে। আগের সব নির্বাচনে বৈদ্যজী কোনো আগ্রহ দেখান নি, কারণ গ্রামসভার কাজকে তিনি ছোটো কাজ মনে করতেন। একদিক দিয়ে সত্যিই ছোটো কাজ, কারণ গ্রামসভার অফিসারদের সংগতি অত্যন্ত কম। তাঁদের কাছে না থাকে পুলিশের ডাণ্ডা, না থাকে তহসিল-দারের মর্যাদা, আর রোজ রোজ তাঁদের কাছে নিজের কাজের হিসেব দিতে লোকের সম্মান নষ্ট হয়। প্রধানকে গ্রামসভার জোত-জমি নিয়ে মকদ্দমা করতে হয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে শহরের এজলাসে উকিল আর হাকিমদের এমন সম্পর্ক নেই যে, এক চোর আর-এক চোরকে সমর্থন করবে। মকদ্দমায় সারা দুনিয়ার শত্রুতা ঘাড়ে এসে পড়ে আর বিপদের সময় পুলিসওয়ালারা শুধু মুচকি হাসে, কখনও কখনও সাদামাটাভাবে "পরধানজী" বলে থানার বাইরের ভূগোল বোঝাতে আরম্ভ করে।

কিন্তু কিছুদিন যাবৎ গ্রামসভার ওপর বৈদ্যজীর আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। একটা খবরের কাগজে প্রধানমন্ত্রীর একটা বক্তৃতা পড়ার পরই তাঁর এই আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ঐ বক্তৃতায় বলেছেন, স্কুল, সমবায় সমিতি আর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্যেই গ্রামের উন্নতি হতে পারে। এটা পড়ার পর বৈদ্যজীর হঠাৎ মনে হ'ল, এতদিন তিনি কেবল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন আর কলেজের সাহায্যেই গ্রামের উন্নতি করে যাচ্ছেন, গ্রাম পঞ্চায়েত তো তাঁর হাতে নেই! তিনি হয়তো ভাবলেন, "ও, তাই শিবপাল-গঞ্জের ঠিকমতো উন্নতি হচ্ছে না। তাই তো বলি, কী ব্যাপার?"

আগ্রহ সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটা কথা মনে হ'ল:

রামধীনের ভাই গ্রামসভার ক্ষতি করেছে। গ্রামের পতিত জমিগুলো লোকেরা ইচ্ছেমতো দখল করে নিয়েছে, আর নিশ্চয় প্রধান ঘুষ নিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকা নেই, নিশ্চয় প্রধান চুরি করেছে। গ্রামের মধ্যে অনেক ময়লা জমেছে, প্রধান নিশ্চয় শুওরের বাচ্চা। থানাওয়ালারা প্রধানের অভিযোগমতো কয়েকজনকে চালান করে দিয়েছে, এতে বোঝা যাচ্ছে, সে এখন পুলিশের দালালও হয়ে গেছে। প্রধান বন্দুকের লাইসেন্স পেয়েছে, নিশ্চয় সে ডাকাতি করতে যায়। গতবছর গ্রামে বজরঙ্গী খুন হয়েছিল, এখন বোঝো, কেন হয়েছিল।

যারা ভাং খায় তাদের কাছে ভাং পেষা একটা শিল্প, একটা কবিতা, একটা মহৎ কাজ, একটা কৃতিত্ব, একটা উৎসব। এমনিতে তো টাকা খানেকের পাতা চিবিয়ে কিছুটা জল খেয়ে নিলে ভালো নেশা হয়, কিন্তু এই নেশা শস্তা নেশা। আদর্শ নেশা হচ্ছে, পাতার সঙ্গে বাদাম, পেস্তা, গুলকন্দ, দুধ-মালাই ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরি ভাঙের নেশা। ভাং এমনভাবে পিষতে হবে, যাতে শিল আর নোড়া এঁটে এক হয়ে যাবে। খাবার আগে শঙ্কর ভগবানের প্রশস্তিতে ছন্দ আওড়াতে হবে এবং পুরো ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত না রেখে তাকে সামগ্রিক রূপ দিতে হবে।

শনিচরের কাজ বৈদ্যজীর বৈঠকখানায় ভাঙের এই সামাজিক দিকটা সামলানো। রোজকার মতো আজও সে এখন ভাং বাঁটছিল, হঠাৎ ডাক শুনতে পেল, "শনিচর!"

শনিচর সাপের মতো একটা শব্দ করে মাথা উঁচু করল। বৈদ্যজী বললেন, "ভাং বাঁটার কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে ঘরে এসো।"

যেন কেউ তাকে মিনিস্টারিতে ইস্তফা দিতে বলল। শনিচর আপন মনে বলতে লাগল, "কাকে দেব? এ কাজ করার মতো কেউ আছে নাকি? আজকালকার ছেলেরা এ-সব কাজের কী জানে? হলুদ-লঙ্কার মতো বেঁটে রেখে দেবে।"

শেষপর্যন্ত সে একটা ছেলের ওপর শিলনোড়ার চার্জ দিয়ে, হাত ধুয়ে আণ্ডারওয়্যারের পেছনে হাত মুছে বৈদ্যজীর সামনে এসে দাঁড়াল।

চৌকির ওপর বৈদ্যজী, রঙ্গনাথ, বদ্রী পালোয়ান আর প্রিন্সিপালসাহেব বসে আছেন। প্রিন্সিপাল এক কোণে একটু সরে বললেন, "বসুন শনিচরজী।"

কথাটা শনিচরকে সতর্ক করে দিল। ফলে হ'ল কি, শনিচর তার ভাঙা দাঁত বার করে বুকের লোমগুলো চুলকোতে শুরু করে দিল। তাকে বোকার মতো দেখাচ্ছে, কারণ সে জানে, কীভাবে চালাকির হামলার মোকাবিলা করতে হয়। সে বলল, "আরে প্রিন্সিপালসাহেব, এখন আপনার সঙ্গে বসিয়ে আমাকে নরকে পাঠাবেন না।"

বদ্রী পালোয়ান হাসলেন। বললেন, "শ্ শালা, গেঁয়োমি ঝাড়ছ? প্রিন্সিপালসাহেবের সঙ্গে বসলে নরকে চলে যাবে?" তারপর স্বর বদলে বললেন, "বসে পড়ো ওখানে।"

বৈদ্যজী শাশ্বত সত্য বলার ভঙ্গিতে বললেন, "এ রকম করে বোলো না বদ্রী। মঙ্গলদাসজী কী হতে যাচ্ছেন তা কি তুমি জানো?"

বহু বছর পরে শনিচর তার আসল নামটা শুনল। সে বসল। ভারিক্কি চালে বলল, "পালোয়ানকে বেশি বোকো না মহারাজ, এখন ওঁর বয়েসই বা কত! সময় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বৈদ্যজী বললেন, "তা হলে প্রিন্সিপালসাহেব, বলে ফেলো কী বলার আছে।"

প্রিন্সিপালসাহেব প্রথমে অবধী ভাষায় বলতে শুরু করলেন, "বলার কী আছে! আপনারা তো সবই জানেন।" তারপর নিজের খড়ী বুলি ধরলেন, "গ্রামসভার নির্বাচন হচ্ছে, এখানকার প্রধান একজন বয়স্ক লোক হয়ে থাকে। সে কলেজ কমিটির মেম্বারও হয়। একদিক দিয়ে সে আমারও অফিসার।"

হঠাৎ বৈদ্যজী বললেন, "শোনো মঙ্গলদাস, এবার তোমাকে আমরা গ্রামসভার প্রধান বানাতে চাই।"

শনিচরের মুখের ভাব বদলে গেল। সে হাতজোড় করল। কোনো গোপন রোগে আক্রান্ত উপেক্ষিত কর্মকর্তার কাছে কোনো মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হবার পরোয়ানা এলে তার কেমন অবস্থা হয়? শনিচরেরও তা-ই হ'ল। নিজেকে সংযত করে সে বলল, "না মহারাজ, আমার মতো অযোগ্য লোককে আপনারা এ কাজের যোগ্য মনে করেছেন, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি এই সম্মানের উপযুক্ত নই।"

প্রিন্সিপাল বলতে শুরু করলেন, "কোনো রামা-শ্যামা থোড়াই প্রধান হতে পারে! খুব বড়ো পদ। পুরো গ্রামের সম্পত্তির মালিক। ইচ্ছে করলে একদিনে লক্ষ লোকের মামলা নিষ্পত্তি করতে পারে। মোকামী হাকিম। ইচ্ছে করলে সারা গ্রামের লোককে 107 নম্বরে চালান করে আটকে রাখতে পারে। বড়ো বড়ো অফিসাররা তার বাড়িতে এসে বসে। যার চুকলি খাবে তার বসা মুশকিল। কাগজের ওপর একটুখানি সীলমোহর মেরে দিল আর যখন ইচ্ছে তেল-চিনি বার করে নিল। তার হুকুম ছাড়া

গ্রামের কেউ নিজের আবর্জনাস্তূপে ময়লা পর্যন্ত ফেলতে পারে না। সবাই তার পরামর্শমতো চলে। সবার চাবি তার কাছে। সব বেওয়ারিস জিনিসের সে-ই ওয়ারিস। কী বুঝলে শনিচর?"

শনিচর বিনয়সহকারে হাত জোড় করল। তারপর শুধু বলল, "আমি কী করব? সারা তুনিয়া বলবে যে, আপনারা থাকতে শিবপালগঞ্জে এক নিষ্কর্মাকে...।"

প্রিন্সিপাল হেঁ হেঁ করে অবধী ভাষায় বললেন, "আবার আপনি যা-তা বলতে আরম্ভ করেছেন শনিচরজী! আমাদের ওদিকে রাজপুর গ্রামসভায় সেখানকার বাবুসাহেব তাঁর এক হালচাষীকে প্রধান বানিয়েছেন। কোনো বড়ো মানুষ নিজে কোথায় এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আসে...।"

প্রিন্সিপালসাহেব কোনোরকম কুণ্ঠা না করেই বলতে লাগলেন, "আর ম্যানেজারসাহেব, ঐ হালচাষী সভাপতি হয়ে বেশ জমিয়ে নিল। গল্প শোনা যায়, একবার তহসিলে এক জলসা হয়েছিল। ডেপুটিসাহেব এসেছিলেন। সব প্রধান বসে ছিলেন। মাটিতে শতরঞ্চি পেতে তাঁদের বসতে দেওয়া হয়েছিল। ডেপুটিসাহেব বসেছিলেন চেয়ারে। এতে ঐ হালচাষী বলল, "এ কোথাকার ন্যায়বিচার! আমাদের নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে ফরাসের ওপর বসতে দিয়েছে আর ডেপুটিসাহেব নিজে চেয়ারে বসেছেন।"—ডেপুটিসাহেব ছেলেমানুষ। লেগে গেলেন। তারপর তুপক্ষের মধ্যে মর্যাদার লড়াই বেধে গেল। প্রধানরা সবাই হালচাষীর পক্ষ নিলেন। "ইনক্লাব-জিন্দাবাদ" ধ্বনি শুরু হয়ে গেল। ডেপুটি-সাহেব ওখানেই চেয়ারে বসে "শান্তি শান্তি" বলে চিৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু কোথায় শান্তি আর কোথায় শকুন্তলা! প্রধানরা

সভায় বসতে অস্বীকার করলেন আর রাজপুরের হালচাষী তহসিলি ক্ষেত্রের নেতা হয়ে বসল। পরের দিন তিন পার্টিই আর্জি পাঠাল, আমাদের মেম্বর হও। কিন্তু বাবুসাহেব নিষেধ করে দিলেন, "খবরদার, এখন কিছু না। আমি যখন যে পার্টির কথা বলব তখন সেই পার্টির মেম্বার হোয়ো।"

শনিচরের কানে "ইনক্লাব-জিন্দাবাদ' ধ্বনি লেগে গেল। সে কল্পনেত্রে দেখতে পেল, প্রায় উলঙ্গ, আণ্ডারওয়্যারধারী একটা লোকের পেছনে একশো দুশো লোক হাত তুলে তুলে চিৎকার করছে।

বৈদ্যজী বললেন, "ওটা অভদ্রতা হয়েছে। আমি প্রধান হলে উঠে চলে যেতাম। তারপর দু মাস বাদে আমার নিজের গ্রামে উৎসব করতাম। ডেপুটিসাহেবকেও নেমন্তন্ন করতাম। তাঁকে ফরাসের ওপর বসতে দিতাম আর আমি নিজে চেয়ারের ওপর বসে বক্তৃতা দিয়ে বলতাম: 'বন্ধুগণ, চেয়ারে বসতে আমার সত্যিই কষ্ট হয়, কিন্তু অতিথিসৎকারের এই নিয়ম ডেপুটিসাহেব আমাদের অমুক তারিখে তহসিলে ডেকে নিয়ে গিয়ে শিখিয়েছেন। সুতরাং তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী আজ আমাকে এই অসুবিধা মেনে নিতে হচ্ছে।' "

এ কথা বলে বৈদ্যজী আত্মতুষ্টিতে হো হো করে হাসলেন। রঙ্গনাথের সমর্থন পাবার জন্য বললেন, "কী বাবা, এটাই উচিত হ'ত না?"

রঙ্গনাথ বলল, "ঠিকই হ'ত। আমিও এই রীতি শেয়াল আর সারসপাখির গল্পে শুনেছি।"

বৈদ্যজী শনিচরকে বললেন, "তা হলে ঠিক আছে। এখন যাও। দেখো, সত্যিসত্যিই বোকাটা হলুদ-লঙ্কার মতো ভাং বাঁটল কিনা। যাও, তোমার হাত না লাগলে রঙই হয় না।"

বদ্রীপালোয়ান মুচকি হেসে দরজা থেকে বললেন, "যাও শালা, আবার ঐ ভাং ঘোঁটো।"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর প্রিন্সিপাল আস্তে করে বললেন, "আজ্ঞা হলে খান্নামাস্টার সম্বন্ধে একটা কথা বলি।"

বৈদ্যজী ভুরু তুললেন। আজ্ঞা মিলে গেল। প্রিন্সিপাল বললেন, "একটা ঘটনা ঘটেছে। পরশু সন্ধ্যার সময় গয়াদীনের উঠোনে একটা ঢিলের মতো পড়েছিল। গয়াদীন তখন পায়খানা করতে বাইরে গিয়েছিল। বেলার পিসি ঐ ঢিলটাকে দেখে তোলে। ওটা একটা গুটি পাকানো খাম ছিল। পিসি বেলার হাতে ওটা দিয়ে পড়তে বলল, কিন্তু বেলা তা পড়তে পারল না।..."

রঙ্গনাথ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। জিজ্ঞাসা করল, "ইংরেজীতে লেখা ছিল নাকি?"

"ইংরেজীতে কী লিখবে? হিন্দীতেই লেখা ছিল, কিন্তু কুমারী মেয়ে তা পড়বে কেমন করে? ওটা একটা প্রেমপত্র ছিল।"

বৈদ্যজী চুপচাপ শুনছেন। রঙ্গনাথের সাহস হ'ল না, জিজ্ঞাসা করে, কে লিখেছে।

প্রিন্সিপাল বললেন, "কে জানে, কে লিখেছে। আমার তো মনে হয়, এ কাজ খান্না মাস্টারের দলেরই কারো। গুণ্ডা, শালা একেবারে গুণ্ডা। কিন্তু খান্না মাস্টার আপনার বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে। বলছে, ঐ চিঠি রুপ্পনবাবু পাঠিয়েছে। এখন সে আপনার বংশে কলঙ্ক দিতে চাইছে।"

বৈদ্যজী এতে বিচলিত হলেন মনে হ'ল না। তিনি শুধু একমিনিট চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন, "আমার বংশে সে কলঙ্ক দেবে কেমন করে? কলঙ্ক তো দিচ্ছে গয়াদীনের বংশে। মেয়ে তো তাঁরই।"

বারো

কার্তিক পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শিবপালগঞ্জ থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে এক মেলা বসে। সেখানে জঙ্গল আছে, একটা টিলা আছে, তার ওপর এক দেবীমন্দির আছে, আর চারদিকে ছড়ানো আছে একটা ভাঙা পুরনো বাড়ির ইঁট। জঙ্গলে করমচা, টেপারি আর কুলের ঝাড় আছে, আর আছে উঁচুনিচু জমি। খরগোশ থেকে আরম্ভ করে ভেড়া পর্যন্ত, ভুট্টাচোর থেকে আরম্ভ করে ডাকাত পর্যন্ত সবাই এই জঙ্গলে অনায়াসে লুকিয়ে থাকে। পাশের গ্রামগুলোতে যে প্রেম-সম্বন্ধ আত্মার স্তরে কায়েম হয় তার প্রকাশ এই জঙ্গলে দেহের স্তরে হয়। শহর থেকেও কখনও কখনও পিকনিক করার জন্য এখানে জোড়ায় জোড়ায় ঘুরতে আসে আর একে অপরকে নিজের ক্রিয়াত্মক জ্ঞান দেখিয়ে এবং কখনও কখনও সম্ভব হলে মন্দির দর্শন করে সংকুচিত দেহ আর বিকশিত মন নিয়ে ফিরে যায়।

এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে এই টিলাটা একটা গর্ব, কারণ এটা তাদের অজন্তা, ইলোরা, খাজুরাহো আর মহাবলিপুরম। তাদের বিশ্বাস, দেবাসুর সংগ্রামের পর দেবীর থাকার জন্য দেবতারা নিজেদের হাতে এই মন্দির বানিয়েছিল। টিলা সম্বন্ধে তারা বলে, ওর নিচে

প্রচুর ধনদৌলত পোঁতা আছে। এইভাবে অর্থ, ধর্ম আর ইতিহাসের দিক দিয়ে এই টিলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রঙ্গনাথের ইতিহাস আর পুরাতত্ত্ব জানা আছে বলে তার বড়ো ইচ্ছে, সে টিলাটা পর্যবেক্ষণ করে। সে শুনেছে, এখানকার মূর্তিগুলো গুপ্তযুগের আর মাটির অনেক ভাঙা পাত্র, যাকে টেরাকোটা বলে, তা মৌর্যযুগের।

স্ত্রীলোকদের আগেপিছে শিশুরা আর পুরুষরা রয়েছে। সবাই ধুলোর ঝড় তুলে জোরে জোরে এগিয়ে চলেছে। গোরুর গাড়িগুলো আশ্চর্য উপায়ে রাস্তা বার করে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছে। যারা হেঁটে চলেছে তারা আরও আশ্চর্যভাবে গাড়িগুলোর আঘাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলছে আর প্রমাণ করছে যে, শহরের চৌরাস্তার ওপর মোটরগুলো যে এদিক-ওদিক থেকে ধাক্কাধাক্কি করে চূর্ণবিচূর্ণ হয় না সেটা পুলিসের কৃতিত্ব নয়, মানুষের আত্মরক্ষার ইচ্ছা। অর্থাৎ যে প্রবৃত্তি জঙ্গলে পুলিসের সাহায্য ছাড়াই খরগোশকে ভয়ংকর জন্তুদের কবল থেকে রক্ষা করে, অথবা শহরে পায়ে-চলা মানুষদের ট্রাক-ড্রাইভারদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে সেই প্রবৃত্তিই এই যারা এখানে মেলা দেখতে এসেছে তাদের গোরুরগাড়ির আঘাত থেকে রক্ষা করছে।

মেলার উত্তেজনা খুব প্রবল। অল ইণ্ডিয়া রেডিও যদি এ-সম্বন্ধে একটা রানিং কমেণ্টরি দিত তা হলে এটা নিশ্চয় প্রমাণ হয়ে যেত যে, পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার দরুন মানুষ খুব সুখেস্বচ্ছন্দে আছে, আর গানবাজনা করতে করতে, পরস্পরের ওপর ভালোবাসা আর আনন্দের বর্ষা করতে করতে তারা মেলা দেখতে যাচ্ছে।

যা-ই হোক, রঙ্গনাথ এ গ্রামে এসেছে প্রায় দেড় মাস হয়ে গেছে।

সে এতটুকু বুঝে ফেলেছে যে, বেনিয়ান আর আণ্ডারওয়্যার পরা শনিচরকে কেবল হাসির বৈশিষ্ট্যের জন্যই বিড়লা আর ডালমিয়ার চেয়ে বড়ো বলা যায় না, কারণ হাসা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। যারই হজমশক্তি ঠিক আছে, হাসার জন্য তাকেই চাকর রাখা যায়। গানের ব্যাপারেও এই এক কথা।

রঙ্গনাথ মন দিয়ে মেলা দেখতে শুরু করল, আর দেখতেই তার উৎসাহ-উদ্দীপনার বাঁধ ভেঙে গেল। শীত পড়েছে কিন্তু কারও গায়ে সে গরম কোট দেখতে পেল না। কয়েকটা বাচ্চা ছেলের গায়ে অবশ্য এক-আধখানা ছেঁড়াফাটা সোয়েটার আছে। স্ত্রীলোকেরা রঙিন আর শস্তা সিল্কের শাড়ি পরেছে, তবে তাদের প্রায় সবারই পা খালি। পুরুষদের তো কথাই নেই: হিন্দুস্থানী পোলা, আধা ধলা আধা কালা।

এ-সব দেখা আর বোঝবার চেয়ে পুরাতত্ত্ব পড়া অনেক ভালো—রঙ্গনাথ নিজেই নিজেকে রাগাতে রাগাতে ভাবল। তারপর রুপ্পনবাবুর দিকে ঘুরে তাকাল।

রুপ্পনবাবু হৈ-হল্লা করে তিনজন সাইকেল-আরোহীকে নিচে নামিয়ে নিয়েছেন। তারা ভিড় এড়িয়ে সরু পথের ধারে সাইকেল-গুলো দাঁড় করিয়ে নিজেরাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। একজন, যাকে এই তিনজনের সর্দার বলে মনে হচ্ছে, মাথা থেকে বিশ্রী রঙের একটা হ্যাট খুলে মুখে হাওয়া করতে লাগল। ঠাণ্ডা পড়েছে, তবু তার মাথায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। তার পরনে হাফপ্যাণ্ট, শার্ট আর গলা-খোলা কোট। হাফপ্যাণ্টটা যাতে ভুঁড়ি থেকে হড়কে না যায় তারজন্য বেল্ট দিয়ে বেশ করে বাঁধা, এবং ভুঁড়িটা প্রায় সমান সমান তুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। সর্দারের তুই সঙ্গীর

পরনে ধুতি, জামা আর টুপি। তাদের চেহারা অসভ্যের মতো হলেও সর্দারের সঙ্গে বেশ সভ্যভাবেই কথা বলছে।

"আজ তো মেলায় চারদিকে কেবল টাকা আর টাকা, তাই না সাহেব!"—রুপ্পনবাবু হেসে ঐ লোকটাকে প্রলুব্ধ করলেন।

লোকটা চোখ বুজে, মাথা নেড়ে সমঝদারের ভঙ্গিতে জবাব দিল, "হুঁ, কিন্তু এখন টাকার কোনো ভ্যালু নেই রুপ্পনবাবু!"

রুপ্পনবাবু লোকটার সঙ্গে আরও কী সব কথা বললেন। সে-সব কথা মিঠাই আর বিশেষ করে খোয়া নিয়ে। হঠাৎ লোকটা রুপ্পনবাবুর কথা শোনা বন্ধ করে দিল। বলল, "দাঁড়ান, রুপ্পনবাবু।" তারপর সাইকেলটা তার একজন সঙ্গীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে হ্যাটটা আর-একজন সঙ্গীর হাতে দিয়ে মোটা মোটা পা দুটো সোজা-বাঁকা করে ফেলে চলতে চলতে পাশের অড়হর ক্ষেতের কাছে পৌঁছে গেল। ক্ষেতের মাঝে যে পাক্‌দণ্ডী আছে তার ওপর দিয়ে লোক আসা-যাওয়া করছে এবং অড়হরগাছগুলো খুব ঘন নয় এ কথা চিন্তা না করেই সে দৌড়নোর চেষ্টা করে আটকে গেল। অনেক কষ্ট করে কোট আর শার্টের বোতাম খুলে ভেতর থেকে পৈতেটা ধরে টানল। কিন্তু খুব বেশি বার হ'ল না। যেটুকু বার হ'ল তাতেই সে একদিকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে কোনো রকমে তার এক অংশ কানে জড়িয়ে নিল। তারপর কষে বাঁধা হাফপ্যাণ্টের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কোনো রকমে হাঁটুর ওপর ঝুঁকে অড়হরের ক্ষেতে জলধারা নামিয়ে দিল।

রঙ্গনাথ ততক্ষণে জেনে নিয়েছে যে, হ্যাট-পরা লোকটার নাম "সিংহ সাহেব"। তিনি এই এলাকার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। তাঁর সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা জেলা বোর্ডের

মেম্বার আর হ্যাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে ঐ বোর্ডেরই ট্যাক্স-কালেক্টর।

ইন্সপেক্টর সাহেব ফিরে এলে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হ'ল। তবে এবার আলোচনার বিষয় মিঠাই ছিল না, ছিল জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, ইন্সপেক্টরসাহেবের রিটায়ারমেণ্ট আর "খুব খারাপ দিনকাল পড়েছে"।

যোগনাথের ওপর পুলিসের দৃষ্টি পড়েছে, এবং হয়তো তা আটকে আছে। এখানে অপরাধীদের ওপর পুলিসের দৃষ্টি প্রায় প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেমে পড়ার মতো পড়ে যায়। কোথাও ডাকাত পড়লে দশ দিন পর্যন্ত ডাকাতদের সম্বন্ধে সবকিছু চাপাচাপি থাকে তারপর এগারোদিনের দিন হঠাৎ কাউকে, ধরে এনে তাকে চিত করে শুইয়ে তার মুখের ওপর "ডাকাত" শব্দটা প্রথম চুম্বনের মতো দেগে দেওয়া হয়। কিন্তু যোগনাথকে লোকে বৈদ্যজীর লোক হিসেবে জানে বলে গয়াদীনের বাড়ির চুরির ব্যাপারে পুলিস তার ওপর এই রীতি প্রয়োগ করে নি। বরং তারা যোগনাথের আশেপাশে এমনভাবে ঘোরাফেরা করছে, যেন আমাদের সিনেমার অবিবাহিত হিরো তার প্রতিবেশীর মেয়েকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। অর্থাৎ রীতিটা না বলাৎকারের, না প্রথম দৃষ্টিতে প্রেমে পড়ার—বরং অনেক হুঁশিয়ারিতে হৃদয় পরিবর্তনের মাধ্যমে অপরাধীকে দিয়ে "হ্যাঁ" বলিয়ে নিয়ে তার হাতের কব্জিটা চেপে ধরার।

মেলায় আজ যোগনাথ রুপ্পনবাবুর সঙ্গে এইজন্যই এসেছে। তার ভয় ছিল, একা থাকলে পুলিস তাকে হয়রান করতে আরম্ভ

করবে, আর এমন না হয়, তার প্রেমে পড়ে তাকে একেবারে ঝাপটে ধরে।

তারা সকলে মেলা দেখার জন্য বেরিয়েছে। রুপ্পনবাবু জামার কলারের নিচে একেবারে নতুন একটা রেশমী রুমাল বেঁধেছেন, আর কেবল সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য চোখে পরেছেন কালো চশমা। শনিচর তার আণ্ডারওয়্যারের ওপর বাড়িতে তৈরি সুতোর জালিদার বেনিয়ান পরেছে। বেনিয়ানটা আণ্ডারওয়্যার পর্যন্ত পৌঁছুনোর দেড় ইঞ্চি আগেই শেষ হয়ে গেছে। ছোটে পালোয়ান আজ তাঁর ল্যাঙটের পট্টিটাকে হাতির শুঁড়ের মতো নিচে ঝুলতে দেন নি, পেছনে নিয়ে গিয়ে এমন শক্ত করে বেঁধেছেন যে ল্যাঙটটা ছিঁড়ে ফেঁসো হয়ে গেলেও তা পেছনে লেজের মতো লেগে থাকবে। শুধু তা-ই নয়, আজ তিনি বেনিয়ান ছাড়াই একটা স্বচ্ছ জামা গায়ে দিয়েছেন আর স্বচ্ছ মার্কিন কাপড়ের একটা গামছা লুঙ্গির মতো করে পরেছেন।

যোগনাথ রুপ্পনবাবুর গা সেঁটে চলছে। যোগনাথ রোগাপাতলা একটা ছেলে।

গ্রামে যেদিন চোর এসেছিল সেদিন থেকে লোকে যোগনাথকে একটু অন্যভাবে দেখতে শুরু করেছে। গয়াদীনের ওখানে চুরি হবার পর যোগনাথের মনে হতে লাগল যে, সে আগের থেকে বেশি সম্মান পাচ্ছে। আমবাগানে, যেখানে রাখালেরা কড়ি দিয়ে জুয়া খেলে, যোগনাথ সেখানে পৌঁছুলেই তারা দৃষ্টি এড়িয়ে পয়সা-গুলো আগে গাঁটে গুঁজে রেখে তারপর তাকে বসতে বলে। বাবু রামাধীনের বাড়িতে ভাংপার্টির মাঝে যোগনাথের পিঠে না-জানি কত স্নেহভরা হাত পড়তে শুরু করে।

ফ্লাশ খেলায় শিবপালগঞ্জে যোগনাথের জুড়ি আর কেউ নেই।

একবার কেবল পেয়ারের ওপর সে খান্না মাস্টারের ট্রেল ফেলে দিয়েছিল। সেদিন থেকে যোগনাথের প্রভাব এমন বেড়ে গেল যে, তার হাতে তিন তাস আসতেই ভালো ভালো খেলোয়াড়রা নিজেদের তাস দেখতে ভুলে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে প্রথম দান চালতেই অর্ধেকের বেশি খেলোয়াড় ঘাবড়ে গিয়ে তাদের তাস ফেলে দেয়। গল্পে আছে, রাণা প্রতাপের ঘোড়া চৈতক মুঘল সৈন্যদের যেখানেই যেত সেখানেই চারদিকে ভিড় সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দিত, মুঘল সেনারা পড়ি কি মরি করে অসম্ভব দ্রুতবেগে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করত। যোগনাথের দানেরও ঐ একই অবস্থা। যে-ই দান দেয় অমনি যেন ছোটাছুটি পড়ে যায়। কিন্তু গয়াদীনের ওখানে চুরি হয়ে যাবার পর ব্যাপার-স্যাপার অন্যরকম হয়ে গেল। লোকে যোগনাথকে দেখে ফ্লাশের খারাপ গুণগুলোর কথা বলতে আরম্ভ করে। যে-সব জুয়াড়ী আগে তাকে দেখলেই হিরোর মতো অভ্যর্থনা জানাত, খাওয়া-দাওয়া ভুলে গিয়ে তার সঙ্গে খেলতে থাকত, এখন তাদের হঠাৎ হঠাৎ বাজার যাবার, ঘাস কাটার অথবা মোষ দোয়ার কথা মনে পড়ে যায়।

যোগনাথের পক্ষে এটা কষ্টের কথা। ওদিকে কিছুদিন হ'ল দারোগাবাবু তাকে থানায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে সে রুপ্পন-বাবুকেও নিয়ে গিয়েছিল। দারোগাবাবু বলেছিলেন, "রুপ্পনবাবু, জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।" তিনি গম্ভীরভাবে বোঝাতে আরম্ভ করেছিলেন, "গয়াদীনের বাড়ির চুরির ব্যাপারে কিছুই হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনারা সহযোগিতা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু হদিস পাওয়া মুশকিল।..."

রুপ্পনবাবু বলেছিলেন, "আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা আছে। বিশ্বাস না হয় তো কলেজের যে-কোনো স্টুডেণ্টকে গ্রেপ্তার করে দেখে নিন।"

দারোগাবাবু কিছুক্ষণ এমনিই পায়চারি করেছিলেন, তার পর বলেছিলেন, "এই ব্যাপারে বিলিতি নিয়মই সবচেয়ে ভালো। শতকরা আশিভাগ অপরাধী নিজে থেকেই অপরাধ স্বীকার করে। আমাদের এখানে তো...।" এটুকু বলেই দারোগাবাবু থেমে পড়েছিলেন, একদৃষ্টে যোগনাথকে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। যোগনাথও ফ্লাশ খেলায় ব্লাফ লাগানোর অভ্যস্ত দৃষ্টিতে দারোগাবাবুর দিকে তাকিয়ে ছিল।

জবাব দিয়েছিলেন রুপ্পনবাবু। বলেছিলেন, "বিলিতি কায়দা এখানে চালাবেন না। শতকরা আশিভাগ লোক যদি তাদের অপরাধ স্বীকার করতে আরম্ভ করে তা হলে কাল আপনার থানায় দশজন সেপাইয়ের মধ্যে ডিউটি দিতে কেবল দুজন থাকবে। বাকি সবাইকে হাজতে যেতে হবে।"

শেষপর্যন্ত আসল কথাটা হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই ডুবে গিয়েছিল। যোগনাথকে দারোগাবাবু কেন ডেকেছিলেন তা পরিষ্কার হতে পারে নি।

রুপ্পনবাবু আজ সেই কথারই জের টেনে ভারিক্কি চালে বললেন, "এই যোগনাথ, মরা বাদুড়ের মতো মুখ ঝুলিয়ে হাঁটলে কী হবে? ফুর্তি করো। দারোগা তো আর হায়েনা নয়, তোমাকে থোড়াই খেয়ে ফেলবে।"

ছোটে পালোয়ান বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমাদের তো এক সোজা হিসাব আছে, এদিক থেকে আগুন খেলে ওদিক থেকে অঙ্গার

বেরুবে। যোগনাথ তো আর বৈদ্যজীর সঙ্গে পরামর্শ করে গয়াদীনের বাড়িতে লাফিয়ে পড়ে নি। তা হলে আর এখন তাঁর পেছনে লেগে আছ কেন ?"

যোগনাথ আপত্তি করে কিছু বলতে গেল, কিন্তু ততক্ষণে পেছন থেকে একটা গোরুর গাড়ি ঘর্‌ঘর্‌ করতে করতে চলে গেল। রঙ্গনাথ মুখের ধুলো মুছতে লাগল, ছোটে পালোয়ান এতটুকু চোখ পর্যন্ত বুজলেন না। গীতা শুনে যেভাবে অর্জুন আঠারো দিন কুরুক্ষেত্রের ধুলো খেয়েছিলেন, ছোটে পালোয়ানও তেমনি গোরুরগাড়ির সমস্তটা ধুলো খেয়ে ফেললেন। তারপর বিরক্ত না হয়েই বললেন, "সত্যি কথা আর গাধার লাথি সহ্য করতে পারে, এমন লোক খুব কমই পাওয়া যায়। যোগনাথের বিষয়ে লোকে যে কথা সারা গ্রামে ফিসফিস করে বলছে, আমি তা-ই হড়্‌ হড়্‌ করে বলে দিলাম। এর মধ্যে বিবাদ কিসের ?"

শনিচর শান্তি স্থাপন করতে চাইল। গ্রামসভার প্রধান হবার আশায় এখন থেকেই সে বৈদ্যজীর শাশ্বত সত্য বলার ভঙ্গি অভ্যাস করতে আরম্ভ করেছে। শনিচর বলল, "নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা ঠিক নয়। সারা পৃথিবী যোগনাথকে যা-ই বলুক-না কেন, আমরা ওকে একবার যখন ভালো বলেছি তো বলেই দিয়েছি। মরদের কথা এক কি দুই ?"

ছোটে পালোয়ান তাচ্ছিল্যভরে বললেন, "তা হলে তুমি একজন মরদ ?"

রাস্তায় ল্যাংড়ার সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়ে গেল। রঙ্গনাথ বলল, "এখানেও ও এসেছে !"

ল্যাংড়া একটা টেপারি ঝাড়ের তলায় গামছা পেতে বসে বিশ্রাম করছিল আর আপন মনে কী-সব বিড়্ বিড়্ করে বলছিল। শনিচর বলল, "ল্যাংড়ার আর কী! যেখানে ইচ্ছে নোঙর ফেলল। আয়েশী মানুষ।"

ছোটে পালোয়ানকে তাঁর বিখ্যাত খবরের কাগজী ভঙ্গিতে দেখা গেল, অর্থাৎ খবরের কাগজে তাঁর ছবি যদি ছাপা হত তা হলে তাঁর সত্যিকারের রূপটা পাঠকদের কাছে পৌঁছুত। অসীম সুখের উপলব্ধিতে তিনি নিচের ঠোঁটটা ছড়িয়ে দাঁত দিয়ে তা ঘষতে ঘষতে চোখ কুঁচকে উরুর ওপরের দিকটা প্রাণপণে চুলকোতে আরম্ভ করেছিলেন, হঠাৎ ল্যাংড়ার প্রসঙ্গে সেই উপলব্ধিতে বাধা পড়ায় তিনি খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "আয়েশী মানুষ? শালা শূলে চড়ে বসেছে। পরশু তহসিলদারের সঙ্গে তুই-তোকারি করে এসেছে। আয়েশ করবে কোথা থেকে?"

ল্যাংড়া কাছাকাছি আসতেই রুপ্পন জিজ্ঞাসা করলেন, "বলো ল্যাংড়া মাস্টার, কী খবর? নকল পেলে?"

ল্যাংড়া বিড়্‌বিড়্ করা বন্ধ করল। চোখের কাছে হাতটা এনে রোদ্দুর আড়াল দিয়ে রুপ্পনবাবুকে চিনল। তারপর বলল, "কোথায় পেলাম বাবু! এদিকে এই রাস্তায় নকলের দরখাস্তটা সদরের দপ্তরে পাঠানো হ'ল আর ওদিকে ঐ রাস্তায় ফাইলটা ওখান থেকে এখানে ফিরে এল। এখন আবার পনেরো দিনের মামলা।"

শনিচর বলল, "শুনলাম, তহসিলদারের সঙ্গে তোমার তুই-তোকারি করে কথা হয়ে গেছে!"

"কী কথা বাবু?"— ল্যাংড়ার ঠোঁটদুটো আবার কিছু বিড়্‌বিড়্

করে বলার জন্য কাঁপতে লাগল, "যেখানে আইনের কথা সেখানে তুই-তোকারি করে কী হবে?"

ছোটে পালোয়ান তাচ্ছিল্যভরে তার দিকে তাকালেন। শেষে ঝাড়ঝোপ আর গাছপালাগুলোকে শোনাবার জন্য বললেন, "কথার বাতাসা ভেঙে কী হবে? শালা গিয়ে নকলনবিসকে পাঁচটা টাকা ঠেকাচ্ছ না কেন?"

রঙ্গনাথ তাঁকে বোঝাল, "তুমি তা বুঝবে না ছোটে পালোয়ান! এটা নীতির কথা।"

ছোটে পালোয়ান তাঁর মজবুত কাঁধটার দিকে অকারণে একবার তাকিয়ে বললেন, "তা হলে মরো ঘুরে।"

তেরো

ছোটে পালোয়ান বললেন, "আমি দর্শন-টর্শন করব না। এখানে তো সবাই লাল ল্যাঙটওয়ালাদের গোলামি করে আর যত দেবদেবী আছে তাদের ভুসি মনে করে।"

কথা হচ্ছিল, আগে মন্দিরে দেবীদর্শন করা নিয়ে। ছোটের এ কথার কেউ জবাব দিল না। কেউ তাঁকে বোঝাবার চেষ্টাও করল না। সবাই জানে তাঁকে বোঝাবার মাত্র একটা উপায় আছে আর সেটা হচ্ছে, তাঁকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বুকের উপর

চড়ে হাড়পাঁজরগুলো ভেঙে দেওয়া। ওদিকে ছোটে তিনি যে নাস্তিক নন তা দেখানোর জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে উরুর ওপর ঢোলক বাজানোর মতো করে বাজাতে শুরু করে দিলেন। যখন তিনি বুঝলেন এতে তাঁর আস্তিকতা প্রমাণ হয় নি তখন গুন্‌গুন্‌ করে একটা গান গাইতে লাগলেন—

"বজরঙ্গবলী, মেরী নাও চলী, জরা বল্লী কৃপা কী লগা দেনা।"

সামনে একটা মিষ্টির দোকান দেখিয়ে তিনি বললেন, "আমি ওখানে গিয়ে ততক্ষণ পেটে কিছু পুরছি, তোমরা ওখানেই এসো।" তারপর যেন স্বগতোক্তি করলেন, "সকাল থেকে মুখে কিচ্ছু না দিয়ে ঘুরছি। পেটে শালা ঝাপটানি শুরু হয়ে গেছে।"

রঙ্গনাথকে কে যেন বলেছিল, মন্দিরটা সত্যযুগে তৈরি। তাই গোড়া থেকেই সে ভেবে আসছে, কোনো-না-কোনো শিলাখণ্ডে ব্রাহ্মীলিপি দেখতে পাবে। কিন্তু দূর থেকে মন্দিরটা দেখেই তার মনে হ'ল, এদেশের লোকেরা সময়ের ব্যাপারে মাত্র দুটো ঠিক কথা জানে। একটা আদি, আর-একটা অনন্ত। এ ছাড়া তারা প্রায় পঁচাত্তর বছরের পুরনো কোনো মন্দিরকে অনায়াসেই গুপ্তযুগ অথবা মৌর্যযুগে ঠেলে দিতে পারে।

মন্দিরের ওপরে কারুকার্যের মাঝখানে লেখা আছে—"মণ্ডপটা তৈরি করিয়েছেন মহিষাসুরমর্দিনীর ভক্ত ইকবালবাহাদুরসিংহ, যাঁর পিতা নরেন্দ্রবাহাদুরসিং তক্ত ভীখাপুর, সংবত 1950 বিক্রমাব্দের কার্তিক মাসের দশমী তিথিতে।" এটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গনাথের সমস্ত পুরাতত্ত্ব হাওয়ায় উড়ে গেল।

এ থেকে এ কথা মনে করা ঠিক হবে না যে, ভিখাপুরের তক্ত সিতারা অথবা পণা রাজেরা তক্তের মতো ছিল। অবধের লক্ষ লক্ষ

জমিদারের বাড়িতে এমন কত যে ভাঙাচোরা তক্ত পড়ে থাকত তার হিসেব নেই। জমিদাররা ঐ-সব তক্তে বসে হোলি কিংবা দশহরার দিনে তাঁদের প্রজা অর্থাৎ দু-একজন হালচাষীর সেলাম গ্রহণ করতেন। মন্দিরে যে টাকা খরচ হয় তা আন্দাজ করে রঙ্গনাথ বুঝে নিল যে, এই তক্তটিও ঐ লক্ষ লক্ষ তক্তের একটি। মন্দিরের ইমারতটাও ঐ তক্তেরই মতো। একটা কামরা, তাতে একটাই দরজা। ভেতরের দিককার দেওয়ালগুলোতে চারদিকেই ওয়ার্ডরোবের মতো বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতেই অনেক রকম দেবতাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দরজা দিয়ে ঢুকতেই সামনের ওয়ার্ডরোবে যে-সব মূর্তি চোখে পড়ল তার মধ্যে দেবীর প্রধান প্রতিমাও আছে। এটা সত্যি-সত্যিই একটা প্রাচীন মূর্তি।

যোগনাথ মন্দিরে ঢুকেই খুব তাড়াতাড়ি করে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল, যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের শব্দ শুনে সৈন্যরা যেমন শুয়ে পড়ে। তারপর হাতে ভর দিয়ে উঠে বসে অত্যন্ত ভাবালুভাবে একখানা ভজন গাইতে আরম্ভ করল। গানের কথা বোঝা যাচ্ছে না, তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, সে কাঁদছে না, গাইছে। যোগনাথের এই ভাবালুতা গাঁজার ছিলিম থেকে আসে নি, মদের গেলাস থেকেও না। এর পেছনে আছে শুধু পুলিসের ভয়। যা-ই হোক, যোগনাথের ভজন এত পরিষ্কার যে, দু-চারজন তাদের নিজেদের ভজন ভুলে গিয়ে কেবল তারই ভজন শুনতে আরম্ভ করে দিল।

শনিচরকেও গ্রামসভার প্রধান হতে হবে। সুতরাং সে-ও মন্দিরের মাঝামাঝি হাঁটু মুড়ে কোনোরকমে বসে পড়ল। তারপর "জগদম্বিকে, জগদম্বিকে" বলে স্লোগান দিতে লাগল। মন্দিরে

মেলার প্রচণ্ড ভিড়। কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু সে কেমন গাঁইয়া যে কোথাও গিয়ে সেখানকার লোকদের নিজের গেঁয়োমি না দেখায়! লোকেরা শনিচরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

ওদিকে রুপ্পনবাবুও চোখ বুজে হঠাৎ একটা বর চেয়ে আবার চোখ খুলে ফেললেন। এখান থেকেই তিনি মেলা দেখা শুরু করে দিলেন। তাঁর পাশেই একটি মেয়ে একটা মূর্তির সামনে ঝুঁকে পড়ে বিড়্ বিড়্ করে কী বলছে। রুপ্পনবাবুর মনে হ'ল এটাই আসল মেলা।

রঙ্গনাথ হাতজোড় করে সোজা আসল প্রতিমার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রতিমাটাকে সে দেখল, দেখতেই থাকল।···

প্রাচীন মূর্তিশিল্প সম্বন্ধে সে যা-কিছু পড়েছিল, সব নিরর্থক মনে হ'ল। রঙ্গনাথ ভাবল, এ-ই যদি দেবীমূর্তি হয় তা হলে আজ পর্যন্ত খাজুরাহোয়, ভুবনেশ্বরে অথবা ইলোরার কৈলাসমন্দিরে যে-সব মূর্তি সে দেখেছে সেগুলো কী?

একবার চোখ বুজে সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তার সমস্ত পড়াশোনা ভুলে যেতে চেষ্টা করল। মনে মনে সে চিৎকার করে উঠল, "বাঁচাও, বাঁচাও, আমার ভক্তির ওপর তর্কের হামলা হচ্ছে। বাঁচাও।"

কিন্তু যখন সে চোখ খুলল। তখন তার মনে হ'ল, তার সমস্ত ভক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, ইতিহাসের তোতাপাখির পড়া তাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিচ্ছে।

আসলে এই মূর্তিটার গড়ন কিছু নতুন রকমের। তার মাথায় সৈনিকের শিরস্ত্রাণ, গলার নিচে চওড়া সমান বুক। বুকের নিচের

অংশে কিছু নেই। যাঁরা ভক্তির টানে নয়, ইংরেজী ইতিহাস-লেখকদের বই পড়ে এই মন্দিরে আসেন তাঁরা অনায়াসে বলতে পারেন, "এই মূর্তির যতটুকু আমি দেখতে পেয়েছি তাতে আমি সহজেই প্রমাণ করতে পারি যে, এটা প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর কোনো সৈনিকের মূর্তি।"

আমাদের দেশের মূর্তিশিল্প সম্বন্ধে আর যা-ই কিছু বলা যাক-না কেন, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না যে, মূর্তিগুলোর লিঙ্গভেদে কোনো বিভ্রান্তি আছে। ছোটো করে চুল ছেঁটে, প্যান্টশার্ট পরে যে-সব নারী গল্‌ফের মাঠে যায় তাদের লিঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের সংশয় থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু প্রাচীন নারীমূর্তির ব্যাপারে তা সম্ভব নয়। পুরাতত্ত্বের ছাত্রদের গলার নিচেই উঁচু উঁচু দুটো পাহাড় দেখার অভ্যাস হয়ে যায়। আরও কিছুটা নিচে গেলেই পাহাড় উলটে অন্য দিকে পৌঁছে যায়। এ-সব বোঝার দিব্যদৃষ্টি অতি বড়ো ভোঁদা ছাত্রেরও হয়। বৌদ্ধবিহারকে গোপুরম্‌ আর গোপুরম্‌কে স্তূপ বলে ভুল করলেও নারীমূর্তিকে পুরুষমূর্তি বলে কখনও সে ভুল করতে পারে না।

রঙ্গনাথ পূজারীকে জিজ্ঞাসা করল, "এটা কোন্‌ দেবতার মূর্তি?"

পূজারী খুব ব্যস্ত ছিল, চেঁচিয়ে বলে উঠল, "পকেট থেকে কিছু বার করে পুজো দাও তা হলে আপনা থেকেই জানতে পারবে এটা কোন্‌ দেবতা।"

রঙ্গনাথ এবার জিজ্ঞাসা ছেড়ে মূর্তির গলায় হাত দিল। পূজারী শঙ্কিত হয়ে উঠল, তারপর লেখাপড়া জানা লোকের মতো বলল, "মূর্তি ছোঁয়ায় শক্ত নিষেধ আছে।"

মেয়েটা দেবীদর্শন করে বাইরে চলে গেছে। রুপ্পনবাবুর মনে

হ'ল মেলা শেষ হয়ে গেছে। তিনি রঙ্গনাথের হাত ধরে টান দিয়ে বলে উঠলেন, "দর্শন তো হয়ে গেছে, এখন চলো যাই।"

ইতিহাস সবচেয়ে বড়ো মূর্তিভঞ্জক। এখন তা রঙ্গনাথের মাথায় ভর করে বলল, "দর্শন হবে কী? এটা তো দেবীমূর্তিই নয়।"

এ কথা শুনে তিনজন গাঁইয়া রঙ্গনাথের কাছে এগিয়ে এল দু-চারজন লোক চমকে উঠে তার দিকে তাকাল। রঙ্গনাথ কোনো জাদুঘরের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কিউরেটরের মতো রুপ্পনবাবুকে বোঝাল, "দেখছ না, এটা পরিষ্কার একজন সৈন্যের মূর্তি। এই দেখো এটা শিরস্ত্রাণ, আর এই দেখো পেছন দিক থেকে বেরিয়ে এসেছে তূণীর। আর এই দেখো, সম্পূর্ণ সমান··· ।"

রঙ্গনাথ সৈন্যটির বীরত্বপূর্ণ বক্ষস্থলের বর্ণনা শেষ করতে পারল না। তার আগেই পূজারী লাফিয়ে পড়ে তাকে একটা ধাক্কা দিল। রঙ্গনাথ কোনোরকম বাধা না দিয়ে তীরের মতো ভিড়টাকে চিরে দরজার কাছে গিয়ে আটকে গেল।

ওদিকে পূজারী পুজো আর পয়সা কুড়োনো ছেড়ে মনের সুখে রঙ্গনাথকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করেছে। পূজারীর মুখটা ছোটো, কিন্তু তার বড়ো বড়ো গালাগাল এর-ওর ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ভাঙাচোরা অবস্থায় বাইরে এসে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে মন্দিরের ভেতর কেবল গালাগাল আর গালাগালই শোনা যেতে লাগল, কারণ ভক্তরাও এতক্ষণে পূজারীর হয়ে গালাগাল দিতে আরম্ভ করেছে।

গাঁইয়ারা একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়াল। পূজারী দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, "আমি তো সুরত দেখেই চিনে ফেলেছিলাম, খেস্টান। বিলেতওয়ালাদের পুত্তুর। একটুখানি কিচিরমিচির করতে শিখেছে আর অমনি বলতে আরম্ভ

করেছে, ইনি দেবী নন। চারদিন পর বোলো, আমার বাপ আমার বাপই নয়।"

শনিচর আর যোগনাথ পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। তবু তারা হাত-পা নেড়ে চেঁচামেচি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এতক্ষণে রুপ্পনবাবুর বাস্তববুদ্ধি ফিরে এল। রঙ্গনাথের হাত ধরে তিনি বললেন, "চলো দাদা।" তারপর পূজারীর দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে অথচ ঠাণ্ডাস্বরে বলতে লাগলেন, "দেখো ঠাকুর, মেলাটেলার দিনে বেশি দম লাগিয়ো না। তোমার বয়েস ঢলে পড়তে শুরু করেছে, গাঁজা এখন মাথায় চড়ছে।"

পূজারী কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই রুপ্পনবাবু আবার বললেন, "ব্যস ব্যস ব্যস, অনেক হয়েছে। বেশি পাঁয়তারা দেখিয়ো না। আমরা শিবপালগঞ্জের লোক। মুখ বন্ধ করো।"

কিছুটা দূরে গিয়ে রঙ্গনাথ বলল, "আমারই ভুল হয়েছে। আমার কিছু বলা উচিত হয় নি।"

রুপ্পনবাবু সান্ত্বনা দিলেন, "তা সত্যি। কিন্তু দোষটা তোমার নয়, তোমার লেখাপড়ার।"

শনিচরও বলল, "লেখাপড়া শিখে মানুষ লেখাপড়া জানা লোকদের মতো কথা বলতে আরম্ভ করে। কথা বলার আসল ঢঙটাই ভুলে যায়। কী বলো যোগনাথ?"

যোগনাথ জবাব দিল না; কারণ তখন সে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যুবতী মেয়েদের ধাক্কা দিতে ব্যস্ত। আর তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সে এই কাজে ব্যস্তই থাকতে চায়।

রুপ্পনবাবু সিংহসাহেবের কাছে এসে দাঁড়ালেন। সিংহসাহেবের

গালে চার-পাঁচ দিনের না-কামানো দাড়িগোঁফ, ঠোঁটের কোণে তামাকের পিক্ গড়িয়ে পড়ছে। এ-সব সত্ত্বেও ঐ শোলার হ্যাটটার জন্যই তাঁকে বেশ চোস্ত দেখাচ্ছে।

রুপ্পনবাবু বললেন, "বলুন সিংহসাহেব, কী খবর?"

"খবর বড়ো খারাপ ভাই। দশ-দশটা চালান করতে হ'ল। এখন তো রুপ্পনবাবু, এই বয়েসে এতেই লেগে থাকতে হচ্ছে। সাক্ষীর জন্য এজলাসে ঘুরতে ঘুরতে পায়ের চামড়া ক্ষয়ে যাবে।"

রুপ্পনবাবু ভিড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে দিয়ে বললেন, "চালান করার মধ্যে কী আছে সিংহসাহেব! দশ-পাঁচ টাকা করে নিয়ে ব্যাপারটা শেষ করে দিন।"

সিংহসাহেবও ঐরকম গলা চড়িয়ে জবাব দিলেন, "দশ-পাঁচ টাকা দেনেওয়ালা কোন্ শালা আছে? ওদিককার খোঞ্চাওয়ালাদের চালান করেছিলাম, সব শালা দুটো করে টাকা ঠেকাতে চাইছে। আমিও বললাম, চালানই চাইছ যখন, তখন নাও, তা-ই করে দিচ্ছি।"

রুপ্পনবাবু হাত তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথাকার লোক ঐ-সব খোঞ্চাওয়ালা? বড়ো অসভ্য তো!"

একটা মোটাসোটা লোক রুপ্পনবাবুর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। দেখতে বেশ ভারিক্কি-সারিক্কি, কিন্তু যখন কথা বলতে আরম্ভ করল তখন মনে হ'ল, বিশাল একটা তরমুজ পচে গেছে। লোকটা পিন্ পিন্ করে বলল, "রোহুপুরের লোক বাবুসাহেব। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিস্পিট্টর সাহেবকে খোশামোদ করছি, কিন্তু উনি এক-একটা খোঞ্চার জন্য রেট ধরেছেন দশ টাকা। তার নিচে নামছেন না।"

রুপ্পনবাবু বললেন, "নিয়ে নিন সিংহসাহেব, দুটাকার রেটেও তো আপনার কুড়ি টাকা হয়ে যাবে। খারাপ কী?"

সিংহসাহেব গলা চিরে চিৎকার করে উঠলেন, "দু টাকা?" তারপর হেসে আবার বললেন, "এখন এতখানি বেইজ্জতি করাবেন না রুপ্পনবাবু।"

মোটা লোকটা রুপ্পনবাবুর মনোভাবে উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগল, "বাবুসাহেব, আমার ক্ষমতাটাও দেখুন। এক বছর পরে এখানে খোঞ্চা লাগিয়েছি। এদিকে দশ টাকা চলে গেলে থাকবে কী!"

কথাটা ঠাট্টা দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু এখন খোঞ্চাওয়ালার পক্ষ নিতেই রুপ্পনবাবুর মজা লাগছে। তিনি আগের মতোই উঁচু গলায় বললেন, "ঠিকই তো বলছে। কী থাকবে? নিয়ে নিন সিংহসাহেব আড়াই টাকায় ব্যাপারটা চুকিয়ে নিন। আপনার কথাও থাকল না, ওর কথাও থাকল না।"

রুপ্পনবাবু এর পরেই মোটা লোকটাকে বললেন, "যাও, এখুনি পঁচিশটা টাকা এনে সিংহসাহেবের হাতে দিয়ে দাও। আর কিছু মিষ্টিটিষ্টিও।"

লোকটা চলে যাচ্ছিল, সিংহসাহেব তাকে ডেকে বললেন, "দেখো, মিষ্টিটিষ্টি এনো না।" তারপর ঠাণ্ডাভাবে জনসাধারণের উদ্দেশে বললেন, "শালা, রেড়ির তেলে বানিয়েছে, না মহুয়ার তেলে— কে জানে! ছাগলের নাদির মতো গন্ধ বেরুচ্ছে।"

রুপ্পনবাবু আরও কাছে এলেন। ঘরোয়া কথাবার্তা শুরু হ'ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কুঠির কী অবস্থা?"

সিংহসাহেব আক্ষেপ করে বললেন, "কুঠি নয়, অমনি বাড়ি বলুন।" একটু থেমে অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "শেষ হয় নি। ভাবছি, এই অবস্থাতেই নীলাম করে দেব।"

রঙ্গনাথ ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল। মন্দিরে গালাগাল শোনার পর থেকে তার মন কারও সঙ্গে লড়াই করবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিল। সে বলল, "এত এত ঘুষ নিয়েও আপনার কুঠি হতে পারল না?"

সিংহসাহেব এ কথায় অসন্তুষ্ট হলেন না। কেবল ভুরুর ইশারায় রুপ্পনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে? রুপ্পনবাবু জানালেন, "আমার দাদা। পিসির ছেলে। এঁর কথায় কিছু মনে করবেন না। একটু বেশি লেখাপড়া করেছেন, তাই কখনও সখনও উলটো-সোজা কথা বলে ফেলেন।"

সিংহসাহেব আশ্বাস দিলেন, "কিছু না, কিছু না। যা-ই হোন, বাড়িরই লোক।"

রঙ্গনাথ ঠোঁট চেপে আর-একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। সিংহসাহেব তাকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন, "সে দিন বদলে গেছে ভাই, কুঠি বানানোর যুগ চলে গেছে। ঘুষে আর এখন কুঠি হয় না। বাড়ির ওপর ছাদ বানাচ্ছি, এই যথেষ্ট। দেখছ না, রেটের কী অবস্থা! দশ-দশটা চালান লিখতে লিখতে হাত ব্যথা হয়ে গেল, আর পেলাম কী? বক মেরে পাখ্না।"

মোটা লোকটা ফিরে এল। পঁচিশ টাকার নোট সিংহসাহেবের হাতে দিল। এক টাকার নোট সব। সিংহসাহেব কথা থামিয়ে নোটগুলো দু-দুবার কায়দা করে গুনলেন। একটা নোট একটু বেশি ময়লা ছিল, সেটা বদলে নিলেন। তারপর নোটগুলো জামার নিচে বেনিয়ানের পকেটে আলতো করে রেখে দিলেন।

রঙ্গনাথ এতক্ষণ তাঁর মুখ দেখছিল। সিংহসাহেব বললেন, "অবস্থাটা দেখলেন? আগেকার দিনে যদি লোকে জানতে পারত যে, যিনি ঘুষ নিচ্ছেন তিনি হাকিম তা হলে হাজার জন ঘিরে ধরত,

পয়সা দিত, তার ওপর কৃতজ্ঞ থাকত। আর এখন কেউ ধারে-কাছে ঘেঁষে না। যদি কেউ আসেও তা হলে এই যেমন রুপ্পনবাবু, এমনি কোনো লোককে সঙ্গে করে আসে। ভদ্রতায় মামলা খারাপ হয়ে যায়।"

রুপ্পনবাবুকে বোঝাতে তিনি আরও বললেন, "কী হয়েছিল দীননাথ তহসিলদারের সঙ্গে? জানেন আপনি? বৈদ্যজীকে জিজ্ঞাসা করবেন। চার মাস এখানে এই শিবপালগঞ্জে এসে বসে ছিলেন। কেউ এক কাণাকড়িও দেয় নি। একদিন এজলাসেই গরম হয়ে গেলেন। দু-চারজন উকিল সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের বললেন, 'ব্যাপার কী? লোকে কি ভেবে নিয়েছে, আমি পয়সা ছুঁই না? যদি তা-ই হয়ে থাকে তা হলে আপনারা তহসিলের একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঘোষণা করে দিন যে, আমি ঘুষ নিই। কেউ যেন ভুল বুঝে না থাকে।'— এরপরেও লোকে মনে করল, এটা ঠাট্টা। তাঁর মুখটাই এমন ছিল যে, মনে হ'ত তিনি সৎ ব্যক্তি। কেউ বিশ্বাসই করতে পারত না যে, তিনি ঘুষ চান। পরে যখন বড়ো বড়ো লোকেরা মাঝখানে এলেন, বৈদ্যজী নিজে যখন চার-পাঁচ জায়গায় বললেন, তখন লোকে সুপারিশ ছেড়ে তাঁর কাছে নোট নিয়ে যেতে আরম্ভ করল। এখন বলুন রুপ্পনবাবু, এইভাবে কি পয়সা জমানো যায়? এইভাবে তো কেবল নুন-রুটির সংস্থান হতে পারে। ঘুষ নেওয়াও এখন অনেক নীচতার কাজ। এর মধ্যে আর-কিছু নেই। যারা ঘুষ নেয় আর যারা নেয় না, দুই-ই সমান। সবারই অবস্থা খারাপ।"

একদল ভেঙে এখন তিন দল হয়ে গেল। যোগনাথ মদের দোকানের

দিকে চলে গেল। শনিচর আর ছোটে পালোয়ান গেল মেলার অন্যদিকে, চেনাজানা দু-চারজন ভাং তৈরি করছে। রঙ্গনাথ আর রুপ্পনবাবু একসঙ্গে ফিরলেন।

রঙ্গনাথ কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেছে। ক্লান্তও হয়ে পড়েছে। একটু বিশ্রাম নেবার জন্য একটা কুয়োর ঘেরার ওপর বসে পড়ল। রুপ্পনবাবু সেখান থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু দূরে তিতিরের লড়াই দেখতে লাগলেন।

কুয়ো থেকে খানিকটা দূরে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। সেখানে একটা থামের পাশে একটা মেয়ে বসে আছে। যুবতী মেয়ে, গায়ের রঙ গমের মতো। পরনে একটা জমকালো শাড়ি। নাকে সোনার নথ। মেলার নোংরা পরিবেশের মধ্যে এই দৃশ্যটা রঙ্গনাথের ভালো লাগল। সে ওদিকেই তাকিয়ে রইল।

মেয়েটার কাছ থেকে খানিক দূরে ময়লা লুঙ্গি আর নকল চকমকে সিল্কের একটা ফর্সা জামা পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছে। একটা কানে চুনের বড়ি, মাথার চুল থেকে তেল চুইয়ে পড়ছে। লোকটা আস্তে আস্তে মেয়েটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর গজখানেক দূরত্ব রেখে বসে পড়ল। লোকটা কিছু বলল, মেয়েটা তাতে মুচকি হাসল। রঙ্গনাথের ভালো লাগল। তার ইচ্ছে হ'ল, মেয়েটা তার দিকেও তাকাক। মেয়েটা রঙ্গনাথের দিকেও তাকাল। রঙ্গনাথের ইচ্ছে হ'ল, সে ঐ রকম করে আবার একটু মুচকি হাসি হাসুক। মেয়েটা হাসল। মাথা দিয়ে তেল চোয়ানো লোকটা আর-একটা বিড়ি ধরাল।

রঙ্গনাথের কাছে একটি লোক এসে দাঁড়াল। তার পরনে ধুতি-জামা আর মাথায় টুপি। দেহাতের হিসেবে লোকটা দায়িত্বশীল মনে

হ'ল। রঙ্গনাথ লোকটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার সামনের দিকে দেখতে লাগল। মেয়েটা আর হাসছে না। তার মুখে একটা করুণার ভাব এসে গেছে, হিন্দী সিনেমায় গজল গাইবার আগে হিরোইনের মুখে যেমনটা আসে।

লোকটা আস্তে করে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি এখানে থাকেন?"

রঙ্গনাথ মাথা নেড়ে বলল, "না।"

লোকটা নিশ্চিন্তে রঙ্গনাথের পাশে বসে পড়ল। তারপর বলল, "এই-সব দেহাতী লোকেরা তো কিছু বোঝে না, খালি সিনেমার এ গান শোনাও, ও গান শোনাও।"

রঙ্গনাথ সাগ্রহে লোকটার কথা শুনছিল, কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না। লোকটা আবার বলতে আরম্ভ করল, "এমনিতে ওঁর টিল্লানা শুনুন, দাদরা শুনুন কিংবা ঠুংরী শুনুন।...উনি প্রাণটা একেবারে বার করে রেখে দেন।"

লোকটা ভাববিহ্বল হয়ে, স্বপ্নালু চোখে, রোম্যান্টিক ভঙ্গিতে বলল, "রোহুপুর গিয়েছিলেন, এখন বৈজেগাঁও যাচ্ছেন।"

রঙ্গনাথ একবার শহরে রবিশঙ্করের সংগীতানুষ্ঠানে— এইরকম কথা শুনেছিল। অ্যানাউন্সার বলছিল, "সবে এডিনবরা থেকে ফিরেছেন, এবার শীতকালে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছেন।"

রঙ্গনাথ মাথা নেড়ে সায় দিল। এখন সে লোকটার কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছে।

লোকটা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে আরম্ভ করল, "পথচলতি বিদ্যা নয় এঁর। বৈঠকখানায় আসুন, বসে শুনুন। তা হলে বুঝতে পারবেন, কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা নকল।"

রঙ্গনাথের দৃষ্টি সামনের দিকে। মাথা থেকে তেল চোয়ানো

লোকটা এখন মেয়েটার একেবারে গা ঘেঁষে বসে পড়েছে। দুজনে কথা বলছে, হাসছে আর থেকে থেকে রঙ্গনাথকে দেখছে। রঙ্গনাথ এতক্ষণ পরে বুঝতে পারল, তারা অনেক কিছু আশা করছে ওর কাছে।

রঙ্গনাথের পাশে ধুতি-জামা-টুপি পরা লোকটাকে বসে থাকতে দেখে দূর থেকে হয়তো মনে হচ্ছে, দুজন গম্ভীর লোক দেশের সমস্যা নিয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। লোকটা ভুরু কুঁচকে বলছে, "সব নষ্ট করে দিয়েছে নতুন আইন। বড়ো বড়ো রইসজাদা গান শোনার জন্য ছটফট করছে। এখন তো থানাওয়ালারা অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। বৈঠকখানায় গানবাজনা চলতে আরম্ভ করেছে।"

রঙ্গনাথ উঠে দাঁড়াল। লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "আমি নিজে ওঁর জন্য দশটা বছর জান লড়িয়ে দিয়েছি। ময়ূরের মতো গলা পেয়েছে। তৈরি হবার পর শয়ে একজন হয়ে বেরিয়েছে।"

রঙ্গনাথ রুপ্পনবাবুর দিকে তাকাল। রুপ্পনবাবু অন্যদিকে তিতিরের লড়াই দেখছিলেন। রঙ্গনাথ ডাকল, "রুপ্পন!"

লোকটা কিছুক্ষণ কী চিন্তা করে বলল, "আমারই ধর্মমেয়ে। হিন্দু। বড়ো সরল।" একটু থেমে মুখটা বাড়িয়ে আবার গর্বভরে বলতে শুরু করল, "কেবল গানই গায়। গুণিজনদের মধ্যে থেকেছে।··· পেশা নেই।"

রঙ্গনাথ লোকটাকে বলল, "খুব ভালো কথা। যারা গান গায় তাদের ঐ পেশা থাকলে গান নষ্ট হয়ে যায়। গানও এক সাধনা। ওতেই ওকে ধরে রাখুন।"

লোকটা আশ্চর্য হয়ে বলল, "আপনি তো সব-কিছু জানেন। আপনাকে আর কী বোঝাব। এক সময় বৈঠকখানায় আসুন··· ।"

রুপ্পনবাবুকে দেখে লোকটা থেমে গেল। রুপ্পনবাবু হঠাৎই পেছন

থেকে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি কড়া সুরে বললেন, "নিশ্চয় যাব বৈঠকখানায়। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলছ? নিজের বাপকে চিনে নাও আগে।"

লোকটা হাতজোড় করল। তার ভঙ্গি বদলে গেল। বদমায়েস লোকদের মতো মুচকি হেসে বলল, "নিজের বাপ তো টাকা, মালিক।"

রঙ্গনাথ মুচকি হাসল। দৃষ্টি ছুটিয়ে দেখতে পেল, মেয়েটার হাসিটা কিছু বড়ো হয়ে গেছে।

রঙ্গনাথ আর রুপ্পনবাবু অনেকক্ষণ চুপচাপ পথ হাঁটছেন। প্রথমে রুপ্পনবাবুই বললেন, "কী বলছিল লোকটা? মেয়েটা এখনও পেশা আরম্ভ করেছে কি করে নি?"

রঙ্গনাথ কোনো জবাব দিল না।

"চারদিকেই জালিয়াতি। এই শালী বেশ্যাকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি," রুপ্পনবাবু বড়োদের মতো বলতে লাগলেন, "বছরের পর বছর নৌকোয় পাল তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ঐ লোকটা ওর ঠুংরী-দাদরাতে নাকাড়া পেটাচ্ছে। মোষের মতো আওয়াজ, আর বড়ো ওস্তাদ হয়েছেন! এই অঞ্চলের সবচেয়ে পচা বেশ্যা। কেউ ওকে কাণাকড়ি দিয়েও পোছে না।"

রঙ্গনাথ ক্লান্ত হয়ে পথ চলছে। রুপ্পনবাবু বললেন, "আমি না গেলে লোকটা কি চুপ করত! তোমাকে তো ও প্রায় ফাঁসিয়ে ফেলেছিল।"

রুপ্পনবাবু আপন মনে বলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ রঙ্গনাথ জিজ্ঞাসা করল, "রুপ্পন, তুমি বেলাকে প্রেমপত্র লিখেছিলে কেন?"

রঙ্গনাথের এ কথায় রুপ্পনবাবুর কথায় বাধা পড়ল। কিন্তু রুপ্পনবাবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "এতদিন তুমি শহরে ছিলে আর এ-ও জানো না, কেন লোকে প্রেমপত্র লেখে?"

রঙ্গনাথ এ কথার জবাব খুঁজে পেল না। সে শুধু বলল, "মামা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন।"

রুপ্পনবাবু চট করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। উদ্ধত ভঙ্গিতে বললেন, "বাবা কেন অসন্তুষ্ট হবেন? তাঁকে বোলো, যেন সরাসরি আমার সঙ্গে কথা বলেন। চোদ্দবছর বয়েসে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। প্রথম মা মারা গেলে সতেরো বছর বয়েসে আবার বিয়ে করলেন। এক-বছরও একা থাকতে পারেন নি। এ তো করেছেন আইনমাফিক, বে-আইনী কত করেছেন, শুনবে তা?"

রঙ্গনাথ বলল, "আমি শুনতে চাই না।"

চোদ্দ

শেষ রাত্রে বৈদ্যজীর শীত লাগতে লাগল। তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চ্যবনপ্রাশ, স্বর্ণভস্ম, বাদাম পাক ইত্যাদির সংমিশ্রণে তৈরি দুর্গ ভেঙে শীত তাঁর চামড়ার মধ্যে ঢুকে মাংসের মোটা মোটা পরত ভেদ করে হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। লেপটাকে তিনি ভালো করে টেনেটুনে ঢেকে শোবার চেষ্টা করলেন। তখন তাঁর

মনে হ'ল, একা শুলে বেশি ঠাণ্ডা লাগে। মনে হওয়ার পর একে একে অনেক কিছু তাঁর মনে আসতে লাগল। তার ফল হ'ল, তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল, তারপরেই পেটের ভেতর বায়ু তোলপাড় শুরু করে দিল, শরীরের ওপর আর নিচের অংশ দিয়ে বারবার বিস্ফোরণের আওয়াজ করে বেরুতে লাগল। বৈদ্যজী লেপটা চেপে ধরে পাশ ফিরে শুলেন এবং শেষে একটা অন্তিম বিস্ফোরণের শব্দ শুনে আবার তন্দ্রালীন হলেন। দেখতে দেখতে বিদ্রোহী বায়ু কুকুরের মতো লেজ নাড়তে নাড়তে শুধু তাঁর নাসারন্ধ্র দিয়ে গর্জন করতে করতে যাতায়াত করতে লাগল। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখলেন।

তিনি দেখলেন, গণতন্ত্র তাঁর তক্তপোশের পাশে মাটিতে হাতে ভর দিয়ে হাতজোড় করে বসে আছে। তাকে দেখতে হালচাষীর মতো, আর ইংরেজী দূরের কথা, শুদ্ধ হিন্দীও বলতে পারে না। তবু সে মিনতি জানাচ্ছে আর বৈদ্যজী তা শুনছেন। বৈদ্যজী তাকে চার-চারবার তক্তপোশে বসতে বলেছেন। তাকে বুঝিয়েছেন, 'তুমি গরিব, তাতে কী হয়েছে! তুমি তো আমারই আত্মীয়।' কিন্তু তবু গণতন্ত্র তাঁকে বারবার "হুজুর" আর "আজ্ঞে" বলে সম্বোধন করছে। অনেক করে বোঝানোর পর গণতন্ত্র উঠে তাঁর তক্তপোশের এক কোণে গিয়ে বসল এবং যখন তার মুখ থেকে অর্থপূর্ণ কথা বার হ'ল তখন বৈদ্যজীর কাছে প্রার্থনা জানাল, 'আমার কাপড় ছিঁড়ে গেছে, আমি উলঙ্গ হয়ে যাচ্ছি। এই অবস্থায় আমার কারও সামনে বেরুতে লজ্জা করে। তাই হে বৈদ্য মহারাজ, আমাকে পরার জন্য একটা পরিষ্কার ধুতি দাও।"

বৈদ্যজী বদ্রী পালোয়ানকে ভেতর থেকে একটা ধুতি আনতে বললেন। কিন্তু গণতন্ত্র মাথা নেড়ে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। বলল, 'আমি আপনার কলেজের গণতন্ত্র, আপনি এই কলেজের বার্ষিক সভা বছরের পর বছর ডাকেন নি। কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত ম্যানেজারের নির্বাচন হয় নি। এতদিনে কলেজে সব-কিছু ফুলেফেঁপে উঠেছে, একমাত্র আমিই এক কোণে পড়ে আছি। একবার আইনমাফিক আপনি নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন, তাতে করে আমার দেহে একটা নতুন কাপড় এসে যাবে, আমার লজ্জা নিবারণ হবে।'

কথাগুলো বলে গণতন্ত্র বাইরে চলে গেল। বৈদ্যজীর ঘুম আবার ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তক্তপোশের নিচের দিকে লেপের ভেতর তাঁর দেহাভ্যন্তরের বিদ্রোহের এক সদ্য বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেললেন, গণতন্ত্রকে দেখতে যত হাঁদাই হোক-না-কেন, আসলে সে ভালো মানুষ এবং নিজের মানুষ। তাকে সাহায্য করা উচিত, একটা নতুন কাপড় অন্তত দেওয়া উচিত, যাতে পাঁচজন ভদ্রলোকের মধ্যে বসতে পারে।

পরের দিন প্রিন্সিপালসাহেব হুকুম পেলেন, কলেজের বার্ষিক বৈঠক ডাকতে হবে আর অন্য পদাধিকারীদের সঙ্গে ম্যানেজারের নির্বাচন করতে হবে। প্রিন্সিপাল অনেক বোঝালেন, নতুন নির্বাচনের কোনোই দরকার নেই। এই নির্বাচন করাটা উচিতও হবে না। কিন্তু বৈদ্যজী বললেন, "তুমি বাধা দিয়ো না, এটা নীতির প্রশ্ন।"

প্রিন্সিপাল আরও বললেন, এখনও কোনো খবরের কাগজে নিন্দা ছাপা হয় নি, ওপরে কোনো অভিযোগও যায় নি, আবার মিছিলও বার হয় নি একটাও, অনশনও করে নি কেউ। সব শালা নিজের নিজের জায়গায় চুপ মেরে বসে আছে। কেউ বার্ষিক বৈঠকের কথা বলছে না। যারা বলছে, শেষ পর্যন্ত তারা কে? ঐ খান্না মাস্টার, ঐ রামাধীন ভিখমখেড়বী আর তাদের দু-চারজন চেলা-চামুণ্ডা। ওদের খপ্পরে পড়ে বার্ষিক বৈঠক ডাকা ভালো হবে না।

বৈদ্যজী সমস্তটা শুনে বললেন, "তুমি ঠিক কথাই বলছ, কিন্তু ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারবে না, কারণ এটা নীতির প্রশ্ন। যাও, বৈঠকের প্রস্তুতি শুরু করে দাও।"

ছঙ্গামল বিদ্যালয় ইণ্টার কলেজের ছেলেরা খেলাধুলার জগতের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত, কারণ প্রতি মাসে তাদের কান ধরে গেম্‌স্ ফী আদায় করা হয়। কলেজের ধারে-কাছে যে খেলার মাঠ নেই, সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু এর জন্য কারও অসুবিধা হয় না, বরং সকল পক্ষই এতে সন্তুষ্ট। গেম্‌স্ টিচারকে খেলাধুলা দেখতে হয় না বলে তাঁর এত সময় বাঁচে যে, তিনি মাস্টারদের দু দলেই ঢুকে তাঁদের আস্থা অর্জন করতে পারেন। প্রিন্সিপালসাহেবও বড়ো আরামে আছেন, তাঁর এখানে হকি টিমে মারামারি হয় না, কারণ এখানে হকি টিমই নেই। তা ছাড়া এ-সবের জন্য কলেজে অনুশাসনের কোনো সমস্যাও দেখা দেয় না। ছেলেদের বাবারাও খুশি, খেলাধুলার বিপদ-আপদ ফী দিয়েই কাটানো যায় আর ছেলেরাও সত্যিকারের খেলোয়াড় হওয়া থেকে বেঁচে যায়। ছেলেরাও খুশি, কারণ তারা জানে, যতক্ষণ ধরে তারা হাতে স্টিক নিয়ে ঢিলের মতো একটা বলের

পেছনে একটা গোল থেকে আর-একটা গোল পর্যন্ত পাগলের মতো দৌড়ুবে ততক্ষণে তারা তাড়ির একটা কাঁচা ঘড়াই শেষ করে ফেলতে পারবে, কিংবা দাঁও লাগলে চার-ছ টাকা খিঁচেও নেবে।

এই-সব ছেলেদের হাতে আজ হকি স্টিক আর ক্রিকেটের ব্যাট। তারা এমন সগর্বে তা ধরে আছে, যেন রাইফেল ধরেছে। এমনি প্রায় জন পঞ্চাশেক ছেলে কলেজের ফটকের কাছে ঘোরাঘুরি করছে।

রঙ্গনাথ তাদের এইরকম সেজেগুজে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "কী ব্যাপার! আজ ইন্সপেক্টর আসছেন নাকি ইন্সপেকশনে?"

ছোটে পালোয়ান উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন, অর্থাৎ কোমরের আলগা লুঙ্গিটাকে ঠিক করে নিলেন। তারপর বললেন, "এই গণ্ডগোলের মধ্যে কে ইন্সপেকশনে আসবে! এ তো কলেজের বার্ষিক বৈঠকের প্রস্তুতি।"

ছোটে পালোয়ানও কলেজ কমিটির সদস্য। ছেলেরা তাঁকে দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠল। ফটকের সামনেই প্রিন্সিপালসাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। প্রিন্সিপালসাহেব অভ্যর্থনা জানালেন, "আসুন ছোটেলালজী, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।"

ছোটে পালোয়ান নম্রভাবেই বললেন, "এসেছি যখন, তখন কি আর ফিরে যাব! চলুন, যাচ্ছি।"

বর্ষায় কুকুর যখন ভিজে যায় তখন তারা একরকমভাবে হাঁচে। প্রিন্সিপালসাহেব সলজ্জ হাসি হাসলে অনেকটা তেমনি আওয়াজ হ'ল। তিনি আগে আগে বলতে বলতে চললেন, "রামাধীনের দল বেশ জোরদারভাবে আরম্ভ করেছে। বৈজেগাঁওয়ের লাল-সাহেবের সাহায্য নিয়ে কয়েকজনকে নিজেদের দলে ভাঙিয়ে এনেছে। লালসাহেব কেন যে এই গণ্ডগোলের মধ্যে এলেন!

শহরে থাকেন, কিন্তু গ্রামের সব ব্যাপারে নাক গলান। রামাধীনের বড়ো অহংকার হয়েছে। বুঝতে পারছি না, কতজন ওদিকে আছে আর কতজন এদিকে।”

ছোটে পালোয়ান কলেজবাড়ির সামনের বাগানে ফুলের কেয়ারির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। প্রিন্সিপালসাহেব আবার বলতে আরম্ভ করলেন, “বৈদ্যমহারাজও কখনও কখনও এমন কাজ করে বসেন যে, কী বলব! কী দরকার ছিল এই নির্বাচনের!”

ছোটে পালোয়ান একটা কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটা একসময় কীর্তনের আকারে খুব প্রচলিত ছিল—“কী কাজ আমার পৃথিবীতে, কৃষ্ণ আমার প্রিয় আছে।”

ফটকের ভেতরে যাবার সময় প্রিন্সিপাল রঙ্গনাথকেও বললেন, “আপনিও আসুন, রঙ্গনাথবাবু। আপনার আসতে কোনো বাধা নেই।”

রঙ্গনাথ মাথা নেড়ে বলল যে, সে পরে আসছে। সে ভেতরে গেল না।

আস্তে আস্তে কলেজের সাধারণ সমিতির অন্যান্য মেম্বারও বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন পথে এসে পৌঁছলেন। কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের একজন ডাইরেক্টর এত দ্রুত এলেন এবং এত দ্রুত ভেতরে চলে গেলেন যে, সবাই তাঁকে না দেখে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে ঠিকাদার সাহেবকে কলেজের ক্ষেতের ফসল মাড়িয়ে অন্য দিক দিয়ে যেতে দেখা গেল। মজুররা যেখানে কাজ করছে সেখানে থেমে কোনো একটা জিনিস আকাশে উঠিয়ে মাটিতে আছাড় মারার মতো অভিনয় করলেন, তারপর হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বাবু গয়াদীন ধীরে

ধীরে কলেজের ফটক পর্যন্ত এলেন। ওখানেই তিনি বসে পড়লেন। তিনি উদাস দৃষ্টিতে ছেলেদের হাতের হকি স্টিক আর ক্রিকেটের ব্যাটগুলো দেখলেন। তারপর একটা ছেলের হাতে চেপে ধরা বলটাকে চোখ দিয়ে মেসমরাইজ করতে লাগলেন। প্রিন্সিপাল সাহেব দরজা থেকে বললেন, "চলুন মেম্বার সাহেব, আর সবাই এসে গেছেন।"

যেন তাঁকে ডাকাতির অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং শনাক্ত করার জন্য সাক্ষীদের সামনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই রকম একটা চেহারা করে তিনি বললেন, "চলুন।"— পেঙ্গুইন পাখির মতো পা ফাঁক করে চলতে চলতে আস্তে আস্তে কলেজবাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর রাস্তায় একজন ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখা গেল। মাথায় তার ঝকঝকে পাগড়ি। দেখে মনে হচ্ছে, যেন দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের কোনো পাতা থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে। ছেলেদের মধ্যে একজন বলল, "এখন কেউ বৈদ্যজীর কেশস্পর্শও করতে পারবে না। ঠাকুর বলরামসিংহ এসে গেছেন।"

বলরামসিংহ এসেই ঘোড়ার রাশ একটা ছেলের হাতে ধরিয়ে দিলেন। এখন তাঁকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ মনে হচ্ছে। যেন দক্ষিণের বিদ্রোহের খবর দেবার জন্য কোনো দূত আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করছে, সেইরকম দ্রুতবেগে তিনি কলেজের পাঁচিল পর্যন্ত এলেন। তারপর একজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মারপিট হয় নি তো?"

ছেলেটা বলল, "কী রকম মারপিট? আমরা তো প্রিন্সিপালের দলে। অহিংসাবাদী।"

বলরামসিংহ গোঁফে তা দিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "তোমরাও কম নও, হাতে হকিডাণ্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ আর মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য হয়েছে!"

ছেলেটা বলল, "মহাত্মা গান্ধীও লাঠি নিয়ে চলতেন। আমরা তো নিরস্ত্র। এগুলো তো হকি স্টিক। এতে করে তো শালা একটা বলও মরে না। মানুষ মরবে কী?"

প্রিন্সিপাল সাহেব আবার বাইরে এলেন। বলরামসিংহকে দেখে বললেন, "চলুন মেম্বার সাহেব, ভেতরে চলুন। কোরাম হয়ে গেছে, এখনই মিটিং শুরু হবে।"

বলরামসিংহ পাগড়ির খুঁট দিয়ে ঘাম মুছে বললেন, "কোনো চেলাকে বলে দিন, ঘোড়াটাকে দানাপানি দিক। আমি আর ভেতরের মিটিঙে গিয়ে কী করব! আমার কোরাম তো এখানেই।"

প্রিন্সিপাল সাহেব খুশিতে মাথা নাড়ালেন। বলরামসিংহ জামার একটা পকেট মুঠো করে ধরে বললেন, "বিশ্বাস না হয় তো এটা ছুঁয়ে দেখুন। এইটেই তো সত্যিকারের কোরাম।"

প্রিন্সিপাল না ছুঁয়েই বললেন, "মনে করুন, ছুঁয়েছি। আপনার কথা কি মিথ্যে হতে পারে!"

বলরাম সিংহ বললেন, "আসল বিলিতি জিনিস, ছ গুলিওয়ালা। দেশী কার্তুজী পিস্তল নয় যে, একবার ফুট্ করেই থেমে যাবে। ঠা ঠা শুরু করে দিলে রামাধীনের দলের তুজন মেম্বার চড়ুইপাখির মতো লুটিয়ে পড়বে।"

প্রিন্সিপাল বললেন, "চমৎকার, চমৎকার।" এমনভাবে বললেন যেন আসল কবিতা যাকে বলে তা-ই তিনি বলরাম সিংহের মুখ থেকে শুনতে পেয়েছেন। এগুতে এগুতে বললেন, "আমি ভেতরে

মিটিঙে যাচ্ছি, বাইরেটা আপনি সামলাবেন।" তারপর প্রার্থনার সুরে মহাত্মা বিদুরের ভাষায় বললেন, "শান্তভাবে কাজ আদায় করবেন।"

বলরাম সিংহ আবার গোঁফে তা দিলেন, "সব শান্তই আছে। এখানে পঞ্চাশটা শাস্তি হাঁটুর নিচে পড়ে আছে।"

প্রিন্সিপালসাহেব চলে গেলেন। বলরাম সিংহ ওখানেই বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ ধরে পিচ্ পিচ্ করে তামাকের পিক ফেললেন, তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটাকে, যে নিজেকে মহাত্মা গান্ধীর চেয়েও বড়ো অহিংসাবাদী বলেছিল, তাকে বললেন, "বাবা, কলেজের চারপাশটা একটু ঘুরে দেখে এসো তো আমাদের লোকেরা আসাযাওয়ার পথগুলো ঠিকমতো আটকেছে কিনা। আর রমেশ ব্যাটাকে বলে দিয়ো যে, শালা যেন কারও সঙ্গে ভিড়ে না যায়। বোঝালে যদি কেউ বুঝতে না চায় তা হলে তাকে যেন এদিকে ফটকে পাঠিয়ে দেয়।"

ছেলেটা বয় স্কাউটের মতো, যার কাজের ওপর কোনো দেশের যুদ্ধজয় নির্ভর করছে, এমনিভাবে খবর নিতে চলে গেল। চারিদিকে যে-সব ছেলে ঘোরাফেরা করছিল তাদের ব্যস্ততা বেড়ে গেল। বলরাম সিংহ বললেন, "আর একটু বড়ো করে চক্কর দিয়ে এসো বাবারা। কোনো চিন্তা নেই, আমি যতক্ষণ এখানে উপস্থিত আছি ততক্ষণ শত্রু ধারেকাছেও আসবে না।"

বেলা এখন তিনটে। রাস্তায় ট্রাক আর গোরুর গাড়ি চলছে। বলরাম সিংহ পা'র ওপর পা তুলে বসে স্বপ্নালু দৃষ্টিতে তাদের আসা-যাওয়া দেখতে লাগলেন। একবার ঘোড়া চিঁহিহি করে উঠতেই তিনি তাকে সস্নেহে বললেন, "সাবাস আমার চেতক, সবুর কর। সময় হলে দানাপানি পাবি।" চেতক সবুর করতে চাইল, আর তার প্রমাণস্বরূপ জলধারা ছেড়ে দিল।

হঠাৎ একটা ট্রাক কলেজের সামনে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। পরণে ফর্সা ধুতিজামা, মাথায় টুপি, হাতে ছড়ি— একজন লোক লাফিয়ে নিচে নেমে দ্রুতবেগে কলেজের দিকে এগুল। ট্রাকটাকে থামতে দেখেই ছেলেরা দূর দূর থেকে দৌড়তে দৌড়তে এল। বলরাম সিংহ তাদের বাধা দিয়ে বললেন, "নমস্কার পণ্ডিত!"

লোকটা অস্পষ্ট স্বরে কী যেন বলল। তারপর ফটকের দিকে পা বাড়াল। বলরাম সিংহ বললেন, "পণ্ডিত, একটু আস্তে চলো। তোমাকে কেউ তাড়া করে নি।"

পণ্ডিত লজ্জা পেয়ে হাসলেন। বললেন, "মিটিং শুরু হয়ে গেছে না?"

বলরাম সিংহ উঠে দাঁড়ালেন। আস্তে করে পণ্ডিতের পাশে এলেন। ছেলেরা গোল হয়ে কাছে এগিয়ে এসেছিল, "পালাও বাবারা, দূরে গিয়ে খেলা করো।" তারপর লোকটির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন, "পণ্ডিত, মিটিঙে তোমার হাজিরা হয়ে গেছে। তুমি ফিরে যাও।"

পণ্ডিত কিছু বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ততক্ষণে বলরাম সিংহ তাঁর ধারে আরও সেঁটে গিয়ে বললেন, "কিছু বুঝেশুনেই বলছি। ফিরে যাও।"

পণ্ডিত তাঁর উরুতে শক্ত শক্ত কী একটা ঠেকল টের পেলেন। তিনি বলরাম সিংহের জামার পকেটের দিকে তাকালেন। তারপর হকচকিয়ে দু-পা পিছু হটে গেলেন।

পণ্ডিতকে বিদায় দিয়ে বলরাম সিংহ আবার বললেন, "পণ্ডিত, নমস্কার।"

পণ্ডিত চুপচাপ ফিরে গেলেন। রাস্তায় কোনো সওয়ারী ছিল না। ট্রাক চলে গিয়েছিল, তিনি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেলেন। একটা ছেলে জিজ্ঞাসা করল, "গেছেন?"

বলরামসিংহ বললেন, "পণ্ডিত সমঝদার লোক, বুঝে গেছেন।"

একটি ছেলে প্রশ্ন করল, "বুঝেছেন তো এইভাবে পালাচ্ছেন কেন?"

বলরামসিংহ বললেন, "এখন তোমরা ছেলেমানুষ বাবা, এরকম অবস্থায় সমঝদার লোকেরা এইরকম চালেই চলে।"

একটা ছেলে ঘোড়াটাকে দানাপানি দিচ্ছিল। ঘোড়াটা আবার চিঁহিহি করে উঠল। বলরামসিংহ এবার ধমকে বলে উঠলেন, "চুপ কর চেতক।"

বয় স্কাউট ফিরে এল। ঘোড়াকে ধমকাতে ধমকাতেই বলরাম সিংহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে, কী খবর?"

স্কাউট ঘাবড়ে গেল। ঘাবড়ে গেলে সাধারণত বেশিরভাগ ছেলে যা করে, সে-ও তা-ই করল, দাঁত বার করে বলল, "হ্যাঁ ঠাকুর-সাহেব, সব ঠিক আছে।"

"কতজন এসেছিল?"

"পাঁচ।"

"সবাই বুঝেছে, না কেউ বুঝতে চায় নি?"

"সবাই বুঝেছে।"— এতক্ষণে ছেলেটার সাহস ফিরে এসেছে। দূরে পণ্ডিতকে দেখিয়ে বলল, "ওঁর মতো ফড়্ ফড়্ করতে করতে ফিরে গেছে।"

অন্য ছেলেরা প্রাণখুলে হেসে উঠল। বলরামসিংহ বললেন, "সমঝদারেরই মরণ হয়।"

কলেজে জয়ধ্বনি উঠল। কেউ বলল, "বলো, সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়।"

জয় বলার ব্যাপারে ভারতীয়দের সঙ্গে কবে কে পেরেছে! জয়

সীতাপতি রামচন্দ্র থেকে শুরু হয়েছিল, পরে শোনা গেল, পবনসুত হনুমানের জয়। তারপরে কে জানে—কেমন করে, সেই জয় সটান মহাত্মা গান্ধীর ওপর এসে নামল : বলো মহাত্মা গান্ধীর জয়। তারপর সবুজ ঝাণ্ডা দেখা গেল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে একটা জয় দেওয়া হ'ল। তারপর প্রাদেশিক নেতাদের একটা করে জয়, একটা করে জয় জেলার নেতাদের, শেষে আসল জয় : বলো, বৈদ্যমহারাজের জয় !

বর্শায় বেঁধা শুওরের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে প্রিন্সিপালসাহেব বাইরে এলেন, তিনি চিৎকার করে বললেন, "বলো, বৈদ্যমহারাজের … ।"

জয় বলার জন্য সামনের দল ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

একটা মেলা শুরু হয়ে গেল যেন। প্রিন্সিপালসাহেব রঙ্গনাথকে বোঝাতে লাগলেন, "চলুন, বৈদ্যমহারাজ আবার সর্বসম্মতিক্রমে ম্যানেজার নির্বাচিত হয়েছেন। এখন দেখবেন, কলেজ কীরকম উন্নতি করে। ধকাধক, ধকাধক, ধকাধক ! তুফান মেলের মতো ছুটবে।" প্রিন্সিপালসাহেব খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর মুখ বেশ লাল হয়ে আসছে।

ছোটে পালোয়ান বললেন, "এই প্রিন্সিপাল, বেশি ভড়্‌ভড়্‌ কোরো না। আমার একটা কথা শোনো। এই যে ছেলেরা হাতে হকির ডাণ্ডা নিয়ে ঘুরছে, এদের একটা করে বলও দিয়ে দিয়ো আর বোলো খানিকটা নিশানাও যেন শিখে নেয়। এদের মধ্যে একজনও এমন নেই যে, বলের ওপর ডাণ্ডা মারতে পারে। সবাই মাটিতে সাপ পেটায়।"

"নিশ্চয় মেম্বারসাহেব, নিশ্চয়। খেলাধুলারও ব্যবস্থা হবে। এই ঝঞ্ঝাটটা কাটিয়ে উঠেছি··· ।"

ছোটে পালোয়ান বললেন, "কাটিয়ে তো উঠেছ, কিন্তু আমার কথাটা বলে নিই। এখন তো সব কথাতেই সায় দিচ্ছ, কিন্তু তোমার দ্বারা কিচ্ছু হয় না। এটা খেলাধুলোর কথা। ছেলেরা হকির ডাণ্ডা হাতে শুধু ঘুরে বেড়ায়। দরকার হলে আজই তা হাওয়ায় ঘোরাতে থাকত। মারত কারও পিঠে, লাগত নিজেদের হাঁটুতে। দরকার-মতো নিশানা ঠিক হওয়া উচিত।"

বৈদ্যজী পেছন থেকে বললেন, "খেলাধুলারও গুরুত্ব আছে প্রিন্সিপালসাহেব। ছোটে অন্যায় কিছু বলে নি।"

প্রিন্সিপাল হেঁ হেঁ করে প্রেমিকার মতো ছোটে পালোয়ানের দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পালোয়ান ব'লে কথা, ঠাট্টা নয়। তিনি কি কখনও অন্যায় কিছু বলতে পারেন!"

পনেরো

গ্রামের বাইরে বেশ লম্বা-চওড়া একটা মাঠ আছে। মাঠটা আস্তে আস্তে উষর হয়ে যাচ্ছে। এখন তাতে এক চিলতে ঘাসও জন্মায় না। দেখেই মনে হয়, আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদানযজ্ঞে দেবার উপযুক্ত জমি এটা। সত্যিই তা-ই। দু বছর আগে এই মাঠটা ভূদান আন্দোলনে দান করা হয়েছিল। সেখান থেকে তা আবার দানের আকারে গ্রামসভার কাছে ফিরে এল। তারপর গ্রামসভা তা প্রধানকে

দান করল। প্রধান প্রথমে তা তাঁর আত্মীয় আর বন্ধুবান্ধবদের দান করলেন, তারপর যেটুকু বাঁচল সেটুকু সোজা বেচাকেনার সিদ্ধান্ত করে কয়েকজন গরিব আর ভূমিহীনকে দিলেন। পরে জানা গেল যে, যে অংশ এইভাবে গরিব আর ভূমিহীনদের দেওয়া হয়েছে তা মাঠের মধ্যে ছিল না, ছিল অন্য এক চাষীর সীমানার মধ্যে। তাই এ নিয়ে মামলা-মকদ্দমা হ'ল। সেই মামলা-মকদ্দমা এখনও চলছে এবং চলতে থাকবে বলেই মনে হচ্ছে।

যা-ই হোক, ভূদানযজ্ঞের ধোঁয়া সারা মাঠটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মাঠটা ফসলের ক্ষেত হয়ে গেছে। তার প্রমাণ, প্রতি পদক্ষেপে আল বাঁধা হয়েছে। তার ওপর বাবলার ডাল ফেলা হয়েছে। জল-সার-বীজ এ-সব ছাড়াই কেবল ইচ্ছাশক্তির জোরে এই জমিতে গত বছর থেকে জোরালভাবে চাষ-আবাদ হচ্ছে। আর কেবল অঙ্ক দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, অন্যান্য বছরের চেয়ে গত বছর গ্রামসভায় বেশি ফসল করছে। গ্রামের পশুরা এই মাঠটাকে তাদের পুরনো চারণভূমি মনে করে এখনও মাঝে মাঝে এখানে আসে। তার ফলে চাষীদের মধ্যে গালিগালাজ, মারপিট, থানা-আদালত ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। তাই পশুদের এদিকে প্রবেশ করা ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মাঠে এখন প্রায় সময়েই নিস্তব্ধতা বিরাজ করে, আর মানুষ যদি আশাবাদী হয় তা হলে এখানে এলেই তার মনে হবে, এই নিস্তব্ধতার মধ্যেই উন্নতির বিউগ্‌ল্‌ বাজবে।

মাঠের কোণে বনসংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কিছু কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। সেই কর্মসূচী চলছে কি চলছে না, তা বিতর্কের বিষয়। তবে দেখতে অবশ্যই পাওয়া যায় যে, এখানে অনেক নালা

খোড়া হয়েছে। আর শুনতেও পাওয়া যায় যে, সেগুলোর মধ্যে বাবলার বীজ বোনা হয়েছে। আবার এ-ও শোনা যায় যে, এখানকার লোকেরা যদি গেঁয়ো না হ'ত, প্রতিবেশী গ্রামবাসীদের মতো উদ্যমী হ'ত তা হলে এখানে এই উষর মাঠেও বাবলার জঙ্গল ঝলমল করে উঠত। কিন্তু খারাপ মাটির দরুন নালাগুলোর মধ্যে বাবলাগাছ একটাও জন্মায় নি, আর পুরো কর্মসূচীটা থেকে শিবপালগঞ্জের এটুকু লাভ হয়েছে যে, এই নালাগুলোকে লোকে সর্বজনীন শৌচালয় হিসাবে ব্যবহার করতে পারছে। এইভাবে যে স্কীম একদিন জঙ্গলের জন্য তৈরি হয়েছিল তা এখন ঘরের স্কীমে পরিণত হয়েছে।

এই মাঠটার অন্য দিকে একটা বটগাছ আছে। গাছটা যেন সমগ্র উষরতার ওপর বলাৎকার করছে। গাছটার ধারে একটা কুয়ো আছে। রঙ্গনাথ কুয়োর পাড়ে একা বসে আছে।

ভারতে লেখাপড়া জানা লোকেরা কখনও কখনও একটা রোগে আক্রান্ত হন। রোগটার নাম "ক্রাইসিস অভ্ কন্শন্স্"। কোনো কোনো ডাক্তার তার মধ্যে "ক্রাইসিস অভ্ ফেথ" নামে আর-একটা রোগও বেশ সুন্দরভাবে খুঁজে বার করে থাকেন। লেখাপড়া-জানা লোকদের মধ্যে এই রোগটায় বেশির ভাগ তাঁরাই কষ্ট পান যাঁরা নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে পরিচয় দেন এবং কার্যক্ষেত্রে বুদ্ধিবলে নয়, বরং আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন ইত্যাদির সাহায্যে বেঁচে থাকেন (কারণ, কেবল বুদ্ধির সাহায্যে বেঁচে থাকা একটা অসম্ভব কথা)। এই অসুখে রুগী মানসিক চাপ আর নিরাশাবাদের গণ্ডগোলে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়, জোরাল তর্ক করে, বুদ্ধিজীবী হওয়ার দরুন নিজেকে রুগী আর রুগী হওয়ার দরুন নিজেকে বুদ্ধিজীবী বলে প্রমাণ

করে, এবং শেষে এই রোগের পরিসমাপ্তি ঘটে কফিহাউসের তর্ক-বিতর্কে, মদের বোতলে, নষ্ট মেয়েমানুষের বাহুবন্ধনে, সরকারী চাকরিতে, আর কখনও কখনও আত্মহত্যায়।

রঙ্গনাথ যেদিন কলেজের ম্যানেজার নির্বাচন দেখেছে সেদিন থেকেই সে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। বৈদ্যজীকে দেখলেই হঠাৎ তার সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়, নির্বাচনের পর বর্শাবেঁধা শুওরের মতো চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিতে দিতে প্রিন্সিপালসাহেব যখন কলেজের বাইরে এসেছিলেন তখনকার দৃশ্য। রঙ্গনাথের মনে হতে লাগল, বৈদ্যজীর সঙ্গে থেকে সে যেন কোনো ডাকাতদলের সদস্য হয়ে গেছে। প্রিন্সিপালসাহেব যখন তার কাছে দেঁতো হাসি হেসে কোনো মুখরোচক গল্প বলেন— এরকম গল্পের অভাব নেই তাঁর ভাণ্ডারে— তখন তার মনে হয়, এই লোকটা যে-কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারও গলা টিপে ধরতে পারে।

এটা শহর হলে সে কফি হাউসে বসে বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই নির্বাচন সম্বন্ধে একটা লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিতে পারত। তাদের বলতে পারত, কীভাবে পিস্তলের জোরে ছঙ্গামল বিদ্যালয় ইণ্টার কলেজের ম্যানেজারি হাসিল করা হয়েছে। টেবিল চাপড়ে আরও বলতে পারত, যে দেশে এইরকম সব ছোটো ছোটো পদের জন্য এমন করা হয়, সেখানে বড়ো বড়ো পদের জন্য না-জানি কী করা হয়ে থাকে। এ-সব কথা বলার পর উপসংহারে গোটাকয়েক ভুল-ঠিক ইংরেজী কথা বলে কফির পেয়ালা খালি করে দিত আর নিশ্চিন্তে অনুভব করত যে, সে একজন বুদ্ধিজীবী, এবং গণতন্ত্রের জন্য একটা খোলাখুলি বক্তৃতা দিয়ে ও চারজন নিষ্কর্মা লোকের কাছে মনের জ্বালা বার করে দিয়ে "ক্রাইসিস অভ্ ফেথ"-কে দমন করত।

কিন্তু এটা শহর নয়, গ্রাম। রুপ্পনবাবুর কথা অনুসারে এখানে আপন বাপকেও ভরসা করা যায় না ; আর শনিচরের কথা অনুযায়ী এখানে আঙুল কেটে গেলে তাতে পেচ্ছাব করার মতো লোকও পাওয়া যায় না। তাই রঙ্গনাথ এখানে তার রোগ দমন করতে পারল না। দিন দিন তার মনে এই কথাটা দানা বাঁধতে থাকল যে, সে কোনো ডাকাতদলের মধ্যে এসে পড়েছে ; ঐ ডাকাতরা কলেজে হানা দিয়ে তাকে লুটে নিয়েছে, এবং এখন অন্য কোথাও হানা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। রঙ্গনাথের মন এখন বৈদ্যজীকে গালাগাল করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে, আর তার চেয়েও বেশি, তার মন এমন একজন লোকের সন্ধানে আকুলিবিকুলি করছে যার সামনে সে নিঃসঙ্কোচে বৈদ্যজীকে গালাগাল করতে পারে।

কিন্তু এমন লোক কোথায় পাওয়া যাবে? খান্না মাস্টার একজন লোফার। তার কাছে কোনো কথা বললে পরের দিন তা সারা গ্রামে রটে যাবে। সবাই তখন বলতে আরম্ভ করবে, বৈদ্যজীর ভাগ্নে আপন মামাকেও গালাগাল করে, আজকাল লেখা-পড়া জানা লোকেদের এই হচ্ছে শিষ্টাচার।

মালবীয় মাস্টারের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলা যেতে পারে। সে দলবাজি করলেও লোক ভালো। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলে আরাম পাওয়া যায় না

তা হলে আর কে আছে? রুপ্পনবাবু?

রুপ্পনবাবুর ওপর রঙ্গনাথের কিছু ভরসা আছে, কারণ রুপ্পন-বাবু মাঝে মাঝে প্রিন্সিপালকে গালাগাল করে কলেজের দুরবস্থার কথা বলেন। তাঁর অভিযোগ, প্রিন্সিপাল লেখাপড়ার ব্যাপারে মূর্খ হলেও দুনিয়াদারিতে বড়ো ওস্তাদ, পাকা ফন্দিবাজ ; তাঁর

বাবাকে ফাঁসিয়ে এমন অবস্থায় ফেলেছে যে, সমস্ত কাজ সে নিজের ইচ্ছামতো করে, কিন্তু তাঁর বাবা মনে করেন, তাঁর ইচ্ছা-মতোই কাজ হয়। খান্না মাস্টারকে সে সব সময় কঠোরভাবে দাবিয়ে রাখে। খান্না মাস্টার যতই নির্বোধ হোক, তাকে এইভাবে দাবিয়ে রাখা ঠিক নয়, কারণ একজন নির্বোধ তাঁর বাবার সাহায্য নিয়ে আর-একজন নির্বোধকে মারবে, এটা উচিত নয়।...

রঙ্গনাথ এখানে বটগাছের নিচে কুয়োর পাড়ে বসে নিশ্চিন্তে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল, কারণ অনেকদিন পর আজ প্রথম তার রোগটা তাকে কষ্ট দিচ্ছে না। ব্যাপার হয়েছে, আজ সে সাহস করে রুপ্পনবাবুর কাছে তার আত্মসংকটের কথা খুলে বলেছে। পরিষ্কারভাবে সে বলে দিয়েছে যে, মামার এ কাজ করা উচিত হয় নি। পিস্তলের জোরে ম্যানেজারি পেলেও চারদিকে তাঁর বদনাম তো হয়েছে।

রুপ্পনবাবু তাঁর ডাণ্ডামার ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছেন, "দেখো দাদা, এটা পলিটিক্স। এতে অনেক বড়ো বড়ো নীচতা চলে। এ তো কিছুই হয় নি। বাবা যে পথে আছেন তাতে এর চেয়েও বেশি কিছু করার দরকার হয়। শত্রুকে, তা সে যেমন করেই হোক, চিত করতেই হবে। তিনি চিত করতে না পারলে তাঁকেই চিত হয়ে যেতে হবে আর বসে বসে হজমীগুলি বাঁধতে হবে; কেউ ডেকেও জিজ্ঞাসা করবে না। কিন্তু তবু এ কলেজে সংস্কারের দরকার আছে। প্রিন্সিপাল একটা হারামি। দিনরাত দলবাজির ফিকিরে আছে। খান্না মাস্টারও একটা উল্লুক। কিন্তু তিনি হারামি নন। প্রিন্সিপাল শালা তাঁকে অনেক দাবিয়ে রেখেছে। এখন খান্না মাস্টারকে উদ্ধার করা উচিত। আমি বাবার সঙ্গেও

কথা বলেছি, কিন্তু তিনি প্রিন্সিপালকে সরাতে চান না। আমি ঠিক করেছি, কিছুদিন বাবাকে কিছু বলব না, কেবল আস্তে করে খান্না মাস্টারকে উস্কে দেব। তাতে প্রিন্সিপাল চিত হয়ে যাবে। ও শালা বড়ো ফুলে গেছে, ওকে ফাটানো দরকার। একবার চিত হলে বাবাও দেখতে পাবেন, ও কত ওস্তাদ।...”

রঙ্গনাথ এইজন্যই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। এতটা তো সে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, রুপ্পনবাবুর সঙ্গে সে এ-বিষয়ে কথা বলতে পারে! এটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রুপ্পনবাবুর কাছে সে খান্না মাস্টারের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারে, যে পড়ে গেছে তাকে উদ্ধার করতে পারে, যে ফুলে উঠেছে তাকে ফাটিয়ে দিতে পারে।

জানুয়ারির অর্ধেকের বেশি শেষ হয়ে গেছে। এরপর ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রামসভার নির্বাচন হবে। তারপর মার্চ মাসে হাইস্কুল আর ইণ্টারমিডিয়েটের পরীক্ষা। এই নির্বাচন একদিকে শনিচর আর বদ্রী পালোয়ানের আখড়াকে আর অন্যদিকে রামাধীন ভিখমখেড়বী ও তার জুয়াড়ী সেনানায়কদের গণতন্ত্রের সেবায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে। এই সেবার এখনও পর্যন্ত প্রধান যে রীতি দেখা যাচ্ছে তাতে দু দলই পরস্পরের পেছনে চিৎকার করে গালাগাল দিচ্ছে; আশা করা যায় ফেব্রুয়ারি মাসে তা সামনাসামনিই হবে। মার্চ মাসে যে পরীক্ষা হবার কথা আছে তা কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে ফাঁসাতে পারে নি। ছাত্র, অধ্যাপক আর বিশেষ করে প্রিন্সিপালসাহেব সকলেই এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

কিন্তু প্রিন্সিপালসাহেব অন্য একটা ব্যাপারে ফেঁসে গেছেন। কিছুদিন আগে কলেজ কমিটির বার্ষিক বৈঠকে বৈদ্যজীকে যে

একবাক্যে দ্বিতীয় দফায় ম্যানেজার নির্বাচন করা হয়েছে, কয়েকজন মেম্বার এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অভিযোগ পাঠিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, বিরোধী সদস্যদের বৈঠকে আসতেই দেওয়া হয় নি, পিস্তল দেখিয়ে তাঁদের ধমকানো হয়েছে। অভিযোগে এ-সব কথা এমন বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে যে, তা পড়া প্রায় অসম্ভব মনে হয়। পড়লেও বিশ্বাস করা কঠিন, কারণ তার ভাবার্থ এই যে শিবপালগঞ্জে আইন-কানুন ধুয়েমুছে গেছে। এখানে থানাপুলিস বলে কিছু নেই, জন চারেক গুণ্ডা মিলে যা খুশি তা-ই করতে পারে। এটা স্পষ্ট যে, এ কথা মিথ্যে মনে করার জন্য কোনো রকম যাচাইয়ের দরকার নেই। তবু কয়েকজন বিরোধী মেম্বার শহরে গিয়ে শিক্ষা বিভাগের সমস্ত বড়ো বড়ো অফিসারকে অভিযোগের নকল দিয়েছেন এবং ফিরে এসে তাঁরা সারা গ্রামে প্রচার করে দিয়েছেন যে, ডেপুটি ডাইরেক্টর অব এডুকেশন নিজে সমস্ত ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবেন। ডেপুটি ডাইরেক্টর এমনিতে খুব নরম মানুষ, কিন্তু এবার বৈদ্যজীর বাবাও তাঁকে কাবু করতে পারবেন না, কারণ সত্যিকারের তদন্ত করার জন্য ওপর থেকে হুকুম হয়েছে।

প্রিন্সিপালসাহেবকে ফাঁসানোর জন্য এটুকুই যথেষ্ট। তিনি জানেন, তদন্তের ব্যাপারটা বৈদ্যজী নিজে সামলাবেন; কিন্তু ঐ তদন্তের জন্য যে-সব হাকিম আসবেন তাঁদের দেখাশোনা প্রিন্সিপালসাহেবকেই করতে হবে। হাকিমরা যখন কলেজে আসবেন তখন সবচেয়ে আগে তাঁরা কী দেখবেন? প্রিন্সিপাল নিজেই জবাব দিলেন: ইমারত।

সেই কারণে তিনি এখন ইমারতের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।

প্রিন্সিপালসাহেব শহরে দেখেছেন, যদি ছোটো একটা চারা লাগিয়ে তার চারদিকে ইঁট দিয়ে ঘিরে দেওয়া যায় আর তা লাল-হলুদ-সাদা রঙ দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া যায় তা হলে অসম্পূর্ণ মাঠ নিঃসন্দেহে বাগানের মতো দেখায়।

প্রিন্সিপালসাহেব স্থির করলেন, কলেজের ইমারতের সামনে এক সারি কৃষ্ণচূড়া আর বাঁদর-লাঠি লাগাতে হবে, এবং হাকিমদের আসার আগেই ইঁটের রঙবেরঙের ঘেরা দিয়ে সাজাতে হবে। আসার সময় চোখের সামনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রঙবেরঙের ইমারত দেখলে আর যাবার সময় পেটের মধ্যে ফার্স্ট ক্লাস চা আর জলখাবার পেলে আমার বিরুদ্ধে কে কী লিখবে? প্রিন্সিপালসাহেব এ কথা চিন্তা করে জানুয়ারির বাদবিচার ছেড়ে সব ঋতুতেই গাছ লাগানো যায়, এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করে তাঁর কাজে লেগে গেলেন।

প্রিন্সিপালসাহেব কলেজের চারদেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে কয়েকটা গর্ত খোড়াচ্ছিলেন। তাঁর হাতে একটা মোটা চকচকে বই। বইটা দেখেই মনে হয়, বেশ দামী। তাঁর পরনে তাঁর কাজের পোশাক, অর্থাৎ মোজা ছাড়া জুতো আর হাফপ্যান্ট। অন্যলোকে যা-ই মনে করুক, তিনি নিজেকে এই পোশাকে বেশ চোস্ত আর চালাক মনে করে দাঁড়িয়ে আছেন। বইটাকে একটা পোষা বেড়ালের মতো সস্নেহে ধরে আছেন।

হঠাৎ খান্না মাস্টার হেলতে দুলতে এসে হাজির। প্রিন্সিপালের দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "এই নিন।"

প্রিন্সিপালের পাশে আর-একজন মাস্টার দাঁড়িয়ে ছিলেন, প্রিন্সিপালেরই খুড়তুত ভাই। প্রিন্সিপাল সাহায্যের জন্য একবার

তাঁর দিকে তাকলেন। তারপর গর্তের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন, যেন অফিসার হয়ে গেছেন। বললেন, "কী এটা?"

"কী আবার! কাগজ।"

প্রিন্সিপাল বুক টান করে দাঁড়িয়ে কোটরে বসা চোখ দিয়ে কাগজটা দেখতে লাগলেন। খান্না মাস্টার হিতৈষীর মতো বললেন, "দিন, পড়ে দিই।"

প্রিন্সিপাল অবজ্ঞাভরে বললেন, "যান, নিজের কাজ করুন। আমাকে পড়াবার চেষ্টা করবেন না।"

খান্না মাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "এ জন্মে পড়ানো থেকে মুক্তি কোথায়!"

প্রিন্সিপালের খুড়তুত ভাই খান্না মাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মালিকের বাংলোর পাঁচিলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যালসেশিয়ান যেমন রাস্তার দেশী কুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রিন্সিপালসাহেব অনেকক্ষণ ধরে কাগজটাকে উলটেপালটে দেখলেন। প্রাচীনকালের ঋষি হলে এতক্ষণ কাগজটা পুড়ে ছাই হয়ে যেত। অনেকক্ষণ ধরে কাগজটাকে দেখে শেষে সেটা তিনি খান্না মাস্টারকে ফিরিয়ে দিলেন।

খান্নামাস্টার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "এ কী?"

"কী আবার! কাগজ।"—প্রিন্সিপাল কথাটা বলেই গভীরভাবে গর্ত নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

খান্না মাস্টার ঠোঁট চাপলেন। গলার স্বর সংযত করে বললেন, "যা-ই হোক-না কেন, লিখিত আবেদনপত্রের ওপর আপনাকে লিখিত আদেশ দিতে হবে।"

প্রিন্সিপাল একজন মজুরের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন। বলছিলেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন বন্ধ করো। আরে, গর্ত খুড়ছ, গর্ত। কুয়ো খুড়ছ না। যথেষ্ট হয়েছে।"

খান্না মাস্টার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, "আমাকে চারদিনের জন্য বাইরে যেতে হবে। ছুটি চাই। আপনাকে লিখে হুকুম দিতে হবে।"

প্রিন্সিপালসাহেব হাতে ভর দিয়ে অনায়াসেই গর্তের ভেজা মাটির ওপর বসে পড়লেন। লোকে দেখুক, কলেজের উপকারের জন্য তিনি নালায় গড়াগড়ি খেতেও সংকোচ বোধ করেন না। মজুরদের তিনি গর্তের পাড় সম্বন্ধে আদেশ দিতে লাগলেন।

খান্না মাস্টারের কথাগুলো তাঁর কাছে আবহ সংগীতের মতো মনে হ'ল। খান্না মাস্টারও হাতে ভর দিয়ে গর্তের অন্য ধারে বসে পড়লেন। বললেন, "আমার কথার জবাব দিন, তারপর গর্তের মধ্যে লাফাবেন।"

প্রিন্সিপাল এতক্ষণ পর খান্না মাস্টারের দিকে সোজাসুজি তাকালেন। বললেন, "গর্তের মধ্যে লাফাব তো নিশ্চয়, কিন্তু আগে তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে তারপর তোমার ওপর লাফাব। বুঝেছ খান্না মাস্টার!"

প্রিন্সিপাল তাঁর খুড়তুত ভাইয়ের দিকে তাকালেন। খুড়তুত ভাই অত্যন্ত নম্র স্বরে বললেন, "আমি চাপরাসীদের ডেকে আনছি। ঝগড়া হবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রিন্সিপালসাহেব, আমার অনুরোধ ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কিছু বলবেন না।"

"আমি আর কী বলব ভাই, আমি তো সব চুপ করে সহ্য করে আসছি। যেদিন এঁর ঘড়া ভরে যাবে সেদিন আপনা থেকেই ফট্ করে ফেটে যাবে।"

প্রিন্সিপাল খান্না মাস্টারকে যেন অভিশাপ দিলেন। খান্না মাস্টার খুব ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর ভয় হ'ল, প্রিন্সিপাল না চিৎকার করে বসেন যে, খান্না তাঁকে মারছে। আবার মামলায় ফেঁসে না যায়! খান্না মাস্টার চুপচাপ গর্তের কাছ থেকে উঠে দূরে অন্য একজন মাস্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বেশ জোরে, যাতে সারা তুনিয়া শুনতে পায়, এমনভাবে বললেন, "ধমকাবেন না মাস্টার-মশায়, নবাবীর যুগ চলে গেছে। এত সহজে খান্নার প্রাণ বেরুবে না, আপনাকে বলে দিচ্ছি। আমার গায়ে হাত দিলে খুন হয়ে যাবেন, এই আমি বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ।"

খান্না চিৎকার করতে চান নি, হৈ-চৈ বাধাবার কথা ভাবতে ভাবতে শেষে সত্যি সত্যি হৈ-চৈ বাধাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন মাস্টার চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন।

খান্না মাস্টার হঠাৎ আবার চিৎকার করে উঠলেন, "মারুন, মারুন-না আমাকে। ডাকুন চাপরাসীদের। তাদের হাত দিয়েই বেইজ্জত করান। কী, থামলেন কেন?"

তামাশা হচ্ছে, এ কথাটা বুঝতে পেরেই তু দলেরই কয়েকজন মাস্টার সুযোগ বুঝে এসে দাঁড়িয়েছেন। ছেলেরা এখনও বেশি আসে নি। যারা এসেছিল, চাপরাসীরা তাদের ধমকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। পরিস্থিতি অনুসারে এই তামাশা "কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য" রয়ে গেল।

প্রিন্সিপালসাহেব এই ব্যাপারে প্রথমে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, পরে রাগের ওপর লাগাম লাগিয়ে খান্না মাস্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর হাত থেকে ছুটির দরখাস্তটা টেনে নিয়ে ঠাণ্ডা

সুরে বললেন, "চেঁচিয়ো না খান্না মাস্টার। তুমি ভুল বুঝেছ। দাও, তোমার দরখাস্তে হুকুম লিখে দিচ্ছি।"

ইশারা পাওয়ামাত্র তাঁর খুড়তুত ভাই তাঁর হাতে একটা ফাউণ্টেন-পেন ধরিয়ে দিলেন। বাগান-সংক্রান্ত বইটার ওপর দরখাস্তটা রেখে তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন। লিখতে লিখতে বললেন, "আমাদের লড়াই নীতির লড়াই, এর মধ্যে মারপিটের কথা আসছে কেন? শান্তভাবে কাজ আদায় করা উচিত।"

খান্না মাস্টার নিজেই তাঁর তামাশায় বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন, "আগে এই কাগজে হুকুম লিখুন, পরে অন্য কথা হবে।"

প্রিন্সিপাল মুচকি হেসে বললেন, "তা-ই তো করছি।...নাও।"

কয়েকটা শব্দের ওপর তিনি গুণের চিহ্ন বসিয়ে কেটে দিলেন, কয়েকটার ওপর গোল বৃত্ত বানালেন। সবশেষে ইংরেজীতে লিখলেন—"খারিজ।"

খান্না মাস্টার কিছু বলতে পারার আগেই তিনি দরখাস্তটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "স্পেলিংয়ে বড়ো কাঁচা। 'হলিডে'-তে 'এল'-য়ের পরে 'ওয়াই' লেখা হয়েছে। 'খান্না'-য় বোঝা যাচ্ছে না, 'কে' ক্যাপিটাল, না স্মল। এ-সব একটু দেখা উচিত।"

একটুক্ষণ হতবাক্ থাকার পর খান্না মাস্টার গণ্ডারের মতো মুখব্যাদন করে আওয়াজ বার করলেন, "বেরোও কলেজের বাইরে, ওখানেই তোমাকে সমস্ত স্পেলিং মনে করিয়ে দেব।"

আবার লড়াই শুরু হয়ে গেল।

এ-সব সকালের কথা। দুপুর পর্যন্ত দু পক্ষই থানায় গিয়ে রিপোর্ট

লিখিয়ে এলেন। রিপোর্ট দেখে মনে হবে, মাস্টাররা দাঙ্গা করেছেন, পরস্পরকে খুন করতে চেয়েছেন। এই খুন করায় বাধা দেবার কেউ ছিল না, সুতরাং তাঁরা সত্যিসত্যিই নিজেদের শত্রুদের কেন খুন করলেন না সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না। পুলিস এই দোষটা ধরে উলটো দিক থেকে ব্যাপারটা তদন্ত করতে শুরু করে দিল।

ঐদিন দুপুরেই বৈদ্যজীর বৈঠকখানায় এই ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হ'ল। ওখানে সাধারণ লোকেরা এই রায় দিল যে, ঘটনাটা আরও একটু গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল, অর্থাৎ স্বপক্ষের কারও যদি হাড় না ভেঙে থাকে তো আপত্তি নেই, কিন্তু রক্ত বেরুবার মতো আঘাত অন্তত লাগা উচিত ছিল। তাতে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আরও ভালো মকদ্দমা হতে পারত। শনিচর ভাবল, গ্রামপ্রধান হবার আগে নেতাগিরির একটা কাজ করে নেওয়া যাক। তাই সে বিনা ফীয়ে সার্ভিস অফার করল। বলল, "প্রিন্সিপালসাহেব চাইলে আমি তাঁর হাতে বর্শা বিঁধিয়ে রক্ত বার করে দিতে পারি। এখনও খারাপ কিছু হয় নি, এটাও খান্নার নামে লেখা হবে।"

কিন্তু ছোটে পালোয়ান তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন।

ঐদিন দুপুরে রঙ্গনাথ আর রুপ্পনবাবু সমস্ত ব্যাপারটা চুপচাপ শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। এই না বলাটা শিবপালগঞ্জে একটা নির্বোধের লক্ষণ। আসলে রঙ্গনাথ আর রুপ্পনবাবু দুজনেই ভেতরে ভেতরে প্রিন্সিপালের ওপর জ্বলতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে রুপ্পনবাবু বাইরে এসে বললেন, "এই শালা বাবাকে এখন কাছারির রাস্তায় নিয়ে চলেছে, পরে তাঁকে জেলে নিয়ে গিয়ে ছাড়বে।"

ঐদিন দুপুরে বৈদ্যজী গম্ভীরভাবে প্রিন্সিপালের কাছ থেকে খান্না মাস্টারের ঘটনাটা শুনলেন। সমস্তটা শোনার পর এমন একটা কথা বললেন, যার সঙ্গে এই ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি বললেন, "জেলা বিদ্যালয়-পরিদর্শকের ধর্ম দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। গত মঙ্গলবারে আমি শহরে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম, একজন লোক হনুমানজীর মন্দিরে মাটিতে সাষ্টাঙ্গে লুটোচ্ছে। পরে যখন সে উঠে দাঁড়াল, আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। তিনি আমাদের বিদ্যালয়-পরিদর্শক। তাঁর দুচোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আমি নমস্কার করলাম, প্রতিনমস্কার করে তিনি ভরা গলায় "হাউ-হাউ"-য়ের মতো কী একটা বললেন। তারপর আবার চোখ বুজলেন। —মোষের ভালো ঘি নিয়ে যাবেন চার-ছ সের। এমন ধার্মিক লোক বনস্পতি খেয়ে তাঁর ধর্ম নষ্ট করছেন। —এ-সব সময়ের লীলা!"

পুরনো একটা শ্লোকে বেশ ভালো ভূগোল বোঝানো হয়েছে: সূর্য কোনো দিকের অধীন হয়ে উদয় হয় না, যেদিকে সূর্য উদয় হয় সেই দিকটাই পূর্ব দিক হয়। সেইরকম ভালো সরকারী চাকুরে কাজের অধীন হয়ে কোথাও সফরে যায় না, যেদিকে সে বার হয় সেইদিকেই তার সফর হয়ে যায়।

এই নতুন সৌর সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐদিনই বিকেল প্রায় চারটের সময় একজন মহাপুরুষ শহর থেকে মোটর ছুটিয়ে দেহাতের দিকে এলেন। রাস্তার দুধারে প্রজাদের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে নিজেকে তিনি এই বলে ধন্যবাদ দিলেন যে, তাঁর গত বছরের বক্তৃতার দরুন এ বছর রবি ফসল ভালো হবে। চাষীরা তাঁর নির্দেশিত পথে চাষ করছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, জমি চাষ করা উচিত আর

তাতে কেবল সারই নয়, বীজও ফেলা দরকার। তিনি সমস্ত-কিছু বুঝতে লাগলেন, আর এই নতুন বোঝার ফলে আগের সব চিন্তা দূর হয়ে গেল। চাষীরা প্রগতিশীল হচ্ছে, এবং সংক্ষেপে, তারা এই ব্যাপারে এত পিছিয়ে আছে যে, আজও চাষীই আছে।

মোটর দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে, আর আঁকাবাঁকাভাবে যারা পথ চলছিল, ঝোড়ো পাতার মতো তারা উড়ে উড়ে রাস্তার ধারে চলে যাচ্ছে। মহাপুরুষটি আবার এই বলে নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন যে, এমন আলসে লোকেরা তাঁর ছুটন্ত মোটরের প্রভাবে এত চটপটে হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এত চালাকও হয়ে পড়েছে যে, এইরকম জোরে ছুটন্ত মোটরের নিচে তাদের কারও একটা আঙুলও চাপা পড়ে নি। পরিতৃপ্তির সঙ্গে তিনি আপন মনে আবার ভারতবর্ষকে বললেন, "সাবাস! তোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।"

গাড়ি ছঙ্গামল বিদ্যালয় ইণ্টার কলেজের সামনে দিয়ে চলে গেল। আণ্ডারওয়্যারের ওপর বুশশার্ট আর ডোরাকাটা পায়জামার ওপর বেনিয়ান ছাড়া জামা পরা কয়েকটা ছেলে কালভার্টের ওপর বসে ছিল, ছু দিক থেকে তারা তিতিরের মতো কথা বলছিল। এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে ছেলেগুলোকে দেখেই তিনি তাদের বোকামিতে বুঝে ফেললেন যে, তারা ছাত্র।

গাড়িটা প্রায় এক ফার্লং মতো এগিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ মহাপুরুষের মনে পড়ল, গত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি একবারও ছেলেদের বক্তৃতা দেন নি। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল: 'এইসব ছেলেদের জন্য আমি কোন্ কষ্ট সহ্য না করেছি। এদেরই জন্য আমি গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে বাংলো নিয়েছি। গ্রামে পুকুরের পাড়ে বসার বদলে সকাল-সন্ধ্যা ছোটো একটা ঘরে বসার অভ্যাস করেছি!

নিজেই নিজেকে এতখানি বদলে ফেলেছি', তো যেই তাঁর মনে পড়ল, গত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি তাঁর এই-সব প্রিয় ছেলেদের কাছে বক্তৃতা দেন নি অমনি তিনি ভাবলেন: 'অ্যাঁ! এতক্ষণ আমি লেকচার না দিয়ে থেকেছি! আমার মনের মধ্যে এত-সব বড়ো বড়ো চিন্তা উঠেছে, আর আমি স্বার্থপরের মতো তা আমার মনের মধ্যেই গুটিয়ে রাখছি! হায়! আমি কত কৃপণ! ধিক্ আমাকে, এদেশে জন্মেও আমি এতক্ষণ মুখ বুজে আছি।'

আটচল্লিশ ঘণ্টা! আশ্চর্য হয়ে তিনি ভাবলেন: '2880 মিনিট! একে ষাট দিয়ে গুণ করলে যত হয় তত সেকেণ্ড! কত সেকেণ্ড? এই সময়ের মধ্যে ছেলেদের উৎসাহ দেবার জন্য আমি একটা লেকচারও দিই নি! কী হ'ল আমার? আমার পক্ষাঘাত হয় নি তো?'

এক পলকের মধ্যে তিনি এত-সব কথা ভেবে নিলেন, তারপর ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, "গাড়ি ঘোরাও। আমি এই কলেজে আকস্মিক পরিদর্শন করব।"

তিনি কলেজে আসতেই ছুটি হয়ে গেল। ছেলেরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে মাঠে গিয়ে বসল! স্থানীয় হাকিম, বাগানে কড়ি দিয়ে যারা জুয়া খেলছে, তাড়িখানায় যে-সব মন্দলোক বসে আছে— তারাও কথায় কথায় এল। ভালো মিটিং হয়ে গেল। তারা না এলেও মিটিং হ'ত। বক্তার যদি লজ্জা না থাকে তা হলে ল্যাম্প পোস্টই যথেষ্ট, একাই মিটিং করতে পারে। কিন্তু এখানে সত্যিসত্যিই মিটিং হ'ল। ছেলেদের দিয়ে একটা সুবিধা আছে যে, তারা ভেতরে থাকলে কলেজ হয়, বাইরে এলে মিটিং হয়।

মহাপুরুষ ছেলেদের বললেন, তারা দেশের ভবিষ্যৎ; মাস্টারদের

বললেন, তাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ-নির্মাতা। ছেলেরা আর মাস্টাররা কথাটা আগে থেকেই জানতেন। ছেলেদের তিনি ধমকালেন যে, তাদের মধ্যে সংযমের অভাব ; তারা আটচল্লিশ ঘণ্টা তো দূরের কথা, আট ঘণ্টাও চুপ করে থাকতে পারে না। তারপর মাস্টারদের ধমকালেন যে, তাঁরা তাদের সংযম শেখান না। তিনি অভিযোগ করলেন যে, ছেলেরা জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানে না আর মাস্টাররা তা জেনেও মহার্ঘ ভাতা আর বেশি মাইনে চান। মাস্টার আর ছাত্ররা নিজেদের সম্বন্ধে কিছু ভাবার আগেই তিনি এমন এক প্রসঙ্গ তুললেন, যা প্রত্যেক বক্তা প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবশ্যই তোলেন।

তিনি বললেন, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি খারাপ, এই শিক্ষা পেয়ে লোক কেবল কেরানি হতে চায়। ছেলেদের তিনি বোঝালেন, এই শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন দরকার। কয়েক শো বিদ্বান আর কয়েক হাজার সমিতির কথা উদ্ধৃত করে তিনি বোঝালেন যে, আমাদের:শিক্ষাপদ্ধতি খারাপ। তিনি বিনোবার, এমন-কি গান্ধীর কথাও উল্লেখ করলেন। তখন কলেজের ম্যানেজার বৈদ্যজীও মাথা নেড়ে বললেন, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি খারাপ। তারপর প্রিন্সিপাল, অন্য-সব মাস্টার, আর বাজারের যত ভবঘুরে আর বদমায়েস লোক তারাও মাথা নেড়ে এ কথায় সায় দিল। তার কথায় তাড়িখাওয়া মাতাল আর জুয়াড়ীদের পর্যন্ত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি খারাপ।

তিনি বললেন, শিক্ষাক্ষেত্রে গত শতাব্দীর এটা সবচেয়ে বড়ো দান যে, আমরা এত তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি খারাপ। তারপর তিনি ছেলেদের উপদেশ দিলেন,

চাষ করা উচিত, দুধ খাওয়া উচিত, স্বাস্থ্য ভালো করা উচিত, ভবিষ্যতের নেহরু আর গান্ধী হবার জন্য তৈরি থাকা উচিত। কথাগুলো ছেলেরাও তাঁকে বলতে পারত। তারপর তিনি সমন্বয়, একতা, রাষ্ট্রভাষার প্রতি ভালোবাসা— এর প্রত্যেকটার ওপর একটা করে অনিবার্য ভাষণ দিয়ে, কলেজের সমস্যাবলী বিচার করে দেখার বার্ষিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মেওয়া মিষ্টি আর চা খেয়ে আবার সত্তর মাইলের সফরে রওনা হয়ে গেলেন।

মাস্টাররা আর ছেলেরা "ভাই ও ভগ্নীগণ" বলে ধ্বনি দিয়ে নিজের নিজের বাড়ি চলে গেল। শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করার প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য কলেজে কেবল মালী, চাপরাসী আর মজুররা রইল।

ক্লার্ক মেওয়ার প্লেটের দিকে একবার তাকাল। প্লেটের ওপর এক টুকরো কাজু বাদাম পড়ে আছে। তার ইচ্ছে হ'ল, ওটা সে মুখের ভেতর ফেলে দেয়, কিন্তু শেষে কী ভেবে নালার মধ্যে ফেলে দিল।

ষোলো

বদ্রী পালোয়ান বাইরে কোথায় যেন গেছেন। তাই রঙ্গনাথ আজ ছাদে একা। কয়েকদিন হ'ল বেশ শীত পড়েছে। শীতের আরামটা

বেশ ভালো করে উপভোগ করার জন্য বদ্রী তাঁর চারপায়াটা ঘরের বাইরে বারান্দায় নিয়ে গেছেন। রঙ্গনাথ ঘরের ভেতরেই শোয়।

রাত প্রায় এগারোটা। রঙ্গনাথের ঘুম আসছিল না। চারপাইয়ের পাশে একটা কাঠের বাক্সের ওপর ব্যাটারিওয়ালা একটা রেডিও রয়েছে। কাঠের বাক্সটাতে কলেজের জন্য বই এসেছিল। বইগুলো প্রিন্সিপালের বাড়িতে আর বাক্সটা মেরামত করার পর বৈদ্যজীর বাড়িতে এসেছে। রেডিওটাও কলেজের। রঙ্গনাথ এখানে আসার পর বৈদ্যজীর বাড়িতে আসা হয়েছে। রাত্রে কয়েক ঘণ্টা ছাড়া রেডিওটা সবসময়েই নির্বিবাদে বাজতে থাকে, তা সে ঘরে কেউ থাকুক আর না-ই থাকুক।

এখন রেডিওতে শাস্ত্রীয় সংগীতের একটা প্রোগ্রাম তার শেষ পর্যায়ে পোঁছুচ্ছিল। হঠাৎ গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। বেহালা আর তবলা একটা অন্যটার চেয়ে ঘণ্টায় দু শো মাইল বেগে ছুটছিল। মনে হচ্ছিল, তাদের মোটর ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ বেহালা থেকে প্রচণ্ড জোরে একটা কির্র্র্র্ আওয়াজ বেরুল। আওয়াজটা বর্শার মতো রঙ্গনাথের বুকে গিয়ে বিঁধল। ততক্ষণে তবলায় একটা বিস্ফোরণ ঘটল। সেই বিস্ফোরণ সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির ভিত পর্যন্ত নড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

রঙ্গনাথ লাফিয়ে উঠে দেখল, রেডিওটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কিনা। না, ওটা ক্যাসাব্লাঙ্কার মতো নিজের জায়গায় অটল রয়েছে, আগেরই মতো সংগীতজগতের ভয়ংকর যুদ্ধের আওয়াজ প্রচার করে যাচ্ছে। বেহালা এখন ধীর হতে শুরু করেছে আর তবলা উৎসাহ আর জিদের সঙ্গে হামলা

করতে আরম্ভ করেছে। রঙ্গনাথ ক্লান্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, তারপর রেডিও বন্ধ করে দিল।

অন্ধকার। শীতের রাত্রি তার পুরো ঐশ্বর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এমন পরিবেশে মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলেও ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। রঙ্গনাথের ভয় নয়, একটা আশ্চর্য কিছু লাগছিল, এবং সত্যি কথা বলতে গেলে সেটা ভয়েরই অপর নাম।

কিন্তু ভয়টা তার প্রচণ্ডতা নিয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিতে পারে নি, কারণ তখন সে রুপ্পনবাবুর কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, আর রুপ্পনবাবুর কথা মনে পড়তেই তার বেলা নামে একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। মেয়েটাকে রঙ্গনাথ কখনও দেখে নি। কিন্তু সে শুনেছে, রুপ্পনবাবু তাকে একটা প্রেমপত্র লিখেছেন।

রঙ্গনাথ জানে না, প্রেমপত্রটা কত লম্বা, কত চওড়া আর কত গভীর। তবে উড়ো খবরগুলো থেকে সে জানতে পেরেছে যে, তাতে সিনেমার গানের কিছু কিছু অংশ জুড়ে বাক্য তৈরি করা হয়েছে। শোনা যায়, প্রেমপত্রটা বেলার পিসিই প্রথম বাড়ির এক কোণে পড়ে থাকতে দেখেছিল। পরে সেটা গয়াদীনকে পড়তে দিয়েছিল। গোড়ার দিকে কতকগুলি লাইন পড়ে গয়াদীন কিছুই বুঝতে পারেন নি। পরে এক জায়গায় তিনি দেখলেন লেখা আছে, "আমাকে তোমার গলায় নিয়ে নাও, ও আমার সঙ্গিনী।" এটা পড়তেই তাঁর জ্ঞানের কপাট দড়াম করে খুলে গেল, তিনি বুঝতে পারলেন, প্রস্তাবটা কেউ বেলার কাছে পাঠিয়েছে। শেষ লাইন পর্যন্ত পোঁছুতে পোঁছুতে চিঠিটার আসল বক্তব্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার

হয়ে গেল, কারণ তাতে বলা হয়েছে, "আমার এই প্রেমপত্র পড়ে তুমি রাগ কোরো না, তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দেবতা।" চিঠির লেখক—"শ্রী রুঃ।"

শোনা যায়, গয়াদীন ছাড়া প্রিন্সিপালসাহেবই একমাত্র এই চিঠি দেখতে পেয়েছেন। তা-ও বোধ হয় এই কারণে যে, গয়াদীন রুপ্পনবাবুর নৈতিক উত্থানপতনের সঙ্গে, না-জানি কেন, প্রিন্সিপাল সাহেবকে যুক্ত করেছেন। প্রিন্সিপাল তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, এটা প্রেমপত্র নয়, অত্যন্ত উঁচু দরের কবিতার একটা সংগ্রহ। এর সাহিত্যিক গুরুত্ব "রুঃ" লেখার জন্য কিছু কম হয় নি। কিন্তু এই সান্ত্বনা সত্ত্বেও গয়াদীন এই লেখাপড়াকে চরিত্রহীনতার প্রমাণ বলে মনে করলেন আর প্রিন্সিপালসাহেব যখন কয়েকটি কবিতার এইরকম অংশ পড়ে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, সাহিত্যে এমন জিনিস অনেকই পাওয়া যায়, তখন গয়াদীন বললেন, "তোমাদের সাহিত্যও তোমাদের চরিত্রহীনতার প্রমাণ।" শেষ পর্যন্ত দুজনে স্থির করলেন যে, এই চিঠির কথা কাউকে বলা হবে না।

তার পরের দিনই শিবপালগঞ্জে কয়েকটা খবর রটে গেল। প্রথম খবর, খান্না মাস্টারের দলের একটা ছেলে বেলাকে প্রেমপত্র লিখেছে আর তাতে মিথ্যে করে রুপ্পনের নাম লাগিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় খবর, বেলা রুপ্পনকে প্রেমপত্র লিখেছিল আর রুপ্পন তার উত্তরে যে চিঠি পাঠিয়েছিল তা গয়াদীনের হাতে পড়েছে এবং গয়াদীনের তাতে বেইজ্জতির একশেষ। তৃতীয় খবর, যেটা সব-চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হ'ল সেটা হচ্ছে, বেলা একটা চরিত্রহীন মেয়ে।

এই তৃতীয় খবরের জাদুমন্ত্রেই রঙ্গনাথ এই সময় ভয় পাওয়া

ছেড়ে দিয়ে বেলার কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করল। সেদিন মেলা থেকে ফেরার পথে রুপ্পনবাবুর কাছ থেকে ঐ প্রেমপত্র সম্বন্ধে সে যা শুনেছিল তারপরে আর এ বিষয়ে রুপ্পনকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস রঙ্গনাথের হয় নি। এখন এই সময় রাত্রির নির্জনতায় বেলার সম্বন্ধে তার কৌতূহল নিরসনের উপায় ছিল কেবল কল্পনা, হস্ত-মৈথুন আর কুণ্ঠা, আর যেহেতু এ-সব জিনিস আমাদের শিল্পে অনেক অনুপ্রেরণা জোগায়, তাই রঙ্গনাথ এখন একজন শিল্পী হিসাবে এই সময়টাকে ধরে রেখেছে।

কেমন দেখতে সে? 'মধুমতী'তে বৈজয়ন্তীমালার মতো? 'গোদানে' শুভা খোটের মতো? 'অভিযানে' ওয়াহিদা রহমানের মতো?— না। এ-সব তো মাদার ইণ্ডিয়ার মতো। বেলা নিশ্চয়ই এখন খুব সতেজ। কিন্তু কেমন সে? জানা নেই। কিন্তু যেমনই হোক আর যা-ই হোক, "খোদার কসম লাজবাব" হবে সে। একটা সিনেমার গানের এই অংশটুকু রঙ্গনাথের গলায় হাড়ের মতো আটকে গেল। কিন্তু তবু সে মৃদু হাসল। অন্ধকারের মধ্যে খুব সুন্দর, প্রায় দেড় ইঞ্চি চওড়া একটা হাসি হাসল।

পরের দিন রাত্রেও রঙ্গনাথ ছাদে একা শুয়েছে। কিন্তু এদিন বেলার কথা তার মনে হচ্ছে না। বৈদ্যজীর রাগে উত্তপ্ত, বীরত্ব-মাখা মুখখানা তার মনে পড়ল।

সেদিন শনিচর আর কালিকাপ্রসাদের চেষ্টায় তৈরি কো-অপারেটিভ ফার্মের উদ্‌বোধন হয়েছে। উদ্‌বোধনের জন্য যে অফিসারটি এসেছিলেন, বৈদ্যজী তাঁর কাছে কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের চুরির কথা বলে ঐ টাকাটা সরকার থেকে অনুদান হিসাবে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বৈদ্যজী ঠাণ্ডা সুরে তাঁকে বুঝিয়েছিলেন

যে, সরকার যদি তা না দেন তা হলে তার অর্থ হবে এই যে, সরকারী অফিসাররা সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি চান না।

অফিসারটি বোধ হয় ডেল কার্নেগির বই পড়ে এসেছিলেন, তাই বৈদ্যজীর প্রতিটি কথায় বলছিলেন, "আপনি ঠিকই বলছেন, কিন্তু…।" এই কথাটা তিনি অন্তত সাতবার বলেছিলেন। আট-বারের বার যখন তিনি মুখ খুলে কিছু আওয়াজ বার করেছিলেন তখন তা থেকে "অনুদান আপনারা পাবেন" এমন কোনো সুরেলা সংগীত বার হয় নি, বরং ঐ পুরনো কথাটাই আবার শোনা গিয়েছিল, "আপনি ঠিকই বলছেন, কিন্তু…।"

এবার কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বৈদ্যজী দুর্বাসার ক্রোধ, হিটলারের আধিপত্য আর জওহরলাল নেহরুর বদমেজাজ একত্র করে অফিসারটির ওপর ফেটে পড়েছিলেন, "…আপনারা এইভাবে দেশের উন্নতি করবেন? এইসব 'কিন্তু', 'পরন্তু', 'তথাপি'— এ-সব কী? মশায়, এ-সব নপুংসকের ভাষা। অকর্মণ্য লোকেরা এইভাবে নিজেদের আর দেশকে বঞ্চিত করে। আপনার সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু! পরন্তু! ছিঃ!"

এরপর বৈদ্যজী দেশের দুর্দশা সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতা দেবার পরও তিনি একেবারে শান্ত হন নি, গজগজ কর-ছিলেন। অন্য-সব লোকও গজগজ করছিল। শনিচরের জলসা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই তার ওপরে এই-সব গজগজানির কোনো প্রভাব পড়ে নি। তবু শেষ পর্যন্ত সব-কিছুই গজগজানির মতো শোনাচ্ছিল।

রঙ্গনাথ শহরে থাকতে এইরকম গজগজানি সব সময়, সব জায়গায় শুনেছে। সে জানে, আমাদের দেশ গজগজ করার দেশ। অফিসে

আর দোকানে, কলকারখানায়, পার্কে আর হোটেলে, খবরের কাগজে, গল্পে আর অগল্পে, চারদিকে লোকে গজগজ করছে। এই আমাদের যুগচেতনা। এটা সে ভালোভাবেই জানে। এখানে এই গ্রামেও সে গজগজানি শুনছে। চাষী আমলা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গজগজ করছে, কর্মচারীরা জনসাধারণের থেকে নিজেদের আলাদা করে প্রথমে জনসাধারণের বিরুদ্ধে গজগজ করছে এবং পরের নিশ্বাসে নিজেকে সরকারের থেকে আলাদা করে সরকারের বিরুদ্ধে গজগজ করছে। প্রায় সবাই কোনো-না-কোনো অসুবিধার মধ্যে আছে, আর কেউ-ই অসুবিধার মূলে যায় না। অসুবিধার যে কারণই তখন দেখা যাক-না কেন, তা-ই নিয়ে গজগজ করতে আরম্ভ করে দেয়।

বৈদ্যজীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি গজগজ করেন না। আজ তিনি গজগজ করে রঙ্গনাথের মন ভেঙে দিয়েছেন। রঙ্গনাথ ভেবেছিল, প্রথমে তিনি গর্জন করবেন এবং তারপর বর্ষণ। প্রথমে তিনি গর্জন করলেন বটে, কিন্তু পরে অফিসারটি যখন লেজ নাড়ানো আর গজগজানো দুটো কাজই একসঙ্গে চালিয়ে যেতে যেতে তাঁকে আভাস দিলেন যে, কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের হিসাবের স্পেশাল অডিট করানোর দরকার হবে, তখন তিনি গজগজ করতে করতে বসে পড়লেন।

রঙ্গনাথ ভাবল, এটা গর্জন করার দেশ নয়, গজগজ করার দেশ।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা নোংরা আওয়াজ রঙ্গনাথের কানের ওপর যেন একটা চড় মারল। কুশহরপ্রসাদ তাঁর দরজায় বসে কাউকে গালাগাল দিচ্ছেন। গজগজ করনেওয়ালাদের বয়োবৃদ্ধ নেতা। কিন্তু তিনি কাঁদছেন না। তাতে বোঝা যাচ্ছে, গালাগালটা ছোটে পালোয়ানের উদ্দেশে নয়, অন্য কারও উদ্দেশে। কার উদ্দেশে,

বোঝা মুশকিল। কারণ, কুশহর যখন ছোটেকে গালাগাল না দিয়ে অন্য কাউকে গালাগাল দেন তখন তার কোনো মানে হয় না। সেটা একটা ভাবাত্মক অবস্থামাত্র। যেমন, বনে ময়ূর নাচে, কোনো কিছু উদ্‌বোধনের সময় নেতারা বক্তৃতা দেন।

আবার সেই আওয়াজ। কুশহরপ্রসাদ থেকে থেকে গর্জন করছেন আর থামছেন। গ্রামের অপর প্রান্তে একটা কুকুর ডাকছে। হঠাৎ তার কঁ্যা কঁ্যা শব্দে চোখের সামনে এমন একটা কুকুরের ছবি ভেসে উঠল, যার লেজ পেছনের দুই ঠ্যাংয়ের মাঝখানে, মুখটা বুকের সঙ্গে তেরছা হয়ে নড়ছে আর ডানদিকে কারও কাছ থেকে লাঠি খেয়ে আঁকাবাঁকাভাবে দৌড়ে পালাচ্ছে। আরও কয়েকটা কুকুর ডেকে উঠল। রামাধীন ভিখমখেড়বীর বাড়ির দিক থেকে একটা ছেলের তীক্ষ্ণ চিঁ চিঁ আওয়াজ ভেসে আসছে। কান খাড়া করে শুনলে তার মধ্যে একটা নাটকের গান শোনা যায়:

"তোমার কথা থেকে এই আমি বুঝলাম,
প্রেম তোমার এক কাঙালের সঙ্গে।"

ছেলেটা বারবার এই লাইনটাই গাইছে। গাইতে গাইতে গলা বুজে আসছে, কাঁপতে আরম্ভ করছে। দেশী মদের প্রভাবে এমনটা হতে পারে, আবার এ-ও হতে পারে যে, তার প্রিয়াকে প্রথমে একজন কাঙালের সঙ্গে প্রেম করতে হয়েছে বলে তার চোখ দিয়ে জল ঝরছে। গ্রামের চার-পাঁচটা লোফার ছেলে নিচের গলি দিয়ে এল। গয়াদীনের ওখানে চুরি হবার পর থেকে এই-সব ছেলেরা রোজ রাত্রে পাহারা দেয় আর "জাগো"-র সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নতুন স্লোগান দেয়। তারা বলে:

"জাগো।

এক সিকি চাঁদির। জয় বলো মহাত্মা গান্ধীর।" এই স্লোগান সব

স্লোগানের মতো শূন্যগর্ভ আর অর্থহীন, কারণ সিকির জায়গায় এখন পঁচিশ পয়সা চলছে। সিকি শেষ হয়ে গেছে, চাঁদি শেষ হয়ে গেছে, মহাত্মা গান্ধী শেষ হয়ে গেছেন। তারা না বুঝে শুনে, বিনা দ্বিধায় স্লোগান দেয়।

কোথায় যেন একটা ট্রেন যাচ্ছে, তার ইঞ্জিনের ক্ষীণ বাঁশির আওয়াজ ছেলেদের ঐ উঁচুনিচু স্বরকে কিছুক্ষণের জন্য পেছনে ঠেলে দিল।

ক্ষীণ আওয়াজ আর অন্ধকারের আবেশে রঙ্গনাথ কখন জানি ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের মধ্যে তার মনে হ'ল, যেন সে কোনো লিফ্‌টের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আর কয়েক তলা নিচে নেমে যাচ্ছে। হঠাৎ লিফ্‌টটা তিন-চারটে তলা একসঙ্গে পার হয়ে ওপরে চলে এল।

রঙ্গনাথ তার নাকে নারকেলের তেল আর কোনো সস্তা আতরের গন্ধ পেল। গন্ধটা সুগন্ধও না, দুর্গন্ধও না— শুধু গন্ধ। চুড়ির হালকা ঠুন্ ঠুন্ শব্দে তার ঘুমে যেন একা ধাক্কা লাগল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে সে যা অনুভব করল, সারা জীবন খাজুরাহো আর কোণার্কের শিল্প বিশ্লেষণ করেও তা অনুভব করতে পারে নি।

···মেয়েটা চারপায়ার ধার ঘেঁষে বসে আছে। তার একটা হাত রঙ্গনাথের শরীরের ওপর দিয়ে অন্য দিকে রাখা। রঙ্গনাথ বুকের ওপর দুটি স্তনের গভীর চাপ অনুভব করছে। ঐ স্তন দুটো আর রঙ্গনাথের বুকের মাঝে মেয়েটার স্তনাবরক কাপড় ছাড়া একটা মোটা লেপও আছে। কিন্তু তবু স্তনদুটোর উষ্ণতা আর দৃঢ়তা গোপন থাকতে পারে নি। রঙ্গনাথের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

রঙ্গনাথ মুখের ওপর থেকে লেপটা সরিয়ে নিল, কিন্তু তবু অন্ধকারের

মধ্যে তারা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে না। তার বুকের ওপর উষ্ণতা আর চাপ কিছুটা বেড়ে গেল। ঠিক সেই সময় তার গালের ওপর একটা নরম রেশমী গাল এসে লেগে গেল। একটা গভীর, ফোঁপানোর মতো স্বর বলে উঠল, "হায়, ঘুমিয়ে পড়েছ?"

রঙ্গনাথের ঘুম ভেঙে গেল। রঙ্গনাথ সজোরে মাথাটা নাড়াল। তারপর অস্বাভাবিক স্বরে চিৎকার করে উঠল, "কে? কে?"

মুহূর্তের মধ্যে রঙ্গনাথের বুকের সঙ্গে লাগানো স্তনদুটোর ভেতরকার ধড়ফড় বন্ধ হয়ে গেল, মেয়েটা হঠাৎ চারপায়া থেকে লাফিয়ে উঠে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর চাপা স্বরে বলল, "হায় মাগো।"

মায়ের আদর খুব ভালো জিনিস, কিন্তু এখন এই কথাটা বেরিয়েছে ভয় থেকে। রঙ্গনাথ লেপটা টান মেরে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটা এই ছাদ থেকে ঐ ছাদে, তারপর ঐ ছাদ থেকে অন্য কোনো ছাদে পৌঁছে গেছে।

রঙ্গনাথ খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শীত করছে। তবু অনেকক্ষণ সে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু বাতাসের সিরসিরানি ছাড়া আর কিছু সে শুনতে পেল না।

রঙ্গনাথ ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে আবার যখন চারপায়ার ওপর শুয়ে পড়ল তখনও সে কিছুই বুঝতে পারল না। প্রথমে শুধু এইটুকু বুঝল যে, কোণার্ক, ভুবনেশ্বর আর খাজুরাহোর নারীমূর্তিগুলো যদি পাথর থেকে বেরিয়ে রক্তমাংসের শরীর ধারণ করে তা হলে তারা অনায়াসে মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। তারপর বুঝল, পুরাতত্ত্ব আর ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে সে যত পড়াশোনা করেছে, সব অসম্পূর্ণ এবং অর্থহীন; ভারতীয় শিল্পকলায় ডক্টরেট করার চেয়ে সুরসুন্দরী পোজের দুটো জীবন্ত স্তনের স্পর্শ পাওয়া অনেক বড়ো জিনিস।

এই-সব হালকা কথা এক ধারে সরিয়ে দিয়ে আসল যে কথাটা রঙ্গনাথের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে তা হচ্ছে, 'শ্রীমান্, আপনি একটা পেঁচা। আপনার কথা বলার কী দরকার ছিল? আপনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন কেন? আপনি তাকে আরও কিছু করার সুযোগ দিলেন না কেন?··· শ্রীমান্, আপনি পেঁচা নন, গাধা। বিগত সুযোগের তালিকায় আর একটা লাইন যোগ করলেন না?··· শ্রীমান্, আপনি কিছুই নন, শুধু একজন ভারতীয় ছাত্র, যার ভাগ্যে কেবল ছবির নারীই লেখা আছে।'

রঙ্গনাথ আবার ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় ঘুম? রঙ্গনাথের একখানা হাত আপনা থেকেই তার বুকের ওপর গিয়ে পড়ল এবং সখেদে স্বীকার করল, ওখানে এখন আর কিছু নেই; শুধু তারই রুক্ষ বুক।

কিন্তু মেয়েটা কে? রঙ্গনাথ বেশি ভাবতে পারল না, কারণ তার ভাবনার পথে ছুটো পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে।

সতেরো

সকালে গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, যোগনাথকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। লোকে এই ভেবে দারুণ অবাক্ হ'ল যে, যাকে সবাই বৈদ্যজীর লোক বলে জানে তাকে স্পর্শ করার সাহস পুলিসের হ'ল

কী করে! গ্রামের গুণ্ডা আর ভালো লোক সবাই ঘাবড়ে গেল। গুণ্ডারা ঘাবড়াল এই ভেবে যে, পুলিস যখন বৈদ্যজীর গুণ্ডাদের ছাড়ল না তখন আমরা কোন্ হরিদাস পাল। আর ভালো লোকেরা এই ভেবে ঘাবড়াল যে, পুলিস যখন তাদের নিজেদের সাগরেদদের সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করছে তখন না-জানি সে রকম পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে।

পুলিসের সব গ্রেপ্তারির মতো এই গ্রেপ্তারিটাও নাটকীয় পরিস্থিতিতে হয়েছিল।

এ কথা বোধ হয় বলার দরকার নেই যে, নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টিতে পুলিসের জুড়ি নেই। দারোগাবাবু এক সময় পড়েছিলেন যে, বিপজ্জনক লোকদের গ্রেপ্তার করার সবচেয়ে ভালো সময় রাতের চতুর্থ প্রহর। সুতরাং যোগনাথ যে সবসময় শিবপালগঞ্জে ঘোরাফেরা করে এবং তাকে যে-কোনো সময় থানায় ডেকে এনে অনায়াসে ধরা যেতে পারে, এ কথাটা তিনি চিন্তা না করেই তাকে গ্রেপ্তারের সময় ঠিক করলেন ব্রাহ্মমুহূর্ত।

ভোর সাড়ে চারটের সময় পুলিস চারদিক থেকে যোগনাথের বাড়ি ঘিরে ফেলল। সবাই জানত যে, ওখানে গুলী চালাবার মতো অবস্থা দেখা দেবে না। তাই সব সেপাই-ই হাতে রাইফেল নিল। দারোগাবাবুও পিস্তলে গুলী ভরে নিলেন, এবং ফিস ফিস করে হেড কনস্টেবলকে বললেন, "কাল কানপুরের ওদিক থেকে একদল বদমাশ এখানে এসেছে। খুব সম্ভব তারা যোগনাথের বাড়িতে আছে।"

হেড কনস্টেবল বলল, "হুজুর, কানপুর থেকে যারা এসেছে তারা ভূদানের কর্মকর্তা।"

দারোগাবাবু আবার ফিস ফিস করে বললেন, "তাই তো! যারা বদমাশ তারা তো প্রথমে সাধুর বেশে ঘোরে। এখন তারা বেশ পালটে ফেলেছে।"

সেপাইরা সবাই বজরঙ্গবলীর নাম নিল, স্ত্রীপুত্রকন্যার মুখঃস্মরণ করল, তারপর অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ঐ-সব বদমাশদের মোকাবিলা করতে রওনা হ'ল। সবার মাথার ওপর কফিন বাঁধা, সবার প্রাণ হাতের মুঠোর মধ্যে, সবারই বুক ধড়ফড় করছে।

বাড়িটা ঘিরে ফেলার পর এলাহী কাণ্ড করা হ'ল। সেপাইরা সবাই খৈনি মুখে না দিয়ে, বিড়ি না খেয়ে নিজের নিজের জায়গায় পুতুলের মতো কাঠ হয়ে আধঘণ্টা বসে রইল। কেউ হাসল না, হাসালও না কেউ। একজন সেপাই জুতো খুলে হাতে ভর দিয়ে চোরের মতো এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে সবার কানে শক্তির মহামন্ত্রের মতো জপতে জপতে গেল: মনে ভরসা রাখো, কোনো বিপদ নেই। সেপাইরা সবাই সব বুঝতে পারছে। তারা জানে, কেউ বললেই আর কিছু বিপদ দূর হয়ে যায় না। তাই তারা বিপদের মধ্যেই বসে রইল। দারোগাবাবু পিস্তল আর হেড কনস্টেবল রাইফেল নিয়ে যোগনাথের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে রইল।

একটা লোক গলি দিয়ে বেরুচ্ছিল, এদের দেখেই ঘুরতে যাবে অমনি হেড কনস্টেবল হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে ডাকল। লোকটা নির্ভাবনায় চলে এল। হেডকনস্টেবল তার কানে কানে বলল, "পালাচ্ছিলে?"

লোকটা নির্ভয়ে উত্তর দিল, "পালাব কেন? সক্কালবেলা যাতে আপনাদের মুখ দেখতে না হয় তাই ফিরে যাচ্ছিলাম।"

দারোগাবাবু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে একটা শিসের মতো শব্দ বার

করলেন। হেড কনস্টেবল আবার লোকটার কানে কানে বলল, "এখানে এই চবুতরার ওপর বোসো। সাক্ষী দিতে হবে।"

লোকটা বলল, "তা বসে কী হবে? যখন দরকার হবে— কাল, পরশু, তরশু— ডাকবেন, দেব সাক্ষী। আমি তো আর বাইরের লোক নই।"

লোকটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিল, হেড কনস্টেবল তার কানে-কানে বলল, "তা হলে ঠিক আছে, যাও। কিন্তু খবরদার, আমরা যে এখানে আছি, কাউকে বোলো না যেন।"

লোকটাও হেড কনস্টেবলের কানের মধ্যে তার নাকটা ঢুকিয়ে দিয়ে ঐরকমভাবে বলল, "কাকে বলব! সারা গ্রাম জানে।"

লোকটা চলে গেল। বাড়ির পেছন দিকে বসে থাকা এই লোকগুলো বিড়ি-তামাকের টানে অস্থির হয়ে উঠেছে। ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটতে আরম্ভ করেছে। একে অন্যের মুখ দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎ পেছনে বসা সেপাইরা একটা কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ শুনতে পেল। বোধ হয় বাইরের দরজা খোলা হ'ল। সেপাইরা শুনতে পেল, দরজায় দাঁড়িয়ে কারা ব্যস্তসমস্তভাবে কথাবার্তা বলছে। সবাই বুঝতে পারল, এবার তাদের ধর্মক্ষেত্রে-কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ এসে গেছে। তারা নিজের নিজের সঙিন উঁচিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ওদিকে দরজার ধারের কথাবার্তা তাড়াতাড়ি করে দূরে সরে যাচ্ছে। সেপাইরা ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠল। একটু পরেই কাহিনী চরমস্থানে পৌঁছে গেল। বিপদসংকেত বাজতেই সবাই দৌড়ুতে দৌড়ুতে দরজার কাছে চলে গেল। ওখান থেকে

দৌড়ে গজ পঞ্চাশেক দূরে এক আমবাগানে যেতেই তারা এক নাটকীয় পরিস্থিতি দেখতে পেল।

তারা দেখল, যোগনাথ মাটিতে বসে আছে, আর দারোগাবাবু তার বুকের ওপর পিস্তল তাক করে আছেন। হেড কনস্টেবলও অন্য দিক থেকে সঙিন উঁচিয়ে আছে। চমৎকার নাটকীয় দৃশ্য, কিন্তু তার ওপর পর্দা পড়ছে না। সেপাইরা এসেই এই দৃশ্যটাকে ঘিরে ফেলল এবং পিস্তল আর সঙিনের হাত থেকে যোগনাথের শরীরের যে অংশটা অরক্ষিত ছিল তা তারা দখল করে নিল।

যোগনাথের কাছ থেকে কিছুটা দূরে একটা ঘটি পড়ে আছে। মাটিতে কিছুটা জলও ছড়ানো রয়েছে। দারোগাবাবু একজন সেপাইকে বললেন, "ঘটিটা তুলে নাও, সাবুদের কাজে লাগবে।"

সেপাই ঘটিটা তুলে এনে খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখল, তারপর প্রশংসার সুরে বলল, "মোরাদাবাদী।" একটু পরে খানিক চিন্তা করে বলল, "এটাকে মোহরবন্দী করব হুজুর?"

"করবে, কিন্তু পরে।"

সেপাই কিছু চিন্তা করে জলেভেজা মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এই মাটিও নেব?"

হেড কনস্টেবল তাকে ধমকে উঠল, "বেশি কেরামতি দেখিয়ো না। যা বলা হয়েছে তা-ই করো।"

দারোগাবাবু যোগনাথকে দাঁড় করালেন। তার শরীরে তল্লাসি চালানো হ'ল। তারপর সঙিনগুলো যথাস্থানে চলে গেল, পিস্তলটাও চামড়ার খাপের মধ্যে ঢুকে গেল। সেপাইরা কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করল।

একজন বলল, বোধহয় এত সকালে ও হাজত ভাঙতে যাচ্ছিল।

আর-একজন বলল, কে জানে, কাছাকাছি কোথাও হয়তো বদমাশদের দল আছে, তাদের খাবারদাবার দিতে যাচ্ছিল। তৃতীয়জন বলল, এখন বৈদ্যজী হৈচৈ শুরু করে দেবেন। চতুর্থজন আস্তে করে বলল, বৈদ্যজীকে দারোগাবাবু পকেটে নিয়ে ঘুরছেন; ক্যাপ্টেনের হুকুমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পঞ্চমজন বলল, চুপ, চুপ, একটু দেখো, তামাশা দেখো।

যোগনাথ তার জায়গায় লোকনৃত্যের একটা মুদ্রায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সে নাচবে না। হঠাৎ দারোগাবাবু তার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘটি নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে?"

চড়ের চোটটা সামলে নেবার জন্য সে চোখ বুজল। তারপর দারোগাবাবুর চোখে চোখ রেখে বলল, "কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলো, তবু যতক্ষণ না আমার উকিল বলছে ততক্ষণ আমি কিছু বলব না।"

দারোগাবাবু হেড কনেস্টবলকে হুকুম দিলেন, "হাতকড়া লাগিয়ে একে নিয়ে চলো। এখন এর বাড়ি তল্লাসি করতে হবে।"

"এঁর খবরও নিতে হবে।" হেড কনস্টেবল বলল।

এই কাহিনী বৈদ্যজীকে অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হ'ল। কিন্তু আজ প্রথম বৈদ্যজীর এই শাশ্বত সত্যে সন্দেহ হতে লাগল যে, পুলিস যা করে, ঠিকই করে!

যোগনাথ সম্বন্ধে বৈদ্যজীর ধারণা খুব ভালো ছিল না। কিন্তু তিনি এমন এক জগতে বাস করেন, যেখানে মানুষের সম্মান তার ভালোত্বর জন্য নয়, তার উপযোগিতার জন্য। তাঁর লোকদের

মধ্যে যোগনাথই এমন লোক যে প্রাণ খুলে মদ খায়। নিজের পয়সায় খাক কি পরের পয়সায়, বিরামবিহীনভাবে সে মদ খেতে পারে। সব মিলিয়ে সে মাঝারি ধরনের এক গুণ্ডা।

বৈদ্যজীর সন্দেহ ছিল, যোগনাথকে গ্রেপ্তার করার পেছনে হয়তো পলিটিক্স আছে। কিছুদিন ধরে তিনি দেখছিলেন, দারোগাবাবু কেবল তাঁকেই নয়, রামাধীন ভিখমখেড়বীকেও কিছু বুঝেস্থুঝে চলছেন। প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল, রামাধীন হয়তো তাঁর আফিমের চোরাকারবারে দারোগাবাবুকেও অংশীদার করে নিয়েছেন, কিন্তু এখন তাঁর মনে হচ্ছে, দারোগাবাবু কিছু ভুল বুঝেছেন— ভুল বুঝেছেন যে, রাজনীতির মারপ্যাঁচে তাঁর পক্ষে বৈদ্যজীর চেয়ে রামাধীন ভিখমখেড়বীই বেশি কাজ দেবেন। যা-ই হোক, বৈদ্যজীর ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, এই পরিস্থিতিতে যোগনাথকে যদি গ্রেপ্তার করা হয় তা হলে প্রথমে তা-ই হবে যা দারোগাবাবু চাইবেন, আর দারোগাবাবু তা-ই চাইবেন যা রামাধীন ভিখমখেড়বী চাইবেন।

কিন্তু রুপ্পনবাবু জিদ ধরলেন, যোগনাথকে জামিনে থানা থেকেই ছাড়িয়ে আনতে হবে। তাই তিনি ইচ্ছে না থাকলেও দারোগা-বাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন।

দারোগাবাবু এখন সকালের সেই দুর্দান্ত দারোগা নন, যাঁর দৃষ্টি পড়তেই মানুষের শরীরে নীল দাগ আর কালশিরা পড়ে। এখন সিল্কের জামায় তাঁর বলিষ্ঠ দেহটা দেখা যাচ্ছে। তাঁর পরনে খদ্দরের পায়জামা। ঠোঁটের কোণে পানের রস। বৈদ্যজী তাঁর মুখ থেকে পুরো ঘটনাটা শুনলেন। শুনে অবাক হলেন না। যোগনাথের বাড়িতে পুলিস একটা দেশী পিস্তলও পেল না, এতেই যা একটু

অবাক হলেন। এত বছর পুলিসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে তিনি এটুকু জেনেছেন যে, এইরকম সব অবস্থায় অপরাধীর বাড়ি থেকে অন্তত লোহার একটা বেঢপ রড অবশ্যই বার হয়। সেটাকে পিস্তল বলে চালানো হয়। সেটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট বোঝা যায়, অষ্টাদশ আর উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের কাছে ভারতীয়দের পরাজয়ের প্রধান কারণ কী।

দারোগাবাবুকে তিনি এই সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া দরকার মনে করলেন। ভূমিকার আকারে জিজ্ঞাসা করলেন, "যোগনাথের বাড়ি থেকে কেবল গয়নাই পাওয়া গেল? গাঁজা, ভাং, চরস কিংবা আফিং তো না?"

"আমি আফিঙের খোঁজ করি নি। করলে লোকে বলত, সেবার ও পার্টির একজনকে আফিঙের ব্যাপারে ধরা হয়েছিল, তাই এবার এ দিক থেকে একজনকে ধরা হ'ল।"

"পার্টি?" বৈদ্যজী সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন পার্টি? আপনি এ কাদের ভাষা বলছেন?"

উত্তর দিলেন রুপ্পনবাবু, "পুলিসের।"

দারোগাবাবু চোখ বুজে তাঁর মাথাটা পরিষ্কার করতে চাইলেন। মনে মনে বললেন, বিলিতি মদের মধ্যে জিন সবচেয়ে বেশি ধোঁকা দেয়। দেখতে জলের মতো, কিন্তু পেটে যাবার পর জিভটাকে ভুল দিকে বাঁকিয়ে দেয়। কী বলা উচিত আর কী বলায়। তিনি চোখ খুললেন। বৈদ্যজীর মুখ অনেক গম্ভীর দেখাচ্ছে। দারোগাবাবুর মনে হ'ল এখন তিনি কোনো দুর্নীতির কথা বলবেন। দারোগাবাবু বৈদ্যজীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বৈদ্যজী বললেন, "আপনি অনর্থক সংকোচ বোধ করেছেন। যে

আফিঙের চোরাকারবার করে তাকে কখনই ক্ষমা করা উচিত নয়। সে দুর্বৃত্ত, দেশদ্রোহী।"

দারোগাবাবু চুপ করে বসে রইলেন। মনে মনে তিনি হলফ করলেন, "জিন হোক আর না-ই হোক, এখন আর কোনো ভুল কথা বলব না।"

বৈদ্যজী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "যোগনাথের বাড়ি থেকে একটা পিস্তল পর্যন্ত বেরুল না? এ কেমন তল্লাসি?"

"অমনিই মনে করুন," দারোগাবাবু নম্রভাবে জবাব দিলেন। তিনি বললেন, "এখন এত পিস্তল আর কোথায় আছে যে, প্রত্যেক তল্লাসিতে একটা করে বার হবে?" একটু মুচকি হেসে ভাবলেন, অ্যাক্‌টিং করতে জিন বড়োই সাহায্য করে।

রুপ্পনবাবু একটা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ছিলেন। সেখান থেকেই বললেন, "কোথায় গেল সব পিস্তল? আপনার স্টকের সব শেষ হয়ে গেছে নাকি?"

দারোগাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "গতবার থানায় বৈদ্যজী যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এটা তারই পরিণাম। বৈদ্যজীর কথায় প্রভাবিত হয়ে সব বদমাশই তাদের পিস্তল এখান থেকে বাইরে সরিয়ে ফেলেছে। বেশির ভাগ উন্নাও-ওয়ালাদের কাছে বেচে দিয়েছে।"

বদ্রী পালোয়ান গেছেন। এখনও ফেরেন নি। বৈদ্যজী চোখের কোণা কুঁচকে কী যেন একটু ভাবলেন, তারপর আস্তে করে একটু হাসলেন। বললেন, "শিবপালগঞ্জের আবহাওয়া খুবই উত্তম, বুদ্ধির বিকাশের পক্ষে বড়ো অনুকূল।"

দারোগাবাবু বললেন, "আমি তো আপনাকেই এখানকার আব-হাওয়া মনে করি।"

দারোগাবাবু এবার এ কথা বলে জিনকে আর মনে মনে গালাগাল দিলেন না, বরং মন খুলে হাসলেন। তিনি হাসতেই থাকলেন, বুঝতে পারলেন না যে, জিন কেবল জিভকেই নয়, গলাটাকেও ভুল দিকে বাঁকিয়ে দিয়েছে।

বৈদ্যজী চুপচাপ বসে রইলেন। দারোগাবাবুর কথা যেন তিনি শুনেও শোনেন নি। দারোগাবাবু যাবার জন্য আস্তে করে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি চৌকাঠটা পার হচ্ছেন তখন বৈদ্যজী, যেন কোনো কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, এমনিভাবে বললেন, "যোগনাথের জামিন বোধ হয় আমার নামেই লেখা হয়েছে?"

দারোগাবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন, "তা হয়ে থাকলে তো নিশ্চয় আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিতাম। যা-ই হোক, চিন্তার কিছু নেই, আদালতে জামিন হয়ে যাবে। ওখানেই কাউকে পাঠিয়ে দেবেন।"

বৈদ্যজী চুপ করে গেলেন। রুপ্পনবাবু এবার স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে জামিন দিতে অসুবিধে কী?"

"চুরির আসামীর জামিন হয় না।"

"আর খুনের আসামীর?"

দারোগাবাবু হালকাভাবে জবাব দিলেন, "আপনি বোধহয় গত বছর নেওয়াদার মকদ্দমার কথা বলছেন। কিন্তু সেখানে আসামী টি-বি রুগী ছিল। তাকে হাজতে রেখে খুনের দায় কে নেবে?"

রুপ্পনবাবু আগেই খবরের কাগজ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, "যোগনাথ তো এখন আপনার হেফাজতে আছে, ওখানেই ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিন। সে-ও অসুস্থ। তার টি-বি নয়, গনোরিয়া আছে।"

বৈদ্যজী শান্তস্বরে বললেন, "রুপ্পন, ভদ্রভাবে কথা বলো। দারোগাবাবু আমাদের আপনজন, যা করবেন, বুঝেসুঝেই করবেন।"

দারোগাবাবু আবার বললেন, "তা হলে আজ্ঞা দিন, আসি।"

রুপ্পনবাবু বললেন, "নিশ্চয় আসবেন, থানায় হয়তো রামাধীন আপনার পথ চেয়ে বসে আছে।"

দারোগাবাবু মুচকি হাসলেন। তারপর চাকরি-জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনার কথা বললেন, "দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই এখন ব্যাপারই আলাদা ; নইলে রুপ্পনবাবু, পথ তো অনেক বড়ো বড়ো লোক চেয়ে বসে থাকতেন।"

দারোগাবাবু চলে যাবার পর রুপ্পনবাবু বললেন, "যাকে খমির ভেবেছিলাম, এখন দেখছি তা ভুসি।" এটুকু তিনি স্বগতোক্তির মতো বললেন, বাকিটা বললেন বৈদ্যজীর উদ্দেশে, "বড়ো বেইজ্জতি হ'ল।"

বৈদ্যজী নির্বিকার হয়ে বসে ছিলেন, এখন রঙ্গনাথকে ঘর থেকে বেরুতে দেখে বক্তৃতার সুরে বললেন, "লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয়, মান-অপমান সব-কিছুকে সমানভাবে দেখা উচিত।"

রুপ্পনবাবু ভাবলেন, তাঁর বাবা গীতার কথা বলছেন। মনে মনে তিনি বললেন, এখন দেখা যাক, এই দারোগা কী করে বাঁচে।

বাবু রামাধীন ভিখমখেড়বীর বাড়িতে আজ ভাং পেষা হচ্ছে। সামনে একটা চালের নিচে জুয়া চলছে। দুটো জিনিস থেকেই বঞ্চিত বাবু রামাধীন একটা চারপায়ার ওপর শুয়ে ল্যাংড়ার কথা শুনছেন। ল্যাংড়া চবুতরার নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

রঙ্গনাথ আর শনিচর ঐদিক থেকেই যাচ্ছিল, বাবু রামাধীন

তাদের ডাকলেন। তারপর নিজে চারপায়ার এক কোণে বসে তাদের মাথার দিকে বসালেন। শনিচরকে তিনি কোনো ভদ্রতা দেখালেন না। শুধু বললেন, "দাঁড়িয়ে কেন? বোসো প্রধানজী।"

রঙ্গনাথ এই নিয়ে দুবার এখানে এল। প্রথমবার যখন সে রামাধীনের বাড়ির সামনে দিয়ে গেছে তখন কোথাও ভাং আর জুয়ার ব্যাপার ছিল না। আজ এখানকার আবহাওয়া ভালো। রঙ্গনাথ ল্যাংড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "এঁর কী খবর?"

"বাহাদুর মানুষ। মনে করুন, বলদ দুয়ে এসেছে।" রামাধীন হাত দিয়ে ইশারায় দেখালেন, বলদ দোয়ার চেষ্টায় কতদূর হাত বাড়াতে হয়।

রঙ্গনাথ জিজ্ঞাসা করল, "কী হ'ল? নকল পেয়েছ?"

ল্যাংড়া বৈষ্ণব সরলতায় জবাব দিল, "হ্যাঁ বাবু, এখন পেয়েই গেছি মনে করুন। সদর থেকে দরখাস্ত ফেরত এসেছে। এমনিতে তো সদর গেলে দরখাস্ত হারিয়ে যায়, কিন্তু আমারটা হারায় নি। আপনাদের আশীর্বাদ।"

শনিচর বেশ বুদ্ধিমানের মতো বলল, "খুব ভালো লক্ষণ। দরখাস্ত যখন ফেরত এসেছে তখন এবার নকল পেয়েই যাবে।"

রঙ্গনাথ জিজ্ঞাসা করল, "কবে পাবে?"

এতখানি অধীরতা ল্যাংড়ার পছন্দ হ'ল না। রঙ্গনাথকে সে আশ্বাস দিয়ে বলল, "নকলবাবু বলছেন যে, এবার আমার পালা আসবে।"

রামাধীন বললেন, "যাও ল্যাংড়া, ওদিকে গিয়ে ঠাণ্ডাটাণ্ডা খেয়ে নাও।"

রঙ্গনাথ বলল, "এখন আমরাও চলি বাবু রামাধীনজী। বেড়াতে যাচ্ছি, দেরি হয়ে যাবে।"

রামাধীন অন্তরঙ্গতার সুরে বললেন, "বেড়াতে যায় মাদী ঘোড়া, ওটা মরদের বাচ্চার কাজ নয়। শ পাঁচেক ডন মারুন ফটাফট, দেখবেন লোহালক্কড় সব-কিছু পেটে হজম হয়ে গেছে।"

রঙ্গনাথ আর শনিচর হাঁটতে আরম্ভ করল। হাঁটতে হাঁটতে জুয়াড়ীদের কাছে এসে একটুক্ষণের জন্য আটকে গেল।

দু দলে খেলা হচ্ছে। একদিকে কয়েকজন বসে, "কোটপিস" খেলছে। তাদের খেলা দেখে মনে হয়, কোটপিস খেলাটা বাহান্ন তাসের। তাসগুলো হওয়া চাই পুরনো, ঘষা আর এমন কাটা-ফাটা যাতে অন্যদিক থেকে বিপক্ষ দলের লোকেরা বুঝতে পারে কোন্ তাসটা কী। এই দলটাকে দেখে আরও মনে হয়, কোটপিস খেলতে হয় আটজনকে নিয়ে। তাদের মধ্যে চারজন হাতে তাস নিয়ে, মুখ বুজে, অত্যন্ত চিন্তিতভাবে বসে থাকে, আর বাকি চার-জন এক-একজন খেলোয়াড়ের পেছনে বসে খেলার ধারাবিবরণী দিয়ে যায় এবং যেখানে চুপ করে থাকা দরকার সেখানে অবশ্যই কথা বলে। তারা কিন্তু খেলোয়াড়দের জন্য খৈনি বানায় না, বিড়ি ধরিয়ে দেয় না, খাবার জল আনায় না, ফেলে দেওয়া তাসও ওঠায় না। খেলার শেষে হারজিত অনুসারে খেলোয়াড়দের মধ্যে যখন পয়সার লেনদেন হয় তখন খুচরো পয়সা কম পড়লে তা জোগানো আর যে জিতেছে তার পয়সায় পান আনার দায়িত্ব এদের ওপর। তৈরি তাস গোণা আর কেউ বাজি হারলে তার তাস ফেলিয়ে কোনো ছুতোনাতায় ঝগড়া বাধাবার কাজও এদের করতে হয়। সামনে বসা খেলোয়াড়ের কোন্ তাস চালা উচিত, ইশারায়

তা বলে দেওয়া এবং ইশারাটা ধরা পড়ে গেলে তা নিয়ে হৈচৈ করাও এদের কাজ।

খেলাটা রঙ্গনাথের কাছে বড়ো মন্থর মনে হ'ল, ঠিক ভাঙের নেশার মতো। কিন্তু অন্যদলের খেলা দেখে শিবপালগঞ্জের জুয়া-খেলা সম্বন্ধে তার ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেল।

তারা ফ্লাশ খেলছে। ল্যাণ্টার্ন যে নিয়মে লণ্ঠন হয়েছে, ঠিক সেই নিয়মে এখানে ফ্লাশ ফেলাশ হয়েছে। জোর খেলা চলছে। একদিকে ব্লাফের স্বয়ংচালিত অস্ত্র হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, আর অন্যদিকে বিশুদ্ধ দেশী চালে একজন খেলোয়াড় এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তার বুদ্ধির হাতি ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করে দিল আর মাহুতকে নিচে ফেলে পায়ে দলার জন্য পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে তাস ফেলে দিল, আর ওদিকে অন্য খেলোয়াড় মুঠো ভরে পয়সা তুলে পাছার তলায় রেখে দিল। যে লোকটা হেরে গেল, রঙ্গনাথ তাকে দুদিন আগে বৈদ্যজীর বাড়িতে রোজ আট আনা মজুরিতে কাজ করতে দেখেছে। হেরে গিয়ে সে নির্বিকারভাবে একটা বিড়ি ধরাল। তারপর পরের বাজির তাসগুলো নিরাসক্তভাবে দেখতে লাগল। রঙ্গনাথ মনে মনে তার ধৈর্য আর সাহসের প্রশংসা না করে পারল না। রঙ্গনাথ ভাবল, দত্তাত্রেয় বেঁচে থাকলে লোকটাকে তিনি তাঁর পঞ্চবিংশ গুরু বলে স্বীকার করে নিতেন। রঙ্গনাথের মাথা এই খেলোয়াড়ের নির্বিকার ভাবের প্রতি সম্মানে নত হ'ল। আসলে কিন্তু সে তার তাসগুলো দেখার জন্যই নিচু হয়েছিল।

তারা যে-রকম আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলছে আর পাছার চামড়া পর্যন্ত বিক্রি করে যে আশা নিয়ে ব্লাফ লাগিয়ে যাচ্ছে, রঙ্গনাথ

তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে স্পষ্ট বুঝল, ডিফিসিট ফিনান্সিংয়ের যে-সব আচার্য আর মহান্ রাজনীতিজ্ঞ বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ চেয়ে আনেন তাঁদের হার্টও এত মজবুত নয়। রঙ্গনাথ ভাবল : এই-সব দিনমজুর আর রাখালছেলের জীবন দেখার পর আজ থেকে আমি আর দিল্লীর স্বপ্নদ্রষ্টাদের ওপর অসন্তুষ্ট হব না।

রঙ্গনাথের পাশে যে খেলোয়াড় বসে আছে, রঙ্গনাথ তার দিকে তাকাল। এবারও সে দান হেরে গেল। হেরে গিয়ে তার ভাব-বিকার নেই, একটা বিড়ি ধরিয়ে এদিক-ওদিক কী দেখতে লাগল। রঙ্গনাথ আর শনিচরের ওপর শূন্য দৃষ্টি বুলিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মজুরকে হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে ইশারায় তাকে টাকা বার করতে বলল। লোকটা মাথা নেড়ে "না" বলে দিল। তখন সে উঠে বাবু রামাধীনের কাছে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে ফিরে তার নিজের জায়গায় আগের মতো বসে পড়ল, তার ভাবভঙ্গি আগেরই মতো নির্বিকার। সে তাস উঠিয়ে আধ-পোড়া বিড়িটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা ঢেকুর তুলল। তারপর পাঁচ টাকার একটা নোট ফেলে বাকি টাকা ফেরত নেবার কথা না ভেবে একটা দান চালল। অন্যদিকে একজন খেলোয়াড় বলল, "এবার বোধহয় কোনো বড়ো তাস এসেছে।"

রঙ্গনাথ নিচু হয়ে দেখল, আগেরই মতো সে ব্লাফ খেলছে।

রঙ্গনাথের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল, কোন্ কোন্ কারণে, কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে আর কী কী রকম মুখের ভাব করে বিদেশী সাহায্য চাওয়া উচিত।

আঠারো

শহরে যেমন চায়ের দোকান, কমিটি রুম, লাইব্রেরি আর বিধান-সভা তেমনি গ্রামে রাস্তার ধারে এই-সব কালভার্ট। লোকে এই-সব কালভার্টের ওপর বসে গল্পগুজব করে।

বেলা এখন প্রায় দশটা। রবিবার। রঙ্গনাথ আর রুপ্পনবাবু একটা কালভার্টের ওপর বসে রোদ পোহাচ্ছেন আর যুগের হাল নিয়ে আলোচনা করছেন।

যুগের হাল— অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যে দুটি কঠিন স্তনের উষ্ণ স্পর্শের অনুভব। কথাটা শুরু করেছিল রঙ্গনাথ। সেই রাত্রির ঐ ঘটনাটা রঙ্গনাথ কাউকে বলতে চায় নি। রুপ্পনের সঙ্গে সে সাধারণ কথাবার্তা বলতে চেয়েছিল আর সেইসঙ্গে জানতে চেয়েছিল, পাড়ায় এমন কোন্ মেয়ে আছে যাকে একটা চোলী বানানোর কোম্পানির ক্যালেণ্ডারে মডেল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। রুপ্পনের সঙ্গে সে এমনভাবে কথা আরম্ভ করল যেন সে ঐ কোম্পানির প্রচার-অধিকারী আর মেয়েদের কিংবা তাদের স্তনের ওপর তার আগ্রহ কেবল ব্যবসায়ের খাতিরেই। রুপ্পনবাবু যখন এ-বিষয়ে তার সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা করতে চাইলেন তখন প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রের মতো রঙ্গনাথও একথা-সেকথা বলতে

আরম্ভ করল। কথাটা সে ঘুরিয়ে মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রসঙ্গে নিয়ে এল, আর "দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান ব্রা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি"র প্রচার-অধিকারীর পদে ইস্তাফা দিয়ে "অখিল ভারতীয় নাগরিক স্বাস্থ্য সঙ্ঘের" মহামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করল। কিন্তু রুপ্পনবাবুর প্রশ্নবাণের সামনে সে ঐ চেয়ারেও বেশিক্ষণ টিঁকতে পারল না। কিছুক্ষণ অন্ধকার, শীত, ভূতপ্রেত ইত্যাদির কথা বলতে বলতে রঙ্গনাথের হঠাৎ মনে হ'ল, না চাইলেও সে সেই রাত্রির পুরো ঘটনাটা রুপ্পনবাবুকে শুনিয়ে ফেলেছে।

রুপ্পনবাবু মন দিয়ে শুনছিলেন। রঙ্গনাথের কথা শেষ হতেই তাঁর মনে হ'ল, তিনি একটা অগ্নিকুণ্ডের ওপর বসে আছেন। শরীরের ভেতরে তিনি একটা অদ্ভুত গরম আর উত্তেজনা অনুভব করলেন, মেয়েদের নিয়ে আলোচনার সময় যেমন করে থাকেন। তিনি বুঝতে পারলেন, সেদিন রাত্রে ছাদে যে মেয়েটা এসেছিল সে বেলা, আর যাঁর কাছে সে আত্মসমর্পণ করতে চায় তিনি স্বয়ং রুপ্পনবাবু। রুপ্পনবাবু এই ভেবে গর্ব অনুভব করলেন যে, 'আমার প্রেমপত্রে তা হলে কাজ হয়েছে, ও এখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।' রুপ্পনবাবু নিজেও অস্থির হয়ে উঠলেন। 'সেদিন রাত্রে ছাদে আমি কেন ছিলাম না'— এই আফসোসে রুপ্পনবাবুর গলায় একটা সিনেমার গান এসে গেল। কিন্তু এখন রঙ্গনাথের সামনে তাঁকে বুঝদার লোকের মতো থাকতে হবে, তাই তিনি একজন বুঝদার লোকের মতোই বসে রইলেন। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে রঙ্গনাথ আবার বলল, "সে যে কখন এল আর চলে গেল, আমি বুঝতেই পারলাম না। আমার শুধু এটুকু মনে আছে যে, আমার বুকের উপর ঝুঁকে বসে ছিল আর··· ।"

রুপ্পনবাবু ভারিক্কি চালে বললেন, "হয়, কখনও কখনও এমন ধোঁকা হয়। কে জানে কে এসেছিল! সত্যি সত্যিই কেউ এসেছিল কিনা, তা-ই বা কে বলতে পারে! কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। দেহাতী অসভ্যদের ব্যাপার, ভূতপ্রেত মনে করতে আরম্ভ করবে। কাকে কাকে তুমি বোঝাবে রঙ্গনাথদাদা! চুপ করে থাকো। হয়তো তুমি স্বপ্ন দেখেছ, আবার সত্যিই দেখেছ এমনও হতে পারে।"

রঙ্গনাথ এই কথায় ছুটো আপত্তি দেখতে পেল। প্রথমত, রুপ্পনবাবু তার অনুভবকে স্বপ্ন বলে এড়িয়ে দিতে চান। দ্বিতীয়ত, রুপ্পনবাবু ঐ মেয়েটির প্রসঙ্গে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করছেন। রঙ্গনাথ বলল, "এতে ধোঁকা হতেই পারে না। আমি তখন জেগে ছিলাম। সে এসে আমার চারপায়ার ওপর বসেছিল, আমার বুকের ওপর ঝুঁকেছিল।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," হাত দিয়ে কয়েকটা কাল্পনিক মশা উড়িয়ে দিয়ে রুপ্পনবাবু বললেন, "স্বীকার করলাম, সত্যিই কেউ এসেছিল, কিন্তু এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।"

কেউ এসেছিল! রঙ্গনাথ চোখবুজে কোণার্কের সুরসুন্দরীদের একবার মনে মনে দেখে নিল। তারপর মনে মনেই বিশ বার বলল, 'সে এসেছিল, সে এসেছিল। রুপ্পনবাবু, তুমি এখন 'এসেছিল'র বেশি আর কিছু ভাবতে পারবে না।'

কোনো গ্রামে কে যেন কাকে খুন করেছে। পুরনো শত্রুতার শোধ নেবার জন্য হত্যাকারী হিসাবে থানায় আর-একজনের নাম লেখানো হয়েছে। আর-একজন তার শত্রুতার শোধ নেবার জন্য

তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজী হয়েছে। তারপর কে যেন তার কারও কাছ থেকে সুপারিশ এনেছে, কেউ তার তরফ থেকে কাউকে ঘুষ দিয়েছে। কেউ কোনো-এক সাক্ষীকে ধমকেছে, কাউকে বোকা বানিয়েছে আর কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছে। এইভাবে মামলাটা এজলাস পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতে তার রূপ গেল পালটে আর তা খুনের মকদ্দমা না থেকে হয়ে গেল "খুনের বদলা" নামে এক নাটক। উকিলরা দু তরফ থেকেই খুব ভালো পার্ট আদায় করল আর জজও বুঝতে পারলেন যে, নাটক হিসাবে একটা ভালো জিনিস পেশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রমাণ হিসাবে যা পেশ করা হয়েছ, আসলে তা জাল। শেষে জাল-সম্পর্কিত থিওরি এত বেশি প্রভাব বিস্তার করল যে, আসামী নির্দোষ প্রতিপন্ন হল এবং সেইসঙ্গে এ-ও প্রতিপন্ন হ'ল যে, খুনই হয় নি। "আসামী হরিরাম" হত্যাপরাধ থেকে সসম্মানে মুক্তি পেল।

জজ বলে দিয়েছেন বলেই আর কিছু আসামী হরিরাম সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে গেল না, গুণ্ডার গুণ্ডাই রইল। কিন্তু জেল থেকে ফিরে আসার পরই সারা অঞ্চলে সম্মানিত বলে পরিগণিত সবাইকে—অর্থাৎ নারী, অচ্ছুৎ আর মুসলমান ছাড়া মানুষ মাত্রকেই নেমন্তন্ন করল। এবং সেদিন শিবপালগঞ্জের সমস্ত বিশিষ্ট লোক পাশের গ্রামে হরিরামের ওখানে নেমন্তন্ন খেতে গেল আর রঙ্গনাথ বৈদ্যজীর এখানে একা রইল।

সারাটা দিন রঙ্গনাথের একটা উৎসাহহীন, ক্লান্তিকর বক্তৃতার মতো কাটল। বিকেলে একটু বেড়াবার জন্য সে বাইরে বেরুল। বাইরে বেরিয়ে দেখল, প্রিন্সিপালসাহেব একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছেন আর

দোকানদারকে পানের দাম দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দোকানদার তাঁকে পান খাইয়েছে, দাম নিতে চাইছে না। বলছে, “এ তো আপনারই দোকান।”

ঠিক এমন সময় রঙ্গনাথ এসে পৌঁছুল। সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সিপাল-সাহেব খুব মন দিয়ে দোকান সাজাবার জিনিসপত্রগুলো দেখতে লাগলেন। একটা চৌকাঠে ঝোলানো ছবিতে রঙবেরঙের চিত্র-কারিতায় আঁকা মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত বীভৎস একটা হাসি হাসছেন আর তাঁর উত্তরাধিকারী নেহরু হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। ছবির বক্তব্য, একটা রঙিন তেল শিশুদের শুখারোগের অব্যর্থ ওষুধ। রঙ্গনাথ প্রিন্সিপালসাহেবকে বলল, “দেখেছেন?”

প্রিন্সিপালসাহেব উত্তরে একটা অবধী প্রবাদবাক্য বললেন, “যেমন পশু তেমন বাঁধন।— ছবিটা দেহাতেরই উপযুক্ত।”

“দেহাত-শহরের কথা আসছে কেন?” রঙ্গনাথ বলল, “গান্ধীজীকে তো সবাই শ্রদ্ধা করে।” কিছুক্ষণ ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে রঙ্গনাথ আবার বলল, “ইচ্ছে করছে, ছবিটা যে এঁকেছে তাকে একশো ঘা জুতো মারি।”

প্রিন্সিপালসাহেব হাসলেন। তাঁর হাসিটাই বলে দিচ্ছে, রঙ্গনাথ একটা নির্বোধ। প্রিন্সিপালসাহেব বললেন, “যত গুড় দেবে তত মিষ্টি হবে। তেলী-তামলীরা বোঝে কতখানি? পানের দোকানে থোড়াই কোনো শালা পিকাসো টাঙাবে!”

রঙ্গনাথ তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, “থামুন থামুন, মাস্টারমশায়। পিকাসোর নাম উচ্চারণ করবেন না। আপনার মুখে এমন নাম শুনলেই মূর্ছা আসে।”

হাঁটতে হাঁটতে দুজনেই রাস্তার ওপর এসে পড়েছেন। গোরু-

মোষের ভিড়ের মধ্যে হাওয়া খাচ্ছেন। কিন্তু আসলে হাওয়া কোথাও নেই— ফুসফুসে ঢোকার জন্য আছে ধুলো, নাকে ঢোকার জন্য আছে গোবরের গন্ধ আর পিঠে ঢোকার জন্য আছে কোনো গোমাতার শিং।

রঙ্গনাথের কথাটাকে প্রিন্সিপালসাহেব খুব খারাপভাবে নিলেন, তিনি এত গম্ভীর হয়ে গেলেন যে, সম্পূর্ণ ভদ্রলোকের মতো কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, "তা হলে রঙ্গনাথজী, আপনি আমাকে একেবারে অশিক্ষিত মনে করেন? আমিও ইতিহাসে এম. এ. পাস করেছি আর শতকরা উনষাট নম্বর পেয়েছি। সুযোগ পাই নি বলেই না আমি এখানকার প্রিন্সিপাল।"

গম্ভীর কথাবার্তায় রঙ্গনাথ চুপসে গেল। রঙ্গনাথের মনে হ'ল, ঠাট্টা করে পিকাসোর কথা বলে প্রিন্সিপালসাহেবকে সে আঘাত দিয়েছে। প্রিন্সিপালসাহেবের কাছে সে ক্ষমা চাইল। বলল, "সে আমি জানি। খারাপ ডিভিসন হলে কি আর আপনি এখানে থাকতেন!"

প্রিন্সিপাল বললেন, "সে তো ঠিক কথা। তা হলে তো আমিও কোনো ইউনিভার্সিটির লেকচারার হতাম। আমার কয়েকজন থার্ড ক্লাস বন্ধু ইউনিভার্সিটিতে আছে।"

প্রিন্সিপাল কিছুক্ষণ আনমনাভাবে পথ চলতে লাগলেন। তিনি ভাবুক হবার চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, "বাবু রঙ্গনাথ, আমি জানি, তোমরা আমার সম্বন্ধে কী ভাবো। তোমরা ভাবো, এ একটা কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েও কেমন গাড়ল, সবার সামনে হেঁহেঁ করে। কথাটা ঠিক। খান্নাটান্নার কথা ছেড়ে দাও, সে শালা ছোকরা, অন্য সবার কথা আমি খুব নত হয়ে শুনি। বিশেষ

করে, আমার চেয়ে বড়ো যাঁরা তাঁদের কথা শুনে আমি সবসময় তাঁদের সমর্থন করি। তোমরা আমাকে বোকা ভাবো। কিন্তু এরও একটা কারণ আছে। কারণ এই···।"— এইটুকু বলেই তিনি একটা মোষকে রাস্তা দেবার জন্য একধারে সরে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন।

তারপর বললেন, "কারণ এই যে, বুদ্ধিমত্তার যেমন একটা ভ্যালু আছে তেমনি বোকামিরও তার নিজস্ব একটা ভ্যালু আছে। বোকাদের কথা তুমি মানতেও পারো, আবার না-ও মানতে পারো। তাতে তার কিচ্ছু যায়-আসে না। সে বোকাই আছে আর বোকাই থাকবে। তাই আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, বোকাদের কখনও চটাই না। কখনও কখনও তার জন্য লোকে আমাকেই বোকা মনে করে। কিন্তু তারা নিজেরাই বোকা। কী বুঝলেন বাবু রঙ্গনাথ?"

প্রিন্সিপালসাহেবের মুখ থেকে একসঙ্গে এতগুলো কথা শুনে রঙ্গনাথের মাথা ঘুরে গেল। হঠাৎ একটা বাছুর এসে তার পিঠে গুঁতিয়ে দিল। কিন্তু পিঠে কিছু বিঁধেছে বলে তার মনে হ'ল না। প্রিন্সিপালসাহেব তার হাত ধরে তাকে একদিকে টেনে নিলেন। রঙ্গনাথ জানতেই পারল না, কখন তার দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে আর কখন সে হেঁ হেঁ করে হাসতে আরম্ভ করেছে। পরক্ষণেই সে প্রিন্সিপালসাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলতে লাগল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি জানি, আপনি পিকাসো সম্বন্ধে সব-কিছু জানেন। আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না। আজ্ঞে হয়েছিল কি, আপনি প্রসঙ্গটা শিবপালগঞ্জ সম্বন্ধে তুলেছিলেন। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, এখানে কেউ পিকাসোর নাম শোনার কথা ভাবতে পারে? তাই আমি মূর্ছিত হয়ে

পড়ছিলাম। আজ্ঞে, দোষ আপনারও না, আমারও না ; শিবপাল-গঞ্জেরও না, দোকানদারেরও না। আজ্ঞে, দোষ তো পিকাসোর।"

প্রিন্সিপালসাহেব রঙ্গনাথের ব্যক্তিত্বের এই অকস্মাৎ পরিবর্তন দেখছিলেন। তিনি গলা কিছুটা চড়িয়ে গম্ভীর করে বললেন, "এক সময় আমিও বুদ্ধিমানের মতো কথা বলতাম। তখন আমি এম. এ. পড়তাম। তখন আমি চিন্তা করতাম না, কোন্ প্রফেসর কড়া আর কোন্ প্রফেসর ইডিয়ট। সবার সামনে আমি আমার কেরামতি দেখাতাম। একজন প্রফেসর তাতেই চটে গেলেন আর তাতেই আমি গোত্তা খেলাম।"

রঙ্গনাথ আর প্রিন্সিপাল এখন গ্রামের বাজার থেকে বাইরে এসে পড়েছেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ভাজাওয়ালার উনুনের ধোঁয়া ওপরে না উঠে সামনেই আটকে আছে। সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু ঐ আবছা আলোতে ভাজাওয়ালার মেয়েকে দোকানে বসে থাকতে দেখে রঙ্গনাথ মনে মনে অনুমান করে নিল, মেয়েটা দেখার মতো।

জনবসতি প্রায় পঞ্চাশ গজ পেছনে চলে গেছে, নির্জন এলাকা শুরু হয়ে গেছে। লোকে এখানে কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, রাহাজানি করতে পারে, এমন-কি পায়খানা পর্যন্ত করতে পারে। কয়েকটা ছেলে কবিতা আর রাহাজানিতে অক্ষম বলে রাস্তার দুধারে বসে পায়খানা করছে আর একে অপরের দিকে ঢিল ছুঁড়ছে। তাদের ওখান থেকে কিছুটা দূরে কয়েকজন বুড়ীও ঐ উদ্দেশ্যে রাস্তার দুধারে লাইন দিয়ে বসে আছে। সেখানে তাদের নির্লজ্জ উপস্থিতি নব-ভারতের নির্মাতাদের যেন ভৎ´সনা করছে। কিন্তু সেই-সব নির্মাতারা নিশ্চয় তা জানেন না, কারণ তাঁরা হয়তো এখন তাঁদের বাড়িতে

সবচেয়ে ছোটো অথচ ঝকঝকে কামরায় কমোডে বসে খবরের কাগজ, কোষ্ঠকাঠিন্য আর বিদেশযাত্রার সমস্যাবলী চিন্তা করছেন।

তাঁদের দুজনকে দেখে ঐ মহিলারা পায়খানা করা ছেড়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল আর তাঁদের "গার্ড অভ্ অনার" দিতে লাগল। এটা রোজকার দৃশ্য। রঙ্গনাথ আর প্রিন্সিপালসাহেব নির্বিকারভাবে হাঁটতে লাগলেন। মহিলারা নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে রইল। একটি ছাগল ম্যা ম্যা করতে করতে রঙ্গনাথ আর প্রিন্সিপালসাহেবকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার একধারে চলে গেল, একজন মহিলার ঘটি উলটে দিয়ে পাশের বাগানে ঢুকে পড়ল। যে-সব ছেলে ঢিল ছুঁড়ছিল আর নৈসর্গিক কাজ করছিল তারা চিৎকার করতে আরম্ভ করল। কয়েকজন ঐ অবস্থায় উঠে ছাগলটার পেছন পেছন ছুটল। এই গোলমালে রঙ্গনাথ আর প্রিন্সিপালসাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। গজদশেক মতো এগিয়ে গিয়ে তাঁরা পেছন ফিরে দেখলেন, ঐ স্ত্রীলোকগুলো আবার আগের মতো বসে পড়েছে। প্রিন্সিপালসাহেব আবার তাঁর কথা বলতে আরম্ভ করলেন, "তারপর হ'ল কী রঙ্গনাথবাবু, আমার প্রফেসর আমার ওপর চটে গেল তো চটেই গেল। আমার সব কথায় খুঁত বার করতে লাগল। শেষে আমার ডিভিসনটাও খারাপ করে দিল, আর আমার বিরুদ্ধে এমন করে লাগল যে, সে থাকতে আমি ঐ ইউনিভার্সিটিতে স্থান পেলাম না। সে এক দীর্ঘ কাহিনী, কত আর বলব! যদি সেই শালাকে না চটাতাম তা হলে আজ আমি তার জায়গাতেই থাকতাম।"

প্রিন্সিপালসাহেব গল্পটা শুনিয়ে চুপ করলেন। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ রইলেন। পরে প্রিন্সিপালই আবার বললেন, "এইভাবে কয়েকবার আমি গোত্তা খেয়েছি। পরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে,

সব এইভাবেই চলে আর এইভাবেই চলতে দাও। সবাই যদি চিড়িমার হয় তা হলে তুমি শালা বীর রঘুবীর হয়ে কী করবে! এখন তো অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে রঙ্গনাথবাবু যে,তুমি কিছু বলো তো 'হ্যাঁ ভাই, বহুৎ ঠিক!' আর বৈদ্যজী কিছু বলেন তো 'হ্যাঁ মহারাজ, বহুৎ ঠিক!' আর রুপ্পনবাবু কিছু বলেন তো তা-ও 'হ্যাঁ পালোয়ান, বহুৎ ঠিক!' যা-ই বলো, সব ঠিক আছে।"

রঙ্গনাথের এমন সাহস হ'ল না যে, প্রিন্সিপালের কথাটা অস্বীকার করে। রঙ্গনাথ বলল, "ঠিকই বলেছেন প্রিন্সিপালসাহেব।"

হঠাৎ প্রিন্সিপালসাহেব আবেগে বলতে আরম্ভ করলেন, "ঠিক তো বটেই রঙ্গনাথবাবু। আমাকে চার-চারটে বোনের বিয়ে দিতে হবে। একটা পয়সা জমানো নেই। বৈদ্যজী যদি কান ধরে কলেজ থেকে বার করে দেন তা হলে ভিক্ষা পর্যন্ত মিলবে না। এখন তুমিই বলো, আমি ঐ শালা খান্নাটান্নাকে বাপ বলে চলব, না বৈদ্যজীকে··· ?"

এই-সব কথাবার্তার মধ্যে প্রিন্সিপালসাহেবের ব্যক্তিত্বের একটা বড়ো মানবিক দিক বেরিয়ে এল, তবে তাঁর কথায় তাঁর সেই চিরপরিচিত বোকামি প্রকাশ পেতে লাগল। সুতরাং রঙ্গনাথ যে জাদুতে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা ছুটতে আরম্ভ করেছে। রঙ্গনাথ আগেরই মতো হালকা হয়ে গেল। বলল, "না না, আপনি যা বলছেন, ঠিকই বলছেন। আর এখন যেখানে আপনি আছেন সেখানেও ঠিকই আছেন। ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হওয়ার মধ্যে কী আছে? এখানে আপনি কোন্ ভাইস-চ্যান্সেলরের চেয়ে কম?"

এতক্ষণ পরে প্রিন্সিপালসাহেব হাসলেন। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন,"হ্যাঁ, সে তো ঠিকই। আমি তো নিজেকে ভাইস-চ্যান্সেলরের চেয়েও ভালো মনে করি। ভাইস-চ্যান্সেলরের জীবনও তো নরক।

সকাল থেকে গাড়ি নিয়ে এগজিকিউটিভওয়ালাদের সেলাম দিতে হয়। কখনও চ্যান্সেলরের কাছে, কখনও মিনিস্টারের কাছে, আবার কখনও সেক্রেটারির কাছে হাজিরা দিতে হয়। গভর্নর বছরে অন্তত চারবার ধমকায়। দিনরাত ঝামেলা। ছেলেরা মা-বোন তুলে গালাগাল দিতে দিতে সামনে দিয়ে মিছিল নিয়ে বেরিয়ে যায়। সবসময়েই মার খাবার ভয়। পুলিসকে ফোন করলে ক্যাপ্টেন হাসে। বলে, 'দেখো, ইনি ভাইস-চ্যান্সেলর। বছরে দশ-বিশবার ছেলেদের ওপর লাঠি না চালিয়ে ইনি থাকতে পারেন না।' তো এই অবস্থা চলছে বাবু রঙ্গনাথ।"

গলাখাঁকারি দিয়ে আবার তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "এখনও পর্যন্ত প্রিন্সিপালগিরিতে এই-সব অসুবিধা আসে নি। আর যেখানে বৈদ্যজী ম্যানেজার, সেখানে তো মনে করুন, প্রিন্সিপাল একজন আস্ত সিংহ। আমার কাউকে খোশামোদ করার দরকার নেই, বৈদ্যজীর লেজ ধরে বসে আছি আর সবাইকে জুতো মেরে কথা বলছি। কী বলো বাবু রঙ্গনাথ?"

"সম্পূর্ণ ঠিক কথা বলেছেন আপনি।"

"আর সত্যি কথা জিজ্ঞাসা করো তো বলি, ইউনিভার্সিটির লেকচারার হতে পারি নি বলে আমার কোনো দুঃখ নেই। ওখানে তো আরও নরক। কেবল পাঁক। দিনরাত খোশামুদি। কোনো সরকারি বোর্ড দশ টাকা গ্রাণ্ট দিল তো কান ধরে যেমন খুশি, থিসিস লিখিয়ে নিল। যাকেই দেখো, কোনো-না-কোনো রিসার্চ প্রজেক্ট হাতিয়ে নিয়েছে। বলছে, রিসার্চ করছে। কিন্তু কী রিসার্চ করছে? যার খাচ্ছে তারই গাচ্ছে। আর পরিচয় দিচ্ছে কী? দাঁড়াও, দাঁড়াও, কী যেন কথাটা— হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে— পরিচয়

দিচ্ছে, বুদ্ধিজীবী। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, বলছে বুদ্ধিজীবী, কিন্তু বিলেত ঘুরে আসার জন্য যদি তাকে প্রমাণ করতে হয় যে, সে তার বাপের ছেলে নয় তা হলে তা-ও প্রমাণ করে দেবে। চৌমাথায় দশ জুতো মারো আপত্তি নেই, কিন্তু একবার অ্যামেরিকা পাঠাও। এই হচ্ছে বুদ্ধিজীবী।"

একটু থেমে আবার তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "আমার তো শুধু বৈদ্যজীকে খোশামোদ করতে হয়, আর কারও সামনে মাথা নিচু করার দরকার নেই। নিজের যোগ্যতায় লেকচারার হওয়া যায় না।"

প্রিন্সিপালসাহেব মাথা নেড়ে লেকচারার হতে অস্বীকার করলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল, এতে পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শোক ছড়িয়ে পড়েছে।

রঙ্গনাথ বলল, "একেবারে ঠিক কথা বলেছেন আপনি।"

প্রিন্সিপাল গভীরভাবে একেবারে রঙ্গনাথের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হালকাভাবে হেসে উঠলেন। তারপর আস্তে করে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো বাবু রঙ্গনাথ, আমার সব কথাকেই আপনি ঠিক বলে আসছেন!"

রঙ্গনাথ বলল, "ভাবছি, আমিও আপনার অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগাব। কী দরকার কারও কথায় বাধা দিয়ে? আপনি যা বলছেন, ঠিকই বলছেন।"

প্রিন্সিপালসাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন, "তা হলে তুমিও ঠিক বলেছিলে রঙ্গনাথবাবু। আমি যখন তোমার কাছে পিকাসোর কথা বলেছিলাম তখন সত্যি সত্যি তোমার হয়তো মূর্ছা এসে গিয়েছিল। এখন আমি তা বুঝতে পারছি। এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ-সব কথার ফল মেশিনের ওপর পর্যন্ত পড়ে। একটা

গল্প বলি শোনো : একটা হাওয়াই জাহাজ ইণ্ডিয়া থেকে ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছিল। হাওয়াই জাহাজে এক তামাকের ব্যবসায়ী বসে ছিল। শালার সারাটা জীবন বিড়ি-সিগারেটের ব্যবসায় কেটেছে। হঠাৎ তার কী হ'ল, সে লিটারেচার আর ফিলসফি সম্বন্ধে কথা বলতে আরম্ভ করল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াই জাহাজের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল আর হাওয়াই জাহাজ একেবারে হাজার ফুট নিচে নেমে গেল। দারুণ হৈচৈ পড়ে গেল। লোকে মনে করল, অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। ততক্ষণে আপনাথেকেই সব ঠিক হয়ে গেছে। ইঞ্জিন আবার চলতে শুরু করেছে। হাওয়াই জাহাজের ইঞ্জিনীয়ার পরীক্ষা করে কী দেখলেন, জানেন? তামাকের ব্যবসায়ী একবার কার্ল জ্যাস্পার্সের নাম করেছিল। তারই আঘাতে হাওয়াই জাহাজের ইঞ্জিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর সব যাত্রী ব্যবসায়ীকে অনুরোধ করল, হয় চুপ করে থাকুন, নয়তো তামাকের কথা বলুন। নইলে অ্যাকসিডেণ্ট হবে।"

রঙ্গনাথ হাসতে লাগল, "আজ আপনি খুব মজার মজার কথা বলছেন।"

প্রিন্সিপাল ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "আপনার কাছে রোজ আমি এই রকম কথাই বলতে পারি। কিন্তু আপনি বলার সুযোগ দেন কোথায়! আজকাল তো আপনি খান্না মাস্টারের কথায় চলছেন।"

তাঁরা ফিরলেন। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। বাতাসে শীত শীত করছে। রাস্তার ধারে এক জায়গায় কয়েকজন যাযাবর পড়ে আছে। তারা আগুন পোহাচ্ছে আর এমন ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে যা সাদা জামাকাপড় পরা লোকেরা বুঝতে পারে

না। যাবার সময় প্রিন্সিপালসাহেব যেমন নিস্পৃহভাবে গোরু-মোষের দল পার করে গেছেন, ফেরার সময়ও তেমনি এই-সব যাযাবরদের পার হয়ে এলেন। রঙ্গনাথ শুধু একবার পেছন ফিরে দেখল আর বলল, "বড়ো বেশি শীত পড়েছে।"

প্রিন্সিপালসাহেব আবহাওয়া সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইলেন না। তিনি তাঁর পুরনো কথায় অটল। তিনি বলতে লাগলেন, "তোমরা এখনও মানুষ চিনতে শেখো নি। আমি শুনেছি, রুপ্পন এখন খান্নার খপ্পরে এসে গেছে। তা তোমার চিন্তা করা উচিত বাবু রঙ্গনাথ যে, এই খান্না আসলে কী চিজ। খান্না মাস্টার অত্যন্ত ধূর্ত মানুষ। দেখলে না, সেদিন কলেজে মারপিট লাগিয়ে দিল। ওর তো কিছু হ'ল না, কলেজের সম্মান নষ্ট হ'ল।"

রঙ্গনাথ বলল, "কিন্তু আমি তো শুনেছি, দু'পক্ষই ঝগড়া করেছে।"

প্রিন্সিপালসাহেব সাধুদের মতো বললেন, "তোমার শোনায় কী হবে বাবু রঙ্গনাথ! এখন তো ব্যাপারটা এজলাসে। ম্যাজিস্ট্রেট যেমন বুঝবে তেমন রায় দেবে।"

"কিন্তু ব্যাপারটা খুব খারাপ।"

"খারাপ? হাঁটুজলে ডুবে মরা উচিত, রঙ্গনাথবাবু! কিন্তু খান্না মাস্টারের অত লাজলজ্জা নেই। আমাদেরই ওর গলায় পাথর বাঁধতে হবে, তারপর ডুববে।"

প্রচার বিভাগের লোকেরা যেমন কেউ শুনুক বা না-শুনুক, বলার দরকার, বলে যায় তেমনি প্রিন্সিপালসাহেবও বলে চললেন, "পুলিস জবরদস্তি করে দু পক্ষের ওপর 107 নম্বরের মকদ্দমা চালিয়ে দিল। একেই বলা হয় পুলিসের হারামিপনা। বদমাশি করল খান্না, মারপিট করল তার সঙ্গী-সাথীরা, আর তাদের সঙ্গে

আমার লোকেরাও চালান হ'ল। এটা অন্ধের নগরী চৌপট রাজা। কালই তো শুনানি ছিল, আমাদের বলা হ'ল, মিটমাট করে নাও। আমরা বললাম, মিটমাটের দরকার কী? সোজাসুজি আমাদের ফাঁসি দিয়ে দাও, সব ঝগড়া মিটে যাবে। শিবপালগঞ্জে কেবল খান্না মাস্টার আর তার গুণ্ডারা থাকুক। তা হলে না হবে ঝগড়া, না হবে বিবাদ। আমরা চুপচাপ ফিরে এলাম। আর ওদিকে ওরা সত্তরটা ছেলে নিয়ে 'প্রিন্সিপাল মুর্দাবাদ' ধ্বনি দিতে লাগল। শহরের আদালত, অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, এরা কারা। তখন খান্না মাস্টার নিজেই বলল, এরা সব ছঙ্গামল কলেজের ছাত্র। বেহায়া হলে এমনই হয়। বুঝলেন বাবু রঙ্গনাথ! এই হলেন আপনার খান্না মাস্টার। রুপ্পনবাবুকে বলে দিয়ো। তাঁকেও একদিন কাঁদতে হবে।"

তাঁরা থানার সামনে এসে পৌঁছুলেন। কয়েকজন সেপাই লণ্ঠন নিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। বেশ শোরগোল চলছে। কয়েকজন ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোরাস গাইছে। থানার পাশে দারোগাবাবুর কোয়ার্টারের সামনে তিনটে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলোতে মাল বোঝাই করা হচ্ছে। সেপাইদের দৌড়োদৌড়ি আর শোরগোলের কারণ এ-ই।

প্রিন্সিপালসাহেব বললেন, "মনে হচ্ছে, দারোগাবাবু বদলি হয়ে গেছেন।"

কথাটা বলতে বলতেই তার অর্থ সবচেয়ে আগে তাঁর ওপরই ভালোভাবে স্পষ্ট হ'ল। রঙ্গনাথের কাঁধ ঝাঁকিয়ে তিনি আনন্দে

বলে উঠলেন, "এই ব্যাপার! এই এলাকাটা নোংরায় ভরে গিয়েছিল, এখন পরিষ্কার হ'ল।"

রঙ্গনাথ বলল, "কে জানে, এত তাড়াতাড়ি হুকুম এল কী করে। দুপুর পর্যন্ত তো কোনো খবর ছিল না।"

প্রিন্সিপালসাহেবের আনন্দ দেখতে দেখতে বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, তিনি হাত দুটো ছড়িয়ে একেবারে হাওয়ায় উড়ে যাবেন আর সামনের গাছের মগডালে বসে বুলবুলির মতো গান ধরবেন। তিনি বললেন, "বাবু রঙ্গনাথ, এতদিন মামার কাছে থেকেও তুমি তাঁকে চিনলে না! এর আগের থানাদারকে তিনি বারো ঘণ্টার মধ্যে তাড়িয়েছিলেন। ইনি তো চব্বিশ ঘণ্টা পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।"

প্রিন্সিপালসাহেব ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, "বৈদ্যজীর কাছ থেকে কেউ পার পেতে পারে? যেদিন ইনি যোগনাথের জামিন নিতে অস্বীকার করেছিলেন সেইদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এঁর যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। সেইসঙ্গে আমার 107 নম্বরের মকদ্দমা। তুমি নিজেই বলো বাবু রঙ্গনাথ, আমাকে চালান করার কী দরকার ছিল? কিন্তু কে ওঁকে বোঝাবে? রামাধীন এঁর বাপ বনে গিয়েছিল, যেমন চাইতেন তেমন এঁকে ঘোরাতেন। এখন দেখলেন তো, দশদিনও কাটল না বদলি হয়ে গেলেন।"

ছেলের দল আগের মতোই কোরাস চালাচ্ছে, "দারোগাবাবু বদলি হয়ে গেলেন, দারোগাবাবু বদলি হয়ে গেলেন।"

রঙ্গনাথ আর প্রিন্সিপালসাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্রাকগুলোতে মাল বোঝাই দেখতে লাগলেন।

একটা ট্রাকে বেশ বড়ো বড়ো কয়েকটা শিশুকাঠের পালঙ্ক তোলা হয়েছে, বাকি জায়গাটায় একটা সুন্দর গোরু আর তার বাছুর। প্রিন্সিপালসাহেব বললেন, "মোষটা দেখতে পাচ্ছি না যে! খুব ফার্স্ট ক্লাস মোষ।"

রঙ্গনাথকে তিনি বোঝালেন, "গোরুটা তাঁকে টিকৈতগঞ্জের ঠাকুররা দিয়েছিলেন। বিধবা পুত্রবধূর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ব্যাপার। গোদান করে রেহাই পেয়েছেন।"

কাউকে উদ্দেশ না করেই আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মোষটা কোথায় গেল? দেখতে পাচ্ছি না!"

অন্ধকারের মধ্যে কে যেন জবাব দিল, "বিক্রি হয়ে গেছে।"

"কোথায়?"

"শহর থেকে একজন গোয়ালা এসেছিল।"

"কততে বিক্রি হ'ল?"

"এক শয়ে। তুমি কী ভেবেছিলে, হাজারে?"

"আমি তো এখনও তাই ভাবছি।" প্রিন্সিপালসাহেব বেশ মৌজ করে জবাব দিলেন। তারপর রঙ্গনাথের কাঁধ ধরে এমনভাবে ঝাঁকানি দিলেন যে, এই-সব কথাবার্তা সে-ও যেন মৌজ করে শোনে।

ট্রাকের কাছে কেবল পালঙ্ক পড়ে আছে। রঙ্গনাথ শুনেছিল যে, দারোগাবাবুর পালঙ্কের খুব শখ। আজ সে তা দেখতে পেল। বেশ হৈচৈ করে সোৎসাহে ট্রাকের ওপর পালঙ্ক তোলা হচ্ছে। কতকগুলো আগেই তোলা হয়েছে, কতকগুলো তোলা হচ্ছে, আর কতকগুলো তোলা হবে। রাস্তায় যে ছেলের দল কোরাস গাইছিল তারা অন্ধকার সত্ত্বেও কাছে এসে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পালঙ্ক তোলা দেখতে লাগল। একজন সেপাই পালঙ্কের ওপর চড়ে,

নিচে লণ্ঠন ঝুলিয়ে, যারা পালঙ্ক তুলছে তাদের উৎসাহ দিয়ে বলছে, "আরে, এই! ভেঙে ফেললে তো জোড়টা। আমি আগে থেকেই জানতাম, জোড়টা না ভেঙে তোমরা ছাড়বে না।" তার চিৎকার শুনলে মনে হবে, পালঙ্কের জোড় ভাঙলে তা আজকের দিনে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা হবে। রঙ্গনাথও সান্ত্বনা দিয়ে নরমস্বরে বলল, "না ভাই, জোড়টা ভেঙো না। দেখেশুনে তোলো।"

প্রিন্সিপালসাহেব রঙ্গনাথের কথা শুনে জোরে হেসে উঠলেন। একজন সেপাই পালঙ্কের পরিচর্যায় কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়েই তার জায়গা থেকে বলে উঠল, "কে? প্রিন্সিপালসাহেব নাকি? জয়হিন্দ প্রিন্সিপালসাহেব।"

"কী হ'ল ভাই? জয়হিন্দ। বদলি হয়ে গেল নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রিন্সিপালসাহেব। দারোগাবাবু ক্যাপ্টেনসাহেবের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন। মেয়ের পড়াশোনার ব্যাপার। শহরে বদলি হতে চান।"

"আমাদের কলেজেই পড়াতেন। শিবপালগঞ্জ কোন্ শহর থেকে কম?"

"আপনার কলেজ তো হিন্দুস্থানী স্কুল। উনি ইংরেজী পড়াবেন। মিশনারি স্কুলে। বেবির ইউনিফর্ম তৈরি হয়ে গেছে। নীল রঙ। পরলে একেবারে ইংরেজের মতো দেখায়।"

"তা হলে উনি বদলি হয়ে শহরে যাচ্ছেন! এ তো ভালোই। কিন্তু গোরুটা রাখবেন কোথায়? ভুসি পাবেন কোথা থেকে? বিক্রি করবেন নাকি?"

সেপাই সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা পালঙ্ক ওপরে তুলল। কুঁততে

কুঁতেতে বলল, "না, গোরুটা ফৌজী ফার্মে থাকবে। দারোগাবাবুর ভাই ওখানে চাকরি করেন। এখানে তো বেচারা গোরুটার জন্য বিশেষ কিছু করতে হয় নি, খাওয়াবার দিন তো এখন আসছে।"

ট্রাকের ওপরে যে সেপাইটা আছে তার সমস্ত মন জোড়ের ওপর। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে চলেছে, "সাবধানে! আরে সাবধানে তোলো। আরে, আরে, এখন এই পালঙ্কটা আবার ভেঙো না। যদি ভাঙে তা হলে শালা, বুঝবে···।

কে যেন হঠাৎ খবর দিল, বৈদ্যজী এইমাত্র দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বলছেন, তিনি থাকতে দারোগাবাবুর বদলি কেমন করে হতে পারে। তিনি তাঁর বদলি রদ করে দেবেন।

প্রিন্সিপাল রঙ্গনাথকে বললেন, "লজ্জাশরম থাকলে কাল সকালে মুর্গিডাকার আগেই শিবপালগঞ্জ ছেড়ে চলে যাবে।"

প্রিন্সিপালসাহেব কিছুক্ষণ জিনিসপত্রগুলো দেখতে লাগলেন। রঙ্গনাথ বলল, "দারোগাবাবুর দেখছি পালঙ্কের বড়ো শখ।"

প্রিন্সিপালসাহেব বললেন, "যা ফোকটে পাওয়া যায় তাতেই তাঁর শখ।" তারপর হঠাৎ ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সেপাইটাকে বললেন, "আরে ভাই সেপাই, ঐ ভাঙা জোড়ওয়ালা পালঙ্কটা রেখে যাও-না। এক টাকা দেড় টাকায় নীলাম যদি হয়, আমি নিয়ে নেব।"

সেপাই বলল, "আপনি বড়ো মানুষ হয়ে কেমন ছোটো কথা বলছেন! নিতে হয় তো পুরো ট্রাকটাই নিয়ে যান। বলুন, পাঠিয়ে দিই এখুনি।"

প্রিন্সিপালসাহেব হেঁ হেঁ করে উঠলেন, "পুরো ট্রাক নিয়ে আমি কী করব! সাধারণ মাস্টার মানুষ।" তারপর গলার স্বর বদলে

অসাধারণ মানুষের মতো জিজ্ঞাসা করলেন, "দারোগাবাবু বাড়িতেই আছেন তো? বৈদ্যজীও আছেন? তা হলে চলুন বাবু রঙ্গনাথ, দারোগাবাবুকে সেলাম করে আসি। বেচারা বড়ো ভালো মানুষ ছিলেন। কখনও কারও ওপর অত্যাচার করেন নি। কারও কাছ থেকে কিছু চানও নি কখনও। ভগবান যতটুকু দিয়েছেন তা-ই চোখ বুজে নিয়েছেন।"

রঙ্গনাথ মনে মনে বলল, সত্যিই বেচারা বড়ো ভালো মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁকে চলে যেতে হ'ল।

উনিশ

চামারপাড়া আর উঁচু জাতের লোকদের বস্তির মাঝখানে যে গান্ধী চবুতরাটা আছে সেখানে আজ কুকুর নয়, মানুষের কথা শোনা যাচ্ছে। নির্বাচনের আগে রামাধীনের ভাই জায়গাটার সংস্কার করিয়েছে। কারণ, নির্বাচন আইনে হয়তো লেখা আছে, অথবা কে জানে কেন, সমস্ত বড়ো বড়ো নেতাই নির্বাচনের আগে নিজের নিজের নির্বাচনকেন্দ্রে সংস্কার করান। কেউ নতুন পুল তৈরি করান, কেউ রাস্তা তৈরি করান, কেউ গরিবদের অন্নবস্ত্র দান করেন। সেই হিসাবেই রামাধীনের ভাই চবুতরার চারপাশের নকশা বদলে দেবার চেষ্টা করেছে।

এখানে বেশ বড়ো একটা নিমগাছ আছে। গাছটা অনেক বুদ্ধিজীবীর মতো দূরদূর পর্যন্ত হাত-পা ছাড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তার গোড়াটা ফাঁপা। রামাধীনের ভাই তার নিচে একটা কুয়ো তৈরি করিয়ে দিয়েছে। আসলে কুয়ো এখানে আগে থেকেই ছিল, রামাধীনের ভাই সেটাকে সংস্কার করে কালের রীতি অনুযায়ী সরকারি কাগজপত্রে কুয়ো তৈরির কথা লিখিয়ে দিয়েছে। সরকার থেকে মোটা অনুদান পাবার এটা একটা নৈতিক উপায় না হলেও রাজনৈতিক উপায়। আগে এই কুয়োটা বর্ষার সময় আশপাশের উঁচু জমির জল টেনে নিয়ে এই এলাকায় বন্যা রোধ করত। এখন তার চারদিকে পাড় তুলে দেওয়া হয়েছে। এটা একটা পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায় করা হয়েছে। কুয়োর দুদিকে দুটো থাম তৈরি করে সে কথাটা স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয়েছে। একটা থামে লেখা আছে: "তৃতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা। গ্রামসভা শিবপালগঞ্জ। এই কুয়োর শিলান্যাস করেছেন পশুচিকিৎসক শ্রী ঝাইলাল। সভাপতি শ্রী জগদম্বাপ্রসাদ।"

পাড় তৈরি করার ফলে এখন আর বাইরের জল ভেতরে যায় না, বরং ভেতরের জল বাইরে আসে। এই জলের অন্তিম রূপ শীতল-মন্দ-সুগন্ধ। খুব বড়ো একটা নালায় আটকা পড়ে ঐ জল গ্রামবাসীদের প্রস্তাব দিচ্ছে, পেটে ক্রিমি থাকার অভিজ্ঞতা তো তোমাদের হয়েই গেছে; এখন এসো, কিছু ম্যালেরিয়া আর ফাইলেরিয়ার অভিজ্ঞতাও নিয়ে যাও।

কুয়ো সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধী-চবুতরারও উন্নতি হয়েছে। তাতে কয়েকটা নতুন ইঁট বসানো হয়েছে আর তার ওপর যে সিমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, ঠিকাদারের হাতের স্পর্শ পাবার পর পনেরো

দিন কেটে গেলেও তা চটে নি। এই অবস্থায় চবুতরাটা আগের চেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক হয়েছে, আর কলেজের বেকার ছেলেরা মাঝে মাঝে ওখানে বসে জুয়া খেলে। সন্ধ্যায় বদ্রী পালোয়ানের আখড়ার ছেলেরাও এখন এখানে আসতে আরম্ভ করেছে। তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, চবুতরার ওপর বসে ঘাড়ের মাটির প্লাস্টার ঘষে ঘষে তোলার জন্যই তারা এখানে আসে।

আজ নির্বাচন। কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। নির্বাচন অবশ্য অন্য জায়গায় হবে, নিশ্চয় চামারপাড়া থেকে দূরে। কিন্তু এখন গান্ধী-চবুতরায় প্রচুর ভিড়। গান্ধীজী যেমন চাইতেন, সবশ্রেণীর লোক এখানে একসঙ্গে বসে আছে। জুয়াড়ীরা তাদের তাস পকেটে রেখে দিয়েছে। আখড়ার পালোয়ানরা কুস্তি না লড়ে, গায়ে মাটি না মেখে, কেবল সরষের তেল মালিশ করেই তাদের উপস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছে।

রুপ্পনবাবু বড়ো ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে আসছেন। তাঁর চোখেমুখে রোজকার সেই চটপটে ভাব আর ধূর্ততা নেই। গান্ধী-চবুতরার কাছে তাঁকে আসতে দেখে এক নতুন পালোয়ান চোখ টিপে জিজ্ঞাসা করল, "বলো বাবু, কী খবর?"

উত্তরে রুপ্পনবাবু চোখ টিপলেন না, এ কথাও বললেন না যে, 'তুমিই বলো রাজা, তোমার কী খবর।' শুধু মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন, তোমরাই ঠাট্টা করো, আমি করব না, কারণ আমার মুড খারাপ।

রুপ্পনবাবুর চোখে কালো চশমা, ঘাড়ে রেশমী রুমাল। মন্দ-মন্থর গতিতে তিনি এসে চবুতরার ওপর ধপ করে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণের জন্য সমবেত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল।

ছোকরা পালোয়ানটা অলসভাবে তার হাতটা ছড়িয়ে দিল, তারপর কনুইয়ের কাছে মুড়ল। কনুইয়ের ওপর ছোট্ট একটু মাংসপেশী ঠেলে বেরুল। সেটাকে সস্নেহে বার বার দেখতে দেখতে রুপ্পনবাবুর পাশে এসে বসল। আবার চোখ টিপে রুপ্পনবাবুর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করল, "কী ব্যাপার বাবু? আজ রঙ কিছু বদরঙ হচ্ছে!"

রুপ্পনবাবু তাঁর দোস্তের উপস্থিতি আর তার ভাষণশৈলীর ওপর কোনো গুরুত্ব দিলেন না। তিনি চুপ করে বসে রইলেন। কলেজের একটা ছেলে বলল, "গুরু, আমাদের তুমি কিছু করতে বললে না। নির্বাচনে রামাধীনের তরফে যে গরমি আছে, শনিচরের তরফে তা নেই।"

রুপ্পনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "এখন আর সর্দিগরমির কোনো প্রশ্ন নেই। নির্বাচনের ফলাফল এখুনি ঘোষণা করা হয়েছে। শনিচর জিতেছেন।"

ছোকরা পালোয়ান আর কলেজের ছেলেদের মধ্যে একটা হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। চারদিক থেকে একই প্রশ্ন, "কেমন করে? কেমন করে? শনিচর কেমন করে জিতলেন?"

চোখ টিপে রুপ্পনবাবুর বন্ধু বলল, "বলো না পালোয়ান, শনিচরটা জিতল কী করে?"

রুপ্পনবাবু ক্লান্ত স্বরে বললেন, "মহিপালপুরওয়ালা কায়দায়।"

নির্বাচনে জেতার তিনটে কায়দা আছে: রামনগরওয়ালা কায়দা, নেওদাওয়ালা কায়দা আর মহিপালপুরওয়ালা কায়দা।

রামনগরে একবার গ্রামসভার নির্বাচনে দুজন প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন। রিপুদমনসিংহ আর শত্রুঘ্নসিংহ। দুজনেই জাতিতে এক। তাই জাতির ভিত্তিতে স্বাভাবিকভাবে ভোট ভাগবাটোয়ারা করা কঠিন হয়ে পড়ল। যারা ঠাকুর তারা এই সংকটে পড়ল যে, এ-ও ঠাকুর ও ও ঠাকুর, কাকে ভোট দেব আর কাকে দেব না। যারা ঠাকুর নয় তারাও এই দ্বন্দ্বে পড়ল যে, এরা যখন আমাদের জাতই নয় তখন এদের ভোট দিলেই বা কী আর না দিলেই বা কী। কিছু-দিন পর জানা গেল যে, রিপুদমনসিংহ আর শত্রুঘ্নসিংহ দুজনের নামের অর্থও এক আর সেই অর্থ হচ্ছে, এমন সিংহ, যে শত্রুকে খেয়ে ফেলে। এরপর গ্রামের লোকেরা প্রজাতন্ত্রের রীতি অনুসারে এই সিদ্ধান্ত করল যে, যার ইচ্ছে সভাপতি হোক, আমাদের কী? খেয়ে ফেলুক না ওরা একে অপরকে।

নির্বাচনের পাঁচদিন আগেও এইরকম উদাসীনতা ছিল। প্রার্থীরা ভোটের জন্য লোকের কাছে গেলে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলত, "আমরা ভোট নিয়ে করব কী! যত ভোট চাও, দিয়ে দেব।"

এ-সব কথা থেকে দুজন প্রার্থীর মনেই নিশ্চিত ধারণা হ'ল কেউই তাঁদের ভোট দেবে না। ঘাবড়ে গিয়ে তাঁরা প্রজাতন্ত্রের দোহাই দিতে লাগলেন। লোকেদের তাঁরা ভোটের মূল্য বোঝাতে শুরু করে দিলেন। তাঁরা বললেন, "যদি তোমরা তোমাদের মহামূল্য ভোট ভুল লোককে দাও তা হলে প্রজাতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়বে।" লোকে বুঝতে পারল না। যারা বুঝল তারা বলল, "ভুল লোককে ভোট দিলে প্রজাতন্ত্রের কোনো বিপদ হবে না, তোমরা ভোট দিতে পারো, প্রজাতন্ত্রের পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। ভুল-ঠিক তা হয়েই থাকে, দেখছ না, সারা দেশে কী হচ্ছে··· ।"

এরকম কথা অবশ্য দু-একজনই বলে, কিন্তু প্রজাতন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবার পক্ষে এ ক'জনই যথেষ্ট। তাই দুই প্রার্থীই তাঁদের নিজেদের প্রচারপদ্ধতি বদলে ফেললেন, প্রধানের অধিকার নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন যে, তাঁরা গ্রামের পতিত জমিগুলো যাদের ইচ্ছে দিতে পারেন আর যে-সব পতিত জমি বে-আইনীভাবে দখল করা হয়েছে সেগুলো তাঁরা বেদখল করাতে পারেন।

যাঁরা "গোদান" বইটি পড়েছেন আর যাঁরা "দো বিঘা জমিন" ছবিটি দেখেছেন তাঁরা জানেন, চাষীরা প্রাণ দিয়ে জমি ভালোবাসে। শুধু তা-ই নয়, তারা তাদের নিজেদের জমির চেয়ে পরের জমি বেশি ভালোবাসে, আর সুযোগ পেলেই পাশের জমির জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। এর পেছনে নিশ্চয় সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা নয়, সহজ ভালোবাসা আছে। আর এই ভালোবাসার জন্য চাষী বসে তার ক্ষেতের আলের পরে, কিন্তু তার গোরু-মোষ চরায় পাশের জমিতে। আখ খেতে হলে নিজের ক্ষেতটা বাদ দিয়ে পাশের ক্ষেত থেকে তোলে আর লোককে বলে, "দেখো, আমার ক্ষেতে কেমন চুরি হচ্ছে।" অবশ্য ভুল কিছু বলে না, কারণ তার ক্ষেতের পাশে যেমন অন্যের ক্ষেত আছে তেমনি অন্যের ক্ষেতের পাশেও তার ক্ষেত আছে এবং অন্যের জমির জন্য সকলেরই মনে সহজ ভালোবাসা আছে।

এ-সব কথা "গোদান" বইতে এতটা স্পষ্ট করে লেখা হয় নি এবং বোম্বাই-মার্কা ছবিতে— হয়তো কৃষ্ণচন্দর আর খাজা আহ্‌মদ আব্বাসের ভয়ে অথবা প্রগতিশীলতার উচ্ছ্বাসে অর্ধেক অন্ধ হয়ে যাবার দরুন, কিংবা কেবল অশিক্ষার দরুন— দেখানোও হয় নি ভালো করে। তাই একটু পরিষ্কার করেই বলতে হ'ল, যদিও আমাদের দেশে পরিষ্কার করার কাজ শিল্পীদের নয়। তবু…।

তো যেই গ্রামের লোকেরা জানতে পারল, গ্রামপঞ্চায়েতের কাজ জমির লেনদেন নিয়ে এবং তাদের পাশের জমিগুলো তাদের হতে পারে আর অমুক চাষী বেওয়ারিশ অবস্থায় মারা গেছে বলে তাদের তার সম্পত্তির মালিক হিসাবে ঘোষণা করে তাদের রাজ-অভিষেক হতে পারে, অমনি চাষীদের সহজ ভালোবাসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। জমির প্রতি এই ভালোবাসা ভোটারদের গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতি ভালোবাসা প্রধান পদের প্রার্থী দুজনের দিকে ঠেলে দিল, এবং নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের মাথা একেবারে সক্রিয় হয়ে উঠল। চীনা হামলার সময় আচার্য কৃপলানী সারা দেশে যে মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন, এখন তাদের মনে সেইরকম একটা সমস্যা সৃষ্টি হ'ল। তারা ভাবতে লাগল, নিরপেক্ষ থাকার কোনো মানে হয় না। এর মধ্যে দুর্বলতাও আছে, লোকসানও আছে— আর যদি শান্তিতে থাকতে চাও তা হলে রিপুদমন আর শক্রঘ্নর মধ্যে যে-কোনো একজনের নেজুড় ধরে ফেলো আর খুব বেশি নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা কোরো না, তা হলে দুদিক থেকেই মারা পড়বে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার সমস্যাটা আমরা চুপচাপ পার করে ফেলেছি। এইরকমভাবে অনেক সমস্যাই আমরা পার করে ফেলেছি। কিন্তু রামনগরের লোকদের অহংকার ছিল যে, তারা তাদের ভালোমন্দ বেশি বোঝে। তাই তারা এই সমস্যা এড়ানো উচিত মনে করল না। দেখতে দেখতে পুরো গ্রামটা দু দলে ভাগ হয়ে গেল। যারা রিপুদমনকে দিয়ে পতিত জমিগুলো ভাগ-বাটোয়ারা করতে চাইল তারা এক দলে গেল, আর যারা এ কাজে শক্রঘ্নসিংহকে বেশি দক্ষ মনে করল তারা অন্যদলে গেল।

নির্বাচনের দুদিন আগে দুতরফেই যথেষ্ট আয়োজন দেখা গেল।

লোকে গলা ফাটিয়ে ইনক্লাব-জিন্দাবাদ ধ্বনি দিল, একে অন্যের মা-বোনের ওপর আগ্রহ দেখানোর মতো কথা বলল, নিজেদের লাঠিতে তেল লাগাল, বর্শাবল্লম ঘষেমেজে চকচকে করে লাঠিতে ফিট করল, আর হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে ঐ মুঠোর মধ্যে গাঁজার ছিলিম ধরল। এতসব যখন হয়ে গেল তখন রিপুদমনসিংহ তাঁর ছোটো ভাই সর্বদমনকে ডেকে প্রাণ ঢেলে বললেন, "ভাই, এই যুদ্ধে যদি আমার প্রাণ চলে যায় এবং আমার সঙ্গে আরও পঁচিশ-জনের প্রাণ চলে যায় তা হলে তুমি কী করবে?"

সর্বদমনসিংহ এমনিতে ওকালতি পাস ছিলেন, কিন্তু আগেকার দিনে যেমন অনেক বড়ো বড়ো উকিল-ব্যারিস্টার ওকালতি ছেড়ে রাজনীতিতে গিয়েছিলেন তেমনি তিনিও ওকালতি ছেড়ে গত চার বছর যাবৎ স্থানীয় রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পার্থক্য শুধু এই যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনীতিতে যে-সব উকিল আসতেন তাঁদের অনেকেরই আয়ের পথ লোকে জানতে পারত না, কিন্তু সর্বদমনের জীবিকার পথ সবারই ভালো করে জানা আর সকলেই তাঁর সঙ্গে খাতির করে কথা বলে। তাঁর কাছে দশটা গ্যাসবাতি আছে, বিয়ের মরশুমে সেগুলো তিনি ভাড়া খাটান। তাঁর কাছে দুটো বন্দুকও আছে, তা-ও ডাকাতির মরশুমে ভাড়া খাটে। সব মিলিয়ে সর্বদমনের যা আয় হয় তাতে তিনি অনায়াসেই গ্রামের রাজনীতি পরিচালনা করতে পারেন। গ্যাসবাতি আর বন্দুক ভাড়া খাটতে দূর দূর পর্যন্ত যায়, আর তারই জন্য তাঁর সামাজিক সম্পর্ক অনেক ব্যাপক আর গভীর হতে পেরেছে আর তিনি কথা বলার ক্ষমতা আর আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পেরেছেন।

সর্বদমন উপযুক্ত মাত্রায় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাদার কথার জবাব

দিলেন। তিনি বললেন, "দাদা, যদি তুমি আর তোমার পঁচিশজন লোক এই যুদ্ধে মারা যায় তা হলে অন্যদিকে শত্রুঘ্নসিংহ আর তাঁর পঁচিশজন লোক মারা যাবে। এটুকু তো হিসাবমতো হবে, এর পর তুমি যেমন বলবে তেমন হবে।"

রিপুদমন সর্বদমনের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদার চেষ্টা করলেন। ফিল্মের অভিনেতাই হোন কি রাজনৈতিক নেতা, সবাই ইচ্ছামাত্র কাঁদতে পারেন। কিন্তু তেমন অভ্যাস না থাকার দরুন রিপুদমনের চেষ্টা সফল হ'ল না। সর্বদমন তাঁকে আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "যেতে দাও। এখন বলো, পঁচিশ-পঁচিশের হিসাব ঠিক করার পর কী করতে হবে।"

রিপুদমন বললেন, "মনে করো, তারপর আবার নতুন করে প্রধান নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হ'ল, আর তুমি প্রধান হতে চাও। তা হলে কী হবে ?"

সর্বদমন কাগজ-পেন্সিল নিয়ে এলেন। তারপর যোগ-বিয়োগ করে বললেন, "দাদা, যদি তুমি আর শত্রুঘ্নসিংহ তোমাদের পঁচিশ-জন করে লোক নিয়ে মারা যাও তা হলে আমি কি, আমার তরফের যে-কেউ অন্য তরফের যে-কোনো লোকের চেয়ে পঞ্চাশটা ভোট বেশি নিয়ে জিতবে। কারণ, গ্রামের ভোটারদের মধ্যে ও-তরফে মরতে পারে খুব বেশি হলে পঁচিশজন, যেখানে আমাদের তরফে এই সংখ্যা চল্লিশেরও বেশি। ও-তরফে ঐ পঁচিশজন যদি মারা যায় তা হলে ধরে নাও ওদের সারা মহল্লাই মারা গেছে, সেখানে আমাদের তরফে পঁচিশজন মারা গেলেও বাকি পনেরোজন হাতে থাকবে।"

নির্বাচনের তিনদিন আগে রিপুদমন সাবডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেটের

আদালতে শত্রুঘ্নসিংহ আর তাঁর পঁচিশজনের বিরুদ্ধে এই বলে এক দরখাস্ত দাখিল করলেন যে, তাঁদের ধনপ্রাণ বিপন্ন আর নির্বাচনের সময় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে। পুলিস দরখাস্তটা সমর্থন করল। এই দরখাস্তের জবাবে শত্রুঘ্নসিংহও রিপুদমন আর তাঁর চল্লিশজনের বিরুদ্ধে ঐ একই রকম দরখাস্ত পেশ করলেন। পুলিস এই দরখাস্তটাও সমর্থন করল; কিন্তু তার সঙ্গে একটা অঙ্ক জুড়ে দিল যে, এটা রিপুদমন আর তাঁর মাত্র পঁচিশজন সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

নির্বাচনের একদিন আগে তুজন প্রার্থী আর তু-তরফের পঁচিশ-পঁচিশজনকে হাজির করা হ'ল। ম্যাজিস্ট্রেট শত্রুঘ্নসিংহ আর তাঁর দলের কাছ থেকে জামানত আর মুচলেকা চাইলেন। তাঁরা তা দেবেন কিনা ভাবতে লাগলেন। ম্যাজিস্ট্রেট রিপুদমন আর তাঁর দলের কাছ থেকেও জামানত আর মুচলেকা চাইলেন। রিপুদমন বললেন, "হুজুর, আমরা জামানত আর মুচলেকা দেব না। আমাদের কথা মনে রাখবেন, কাল আমাদের গ্রামে গণহত্যা হবে। অতি বড়ো জামানতও শত্রুঘ্নসিংহ আর তাঁর গুণ্ডাদের ঝগড়া করা থেকে নিরস্ত করতে পারবে না। আমরা সাদাসিধে চাষী মানুষ, আমরা কী করে তাঁদের সঙ্গে মোকাবিলা করব! তাই একটা কাজ করুন হুজুর, আমরা জামানত দিতে পারছি না বলে আমাদের হাজতে আটকে রাখুন। হাজতে আটকে থাকলে আমাদের প্রাণটা তো বাঁচবে। কিন্তু শত্রুঘ্নসিংহের জামানতের ওপর বিশ্বাস করবেন না হুজুর। আমাদের বংশের তু-চারজন গ্রামে থাকবে, তাদের প্রাণ বাঁচাবার ব্যবস্থাটা করবেন।"

রিপুদমন কাঠগড়াটাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদার চেষ্টা করলেন।

পুলিস রিপুদমনের এই কথাগুলোও সমর্থন করল। সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেট স্থির করলেন যে, যখন রিপুদমনসিংহ আর তাঁর পার্টি নির্বাচনের সময় জেলে থাকবেন শত্রুঘ্নসিংহ আর তাঁর পার্টির জামানত মঞ্জুর করা হবে না। তাঁদেরও জেলে থাকতে হবে।

এইভাবে দুজন প্রার্থী আর তাঁদের পঁচিশজন করে লোক কিছুদিনের জন্য মারা গেলেন। এর ফলে নির্বাচন খুব শান্ত ও সভ্য পরিবেশে সম্পন্ন হ'ল। দক্ষতার দিক দিয়ে এই নির্বাচনে শত্রুঘ্নসিংহের লোকেরা খুবই অপদার্থ প্রমাণ হ'ল। তাঁর তরফের কোনো লোক গ্রামে আছে কিনা তা-ই জানা গেল না। ওদিকে রিপুদমনের তরফ থেকে নির্বাচনে লড়াই করবার জন্য সর্বদমন ছিলেন, কারণ পুলিসের সমর্থন আর ওকালতির ডিক্রির সাহায্যে তিনি একজন শান্তিপ্রিয় লোক বলে গণ্য হয়েছিলেন। তাঁকে হাজতে রাখা দরকার মনে হয় নি। তিনি জমে নির্বাচনে লড়লেন, এবং তার ফল হ'ল যা আগেই কাগজে হিসাব করে রাখা হয়েছিল।

নির্বাচনের জেতার এই পদ্ধতি রামনগরের নামে পেটেণ্ট হয়ে আছে।

নেওয়াদা পদ্ধতি এর চেয়ে একটু বেশি আদর্শবাদী।

এখানে কয়েক জাতির লোক নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু প্রধান প্রার্থী ছিল দুজন। তাদের একজনকে বলা হয়েছে ঋগ্বেদের পুরুষ-ব্রহ্মের মুখ, আর অন্যজনকে পা। আজকের বিচারে সেটা ব্রাহ্মণ আর হরিজনদের মধ্যে সংঘর্ষ। কিন্তু নেওয়াদায় ব্যাপারটা খুবই সাংস্কৃতিক আর প্রায় বৈদিক উপায়ে নিষ্পন্ন হ'ল।

ব্রাহ্মণ প্রার্থী তার সবর্ণদের কাছে কয়েকবার ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্ত

পাঠ করল, এবং বোঝাল যে, ব্রাহ্মণই পুরুষ-ব্রহ্মের মুখ আর শূদ্র তাঁর পা। গ্রামসভার প্রধান সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বলল যে, তার মেধা আর বাণী থাকা দরকার। এই দুটো জিনিস পায়ে থাকে না, থাকে মাথায়— আর মাথাতেই থাকে মুখ। তাই স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মণেরই প্রধান হওয়া উচিত, শূদ্রের নয়।

শূদ্রদের তিরস্কার করার জন্য যে-সব গালিগালাজ প্রচলিত আছে, ব্রাহ্মণপ্রার্থী তার সাহায্য নিল না। তার বক্তব্য সে সাংস্কৃতিক স্তরে বোঝাতে থাকল। একটা অনুগ্রহ হিসাবে সে অবশ্য স্বীকার করল যে, পায়ের দরকার হয় এমন কোনো দৌড়ঝাঁপের কাজ, যেমন ন্যায়পঞ্চায়েতের চাপরাসীর কাজ, অবশ্যই শূদ্রদের পাওয়া উচিত, কিন্তু প্রধানের পদের জন্য শূদ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বেদ-বিরুদ্ধ।

কিন্তু সাংস্কৃতিক স্তরের এই-সব কথাবার্তায় ভোটাররা ভুলল না। তাই ব্রাহ্মণপ্রার্থীকে বাধ্য হয়ে তার প্রচার-পদ্ধতি বদলাতে হ'ল। এখন সে পুরুষ-ব্রহ্মের মুখের মতো তার নিজের মুখটা একটু বেশি উদারভাবে ব্যবহার করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তার লোকেরাও প্রচারের সুযোগে তাদের মুখ আরও খুলে ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। কিছুদিন পর আসল কথাটা সেই পুরনো জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল : বলো ঠাকুর কিষণসিংহ, আমাকে বাদ দিয়ে তুমি কি এখন ঐ চামারকে ভোট দেবে ?

দেখতে দেখতে গ্রামে ব্রাহ্মণপ্রার্থীর তরফ থেকে গালিগালাজের বন্যা বইতে লাগল। তারপর হঠাৎ একদিন পুরুষ-সূক্তের যে স্তোত্রে শূদ্রকে পা বলা হয়েছে তার অর্থ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল।

একজায়গায় ব্রাহ্মণপ্রার্থীর একজন লোক প্রাণ খুলে অপর প্রার্থীকে গালাগাল দিচ্ছিল। লোকটা চবুতরার ওপর বসে ছিল। তার

মুখ দিয়ে ধারাবাহিকভাবে যে-সব গালাগাল বার হচ্ছিল তার মধ্যে মূল কথাটা ছিল, "বলো ঠাকুর কিষণসিংহ, এখন কি তুমি ঐ…।" 'ঐ' কথাটার পরে আবার কিছু গালাগাল, তারপর বাক্যটার শেষ অংশ, "…চামারটাকেই ভোট দেবে?"

লোকটা চবুতরার ওপর বসে বলেই চলছিল। হঠাৎ তার কথা থেমে গেল। কোমরে এমন প্রচণ্ড একটা আঘাত অনুভব করল যে, মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বেরুল না। চবুতরার ওপর থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আরও গোটাদশেক আঘাত পড়ল। পরে যখন সে চোখ খুলল, দেখতে পেল, এ সংসার একটা স্বপ্ন। তার মোহনিদ্রা ভেঙে গেল। ব্রাহ্মণপ্রার্থী বুঝতে পারল যে, পুরুষ-ব্রহ্মের মুখ পুরুষ-ব্রহ্মের পা থেকে বেশি দূরে নয়; আর সংক্ষেপে, যেখানে মুখ চলে এবং তার জবাবে লাথি পড়ে সেখানে মুখ বেশিক্ষণ চলতে পারে না।

এই অনুসন্ধানে ব্রাহ্মণপ্রার্থী চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিন্তু এইসময় তাকে সাহায্য করার জন্য এমন এক সাধুর আবির্ভাব হ'ল, যিনি বিপন্ন চাষী থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো অফিসার, নেতা আর ব্যবসায়ীর মধ্যে অতি সহজেই নিজের শিষ্যকে চিনে নিতে পারেন।

এরপর যে ঘটনা ঘটল তা 'বত্রিশসিংহাসন' আর 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র গল্পের মতো। ব্রাহ্মণপ্রার্থী একদিন তার মুখের সীমিত প্রয়োগ সত্ত্বেও পুরুষ-ব্রহ্মের পায়ের ঠোকর খেয়ে কাত হয়েছিল, গ্রামসভার প্রধানের পদটা কীভাবে এই চামারের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে চামারটাকে ব্রাহ্মণের নিচে রাখা যায় তা নিয়ে চিন্তা করছিল। চিন্তাটা সে করছিল গ্রামের বাইরে একটা কুয়োর পাড়ের ওপর বসে 'নবনীল-নীল কোমল-কোমল ছায়াতরুবনে তমশ্যামল' সায়ংকালে এক

বটগাছের ধারে। এক সময় সে গাছের নীচে আগুনের ফুল্‌কি উড়তে দেখতে পেল আর সেইসঙ্গে রুক্ষগলায় শুনতে পেল শিব-শঙ্করের কয়েকটা বিশেষণ। ব্রাহ্মণপ্রার্থী বুঝতে পারল, গাছের নিচে কোনো সাধু আছেন।

সত্যিই ছিলেন। সাধু শিবশঙ্করের নাম করছিলেন আর গাঁজা খাচ্ছিলেন। দুঃখপীড়িত না হলেও কোনো মানুষ যদি তার সামনে কোনো সাধুকে দেখতে পায় তা হলে তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। আর এখানে তো ব্রাহ্মণপ্রার্থী দুঃখ-পীড়িত ছিল, তার সামনে ছিলেন সাধু। তাই কিছু চিন্তা না করেই সে সাধুর পায়ের ওপর গিয়ে পড়ল আর বিড়বিড় করে কীসব বলতে লাগল।

সাধুর জীবনে এমন ঘটনা বহুবারই ঘটেছে। তিনি তাঁর পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে ব্রাহ্মণ প্রার্থীকে অভয় দিলেন, “ঘাবড়িয়ো না বাবা, যদি তোমার স্বপ্নদোষ থাকে কি শীঘ্রপতন হয় অথবা ছেলেবেলার কুঅভ্যাসের দরুন তুমি ধ্বজভঙ্গ হয়ে গিয়ে থাকো তা হলেও তোমার ভাবনা নেই, আমার ওষুধে তুমি হাজার নারীর মানমর্দন করতে পারবে।” কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রার্থী মাথা নেড়ে জানাল যে, সে তা চায় না। তখন সাধু তাঁকে বললেন, “এই অত্যন্ত গোপন ওষুধে তুমি তো বশীকরণবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠবেই, তা ছাড়া তুমি যদি ঐ ওষুধ তৈরি করে বিক্রি করতে আরম্ভ করো তা হলে কিছুদিনের মধ্যেই কোটিপতি হয়ে যাবে। কিন্তু এ কথার পরেও ব্রাহ্মণপ্রার্থী কাঁদতে কাঁদতে মাথা নাড়তে থাকল। সাধু যখন বেশি খোঁচাতে লাগলেন তখন সে বলল, “হাজার নারীর মানমর্দন করার আমার দরকার নেই। একটা চামারের মানমর্দন করতে পারলেই আমার কাজ হয়ে যাবে।”

সাধু ব্রাহ্মণ প্রার্থীকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে তাকে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করার জন্য গাঁজার ছিলিম গাঁটে গুঁজে, নকল জটায় কিছুটা ধুলো ছড়িয়ে গ্রামের দিকে এগুলেন।

সাধু গ্রামের ভেতর এক মন্দিরের সামনে আস্তানা গাড়লেন। এবং পরের দিন থেকে কবীর আর রামানন্দ থেকে শুরু করে গুরু গোরখনাথ পর্যন্ত এমন-সব গল্প বলতে লাগলেন, যার শেষ কথা হচ্ছে: জাতিসম্প্রদায়-নির্বিশেষে হরিকে যে ভজনা করে, হরি তাকে আপন করে টেনে নেয়।

এই 'হরি' কী, তা-ও লোকে সেদিন সন্ধ্যা থেকে বুঝতে আরম্ভ করে দিল। একটা ছিলিমে গাঁজা ভরে তার ওপর জ্বলন্ত অঙ্গার ঠেসে দেওয়া হ'ল। তারপর গাল কুঁচকে আর গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে গাঁজা ধরানো হ'ল। এক নিশ্বাস থেকে আর-এক নিশ্বাসের মধ্যে যে সময়টা, সেই সময়টায় নানাভাবে নানা অর্থ করে শিবশঙ্করের নাম করা হ'ল। তারপর ছিলিমটা ভক্তদের মধ্যে হাতে হাতে ফিরতে লাগল। ভক্তরা বুঝতে থাকল, এই হচ্ছে "হরি"।

সাধুর দরবারে আটচল্লিশ ঘণ্টাব্যাপী কীর্তন শুরু হয়েছে। যারা গাঁজা খায় না তাদের জন্য ভাঙের ব্যবস্থা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কীর্তন চলল ততক্ষণ পর্যন্ত শিলের ওপর নোড়া চলতে থাকল। হারমোনিয়ম বাজতে রইল আর রাধাকৃষ্ণ ও সীতারামের সন্তুষ্টি-বিধানে এমন-সব গান গাওয়া হ'ল যার কাছে সিনেমার বড়ো বড়ো গান হার মেনে গেল।

দুদিন পরেই সাধু শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু

তিনি যে যমুনার জল না খেয়ে কেবল গাঁজা খেলেন আর পিশাচদের মতো শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে শঙ্করভগবানের একটু বেশি কাছে রইলেন, সে অন্য প্রশ্ন। এই সময়ে ছিলিম ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলতে থাকল আর প্রমাণ করতে থাকল যে, গাঁজা— তা সে চুরি করাই হোক, কি সরকারী দোকানের হোক, আর গঙ্গাজল— তা সে গঙ্গোত্রীরই হোক, কি নোংরা নালার সঙ্গমের হোক— তাদের প্রভাব সব অবস্থাতেই একরকম।

সাধু খুব হাসিখুশি মানুষ। তিনি কীর্তনের সমঝদারই শুধু নন, নিজে কীর্তন গানও করেন। এখন যদি তিনি গাঁজা না খেতেন তা হলে তাঁর গলা স্পষ্ট শোনা যেত, আর যদি এখানে হারমোনিয়ম না বাজত তা হলে তাঁর কীর্তনে একটা মিষ্টি সুরও পাওয়া যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধু দেখতে দেখতে সারা গ্রামটাকে তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেললেন। তিনি কবীর, রুইদাস আর রামানন্দের এমন-সব ভজন শোনালেন যে, লোকে এই-সব সাধুদের জয়জয়কার করতে লাগল। এই-সব সাধুরা যদি এখানে উপস্থিত থাকতেন তা হলে তাঁরাও এইরকম মৌলিক কবিতা শুনে সাধুর জয়জয়কার শুরু করে দিতেন।

সাধু এই প্রভাবে গ্রাম থেকে জাতিভেদের নাম মুছে ফেললেন। একদিন গাঁজা, ভাং আর কীর্তনের মধ্যে যখন তিনি আভাস দিলেন যে, গ্রামসভার প্রধান বড়ো ধার্মিক মানুষ তখন লোকে চমকে উঠল। একজন ভাংখোর বলল, এখনও পর্যন্ত কেউ প্রধান নির্বাচিত হন নি এবং এখানে এই নির্বাচন এই প্রথম হচ্ছে। সাধু এর উত্তরে আবার আভাসে জানালেন যে, আমার ভগবানই তো নির্বাচন করে দিয়েছেন।

সংক্ষেপে, নেশা ছুটে যাবার আগেই লোকে বুঝতে পারল যে, ব্রাহ্মণ প্রার্থীকেই ভগবান স্বয়ং প্রধান নির্বাচন করেছেন। নেশা ছোটার আগেই গ্রামের প্রায় সবাই তাঁকে প্রধান বলে স্বীকার করে নিল। এইভাবে লাথি পরাস্ত হ'ল, বিজয়ী হ'ল মুখ।

নির্বাচনে জেতার জন্য নেওয়াদার এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর প্রমাণ হ'ল। অন্যান্য গ্রামের লোকেরা এর সংশোধিত রূপ গ্রহণ করে অনেক বড়ো বড়ো নির্বাচনে জয় লাভ করেছে। যেখানে গাঁজাখোর সাধু পাওয়া যায় নি অথবা বেশি গাঁজা পাওয়া যায় নি সেখানে বেশির ভাগই লোকে কাউকে-না কাউকে সাধু বানিয়ে দেবীপুজোর আয়োজন শুরু করে দিয়েছে। এই-সব পুজোয় ছাগবলিও হ'ল, কারণবারির প্রসাদও দেওয়া হ'ল। এরও ঐ ফল ফলল— লাথি ব্যর্থ হ'ল, মুখের জয় হ'ল।

এইরকম পেটেণ্ট করা পদ্ধতি নির্বাচন-সংহিতায় নেওয়াদা পদ্ধতি নামে খ্যাত হ'ল।

মহিপালপুরের পদ্ধতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক আর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। একজন নির্বাচন-অধিকারীর ভুলের ফলে এই পদ্ধতির সৃষ্টি। পরে সেই ভুলটাকে স্বীকৃতি দিয়ে কয়েক জায়গায় তা প্রয়োগ করা হয়েছে। ভুলটা হয়েছিল একটা ঘড়ি নিয়ে।

নির্বাচনের সময় ধার্য হয়েছিল বেলা বারোটা। নির্বাচন-অধিকারীর ঘড়িটা শহরের ঘণ্টাঘরের ঘড়ির সঙ্গে মেলানো ছিল আর ঘণ্টা-ঘরের ঘড়িটা চুঙ্গীর চেয়ারম্যানের ঘরের ঘড়ির সঙ্গে মেলানো ছিল। তাই নির্বাচন-অধিকারীর ঘড়ি সওয়া ঘণ্টা ফাস্ট ছিল। তার ফল হ'ল এই যে, কয়েকজন প্রার্থীর বিরোধিতা সত্ত্বেও

নির্বাচন-অধিকারী পোনে এগারোটার সময়েই যত ভোটার আর প্রার্থী এসেছিল তাদের দিয়েই নির্বাচন শেষ করে ওখানেই তার ফলাফল ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। বাকি ভোটার আর প্রার্থীরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছুল তখন নির্বাচন-অধিকারী তাঁর বাড়িতে বেলা সওয়া একটায় লাঞ্চ খেতে বসেছেন।

এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দাখিল করা হ'ল, আর তাতে সমস্ত বাদবিবাদ হ'ল ঘড়ি নিয়ে। মকদ্দমাটা যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণ হ'ল আর তাতে করে আদালত কয়েক রকমের ঘড়ির মেক্যানিক্যাল বিষয়গুলো জানার সুযোগ পেল। ফলে মকদ্দমা তিন বছর পর্যন্ত চলল। কিন্তু নির্বাচন-অধিকারী ভুল করেছে এ কথাটা প্রমাণ হ'ল না, হবার কথাও ছিল না। যাকে সে সভাপতি ঘোষণা করেছিল সে তার ঘড়ি বরাবর সওয়া ঘণ্টা ফাস্ট রেখে যথারীতি গ্রামে শাসন করে গেল। আর ছোটে পালোয়ানের খবর, বাকি প্রার্থীরা সবাই ঘড়ির জায়গায় ঘণ্টা নিয়ে বসে রইল।

মহিপালপুরের ঘটনা একেবারে আকস্মিক ছিল। কিন্তু নিউটনের সামনে গাছ থেকে আপেল পড়ার ঘটনাটা, যা থেকে তিনি মাধ্যাকর্ষণের সূত্র বার করেছিলেন, সেটাও তো আকস্মিক ছিল। তাই নির্বাচনকৌশলে যারা বিশেষজ্ঞ তারাও পরে মহিপালপুরের ঘটনা থেকে এই সূত্র বার করেছিল যে, সব ঘড়ি একসঙ্গে এক সময় দেয় না আর সব ভোটার একসঙ্গে এক জায়গায় পৌঁছয় না।

এই সূত্রটি আবিষ্কারের পর বেশ কয়েকবার বেশ কয়েকভাবে তা গ্রাম-পঞ্চায়েতের নির্বাচনে প্রয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন-

অফিসারদের ঘড়ি মহিপালপুরের নজির সামনে রেখে হঠাৎ হঠাৎ-ভাবে এক ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টা ফাস্ট কিংবা স্লো হয়ে যেত। আর যেহেতু ঘড়ি একটা যন্ত্র, তাই তার জন্য কোনো মানুষকে দোষ দেওয়া যেত না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেত, যে প্রার্থীর ঘড়ি নির্বাচন-অফিসারের ঘড়ির সঙ্গে মেলানো, নির্বাচনে সে-ই জিতেছে। এটা তুটো যন্ত্রের খেলা, তাই এর জন্যও কোনো মানুষের ওপর দোষারোপ করা অবৈজ্ঞানিক।

ভূগোলের হিসাবে শিবপালগঞ্জ থেকে মহিপালপুর বেশ দূরে। কাছে নেওয়াদা। তাই রামাধীন ভিখমখেড়বী নেওয়াদা পদ্ধতিটা ভালো জানতেন। আর ঐ পদ্ধতি তিনি প্রাণখুলে কাজেও লাগিয়ে-ছিলেন। ওদিকে শনিচরের তরফে বৈদ্যজী ভূগোলের চেয়ে ইতিহাসেরই বেশি সাহায্য নিয়েছিলেন আর অতীতের সমস্ত পদ্ধতি গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে তারপর শনিচরের পক্ষে মহিপাল-পুরের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে বলেছিলেন। এতে তাঁর তরফ থেকে কেবল একটা শস্তা ঘড়ি খরচ হয়েছিল। নির্বাচন-অফিসার সেটা ভুল করে হাতে বেঁধে বাড়ি নিয়ে গেছেন। আর অন্য তরফে নেওয়াদা পদ্ধতি প্রয়োগকারীরা নির্বাচনে হেরে হতাশা আর মদের ক্রিয়ায় কাত হয়ে গিয়েছিল। নেশার বিশেষজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই তারা লাভ করতে পারে নি।

কুড়ি

ছাদের বারান্দায় ছোট্ট একটা নোংরা কাগজের পুঁটলি পড়ে ছিল, একটা ঢিলের সঙ্গে বাঁধা। রঙ্গনাথ সেটা তুলে দেখল একটা প্রেমপত্র। রঙ্গনাথ একবার পড়ল, তারপর আবার পড়ল, বারবার পড়ল। তার বুঝতে দেরি হ'ল না যে, সেদিন রাত্রে বুকের ওপর যার চাপ অনুভব করে সে কোণার্ক আর খাজুরাহোর কথা ভেবেছে, এই চিঠিটা তারই লেখা। রঙ্গনাথ এ-ও বুঝল যে, এই প্রেমপত্র তার উদ্দেশে লেখা নয়, অন্য কারও উদ্দেশে লেখা।

কিন্তু কে সে?

রুপ্পন?

তা হলে কি বেলাই এই চিঠি রুপ্পনকে লিখেছে? সেদিন যে মেয়েটি ছাদে এসেছিল সে তা হলে বেলা?

এ কথা মনে করা ভুল হবে যে, রঙ্গনাথ এই প্রশ্নগুলো ভাবার সময় কোনো প্রকাণ্ড ন্যায়শাস্ত্রী অথবা তর্কশাস্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ ক'রে দুইয়ে-দুইয়ে চার করার চেষ্টা করছিল। আসলে সে একদিকে বেলাকে এই চিঠির লেখিকা মনে করে রুপ্পনের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করছিল, আর অন্যদিকে এই ভেবে অবাক্ হচ্ছিল যে, শিবপালগঞ্জেও ফিল্মী গানের এমন একজন মহাপণ্ডিত আছে, বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের অধিকারীরা যাকে বুকে জড়িয়ে ধরুন আর না-ই ধরুন, তার বুকে ফিল্মী সাহিত্যের ডক্টরেট অবশ্যই ঝুলিয়ে দেবেন। কারণ, পুরো প্রেমপত্রটাই টুকরো টুকরো ফিল্মী গান জুড়ে পদ্যকে গদ্যের আকার দিয়ে লেখা হয়েছে।

এই-সব চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গনাথের মনের মধ্যে আর-একটা জিনিস মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। ফিল্মী ভাষায় তাকে বলা যেতে পারে— কেন আমাকে পৃথিবী এমন করে জ্বালায়। সেদিন রাত্রে রঙ্গনাথের গলার আওয়াজ শুনে যে "ও মা" বলে পালিয়ে গিয়েছিল, আজ আর কারও জন্য সে আবেদন জানাচ্ছে— "একা আছি, চলে এস, যেখানেই থাকো তুমি।" রঙ্গনাথের এটা অসহ্য মনে হ'ল।

রঙ্গনাথ চিঠিটা পকেটে রেখে বাড়ি থেকে বেরুল। আজ শহরে যোগনাথের মকদ্দমার শুনানী হবে, তাই শিবপালগঞ্জে যাকেই কিছুটা ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় সে-ই শহরে ছুটছে। যখন কোনো গুণ্ডার বিরুদ্ধে মকদ্দমা চলে তখন গ্রামের লোকেদের স্বাভাবিক ভাবেই ইচ্ছা হয়, এই সুযোগে তারা শহরটা ঘুরে আসে আর কাছারিটা দেখে নেয়। গুণ্ডার অপমান দেখে তারা মনে সুখ পায়। আবার গুণ্ডাও এই ভেবে সুখ অনুভব করে যে, দেখো, আমার গ্রামের কত লোক আমাকে সাহায্য করতে এসেছে! এই সূত্রে গ্রামের বেশ-কিছু লোক এরই মধ্যে শহরে চলে গেছে, আবার যাবার জন্য তৈরিও হচ্ছে অনেকে।

রঙ্গনাথ দেখতে পেল, বদ্রী পালোয়ান তাঁর ভুবনমোহন রূপে আসছেন। ফাল্গুনের শীত সত্ত্বেও তাঁর গায়ে মলমলের জামা ঝলমল করছে। তার নিচে বেনিয়ান পরার দরকার হয় নি। কোমরে

ল্যাঙট বাঁধা আছেই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তার ওপর একটা লুঙ্গিও আছে। পায়ে পালিশ করা বুট। পরিষ্কার করে কামানো মাথায় সরষের তেল চকচক করছে। তার ওপর, অনেক ওপর, নীল আকাশ।

রঙ্গনাথ প্রথমে ভেবেছিল, প্রেমপত্রটা সে রুপ্পনবাবুকে দেখাবে, আর সংস্কৃতির অধঃপতনে সিনেমার ভূমিকা বিষয়ে কিছু বক্তৃতা দিয়ে বেলার প্রেমে পড়া থেকে তাঁকে আটকাবে। রঙ্গনাথ জানত, রুপ্পনবাবুর সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলা মুশকিল। তবু একটা প্রেমপত্র পাবার মতো দারুণ ঘটনাকে হাল্‌কাভাবে শেষ করে দেওয়াও তার উচিত মনে হ'ল না। বদ্রী পালোয়ানকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গনাথ তার পরিকল্পনা পালটে ফেলল, যেমন কোনো অ্যামেরিকান এক্সপার্ট দেখেই কখনও কখনও আমরা আমাদের পরিকল্পনা বদলে ফেলি।

বদ্রী পালোয়ান দূর থেকে প্রেমপত্রটা দেখলেন। রঙ্গনাথ দেড় ফুট দূরে দু'হাতে চিঠিটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বদ্রী পালোয়ান নিঃশব্দে পড়তে লাগলেন। একজায়গায় চোখ দুটো কুঁচকোতেই রঙ্গনাথ তাঁকে সাহায্য করার জন্য পড়ে দিল, "···আর যদি এমন হাসিন রাত্রি না আসে।" তারপর বলল, "হাসিন মানে সুন্দর।"

বদ্রী পালোয়ান একটা ঢোঁক গিললেন, যার অর্থ বোধ হয় এই যে, 'আমাকে বোঝাবার দরকার নেই, এসব কথা আমি খুব বুঝি।' পুরো চিঠিটা পড়ে ওটা তিনি রঙ্গনাথের হাত থেকে নিয়ে নিলেন, তারপর মুড়ে পকেটে রেখে দিলেন।

রঙ্গনাথ বলল, "রুপ্পনবাবু বড়ো গোলমেলে রাস্তায় চলছেন। আর ঐ মেয়েটি, কী যে সব আজেবাজে জিনিস চিঠিতে লিখেছে!"

কথাটা শুনে বদ্রী পালোয়ান সজোরে হেসে উঠলেন। বললেন, "চিঠিটা বোধ হয় ঐ শাশুড়ী গ্রামসেবিকা লিখেছে। এখানে এ-সব কথা ও-ই শুধু জানে।"

"তা হলে···তা হলে রুপ্পনবাবু কি কোনো গ্রামসেবিকার সঙ্গে ফেঁসেছেন ?"

পালোয়ান আবার আগের মতো জোরে হাসতে লাগলেন। একটু পরে হাসি থামিয়ে বললেন, "না, না। তুমি তো সব কথা উল্‌টো বোঝো। ও বেচারী এ-সব কাজ করে না। ও শুধু পরের চিঠি লিখে দেয়।"

বদ্রী পালোয়ান তাঁর পথ ধরলেন। রঙ্গনাথের মুখে চিন্তার ছাপ দেখে হাঁটতে হাঁটতেই তিনি বললেন, "এই কাগজটা নিয়ে চিন্তা কোরো না, আমি সব ঠিক করে দেব।"

আদালতটা শহরের, কিন্তু গোটা শিবপালগঞ্জটাই যেন এসে উপস্থিত হয়েছে। যোগনাথের বিরুদ্ধে চুরির মামলায় সাক্ষী চলছে।

পরিবেশটা অশোভন আর অশ্লীল। বারান্দায় কুকুরের মতো লোকেরা শুয়ে আছে। সামনেই হোলি। তাই তাদের মুখে হাসিতামাশা আর গালাগাল। তাদের গায়ে নোংরা অথচ রঙ্‌-বেরঙের কাপড় কিংবা ন্যাকড়া। গালে ধূলিমলিন অপরিচ্ছন্ন বড়ো বড়ো দাড়ি— বাদী, প্রতিবাদী আর সাক্ষীরা বিড়ি খেতে খেতে কিংবা অপরিষ্কার দাঁতের পেছনে তামাক চেপে ধরে চিৎকার করে করে কথা বলছে। একজন স্ত্রীলোক মাটিতে শুয়ে তার বাচ্চার মুখে স্তন গুঁজে দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে। দৃশ্যটা কয়েকজন লোক সাগ্রহে দেখছে।

জোরে বাতাস বইছে। বাতাসে ধুলো আর গাছের পাতা উড়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছে সারা বারান্দায়।

বারান্দায় পুলিসের উর্দিপরা দুজন সেপাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের পায়ে খাকী পট্টি, মাথা খালি। তাদের একজনের জুতো, যা সব সময়ে অন্যদের মেরামত করার জন্য উদ্যত থাকে, একজন মুচি সামনের বটগাছের তলার বসে মেরামত করছে। আর একজন সেপাই তার জুতোজোড়া এজলাসের দরজায়, খুলে রেখে দিয়েছে। নতুন জুতোয় পায়ে লাগছে। কাজ কিছু না থাকলেও উকিলরা কাজের চাপে কুঁজো হয়ে বারবার এজলাসের ভেতরে যাচ্ছে আর বাইরে আসছে। কেরানীরা নিশ্চিন্তে হাই তুলতে তুলতে পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর এজলাসের বাইরে এসে সামনের পানের দোকানের দিকে যাচ্ছে। আর কোনো মামলাবাজকে পেছনে নিয়ে, কাউকে পাশে ঝুলিয়ে বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছে যে, আজ বড়ো বেশি কাজ আছে, পরশু এস। তারপর মুখে পান আর চুন ভরে উটের ঘাড় তুলে আবার এজলাসের ভিতর ঢুকে পড়ছে।

বারান্দার এককোণে ল্যাংড়া বসে আছে।

শনিচর গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রধান, সুতরাং এখানে দর্শকদের মধ্যে তার উপস্থিতিও অনিবার্য। ছোটে পালোয়ান আজ পুলিসের তরফ থেকে যোগনাথের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এসেছেন, তার উপস্থিতির এ-ও একটা কারণ। ব্যাপারটার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, কারণ ছোটে পালোয়ানকে লোকে বৈদ্যজীর লোক বলে জানে আর যোগনাথও বৈদ্যজীর লোক, এবং একই লোকের দুজন লোক বাদী আর প্রতিবাদীর তরফে সাক্ষী হিসাবে আলাদা আলাদা দাঁড়িয়েছে। রুপ্পনবাবু কিছুদিন যাবৎ এটাকে নাটকীয় ভঙ্গিতে

বলছেন, একই সঙ্গে ছুটো ফুল ফুটেছে, কিন্তু তাদের ভাগ্য আলাদা আলাদা।

শনিচর আর গ্রামের অনেক লোক এজলাসের ভেতরে চলে গেছে। শনিচর কেবল আমোদ করার জন্যই ল্যাংড়াকে রিক্শায় বসিয়ে নিয়ে এসেছে। ল্যাংড়া এখন বারান্দায় বসে তার নতুন শ্রোতাদের তার জীবনানুভূতির কথা শোনাচ্ছে। তার কেবল একটাই জীবন আর একটাই অনুভূতি। সেই কথাটাই সে এখন সবিস্তারে সবাইকে শোনাচ্ছে।

"...তো বাবু, এতদিন পরে, পুরো এক বছর তিন মাস কেটে যাবার পর এখন ব্যাপারটা ঠিক হয়েছে। নকলের দরখাস্তে এখন আর কোনো ভুল নেই। ফাইলটাও সদর থেকে তহসিলে ফিরে এসেছে। কাল তহসিলে গিয়ে জানতে পারলাম যে, নকলবাবু এবার আমার কাজটা হাতে নিয়েছেন। আজ বোধ হয় তৈরি হচ্ছে। তারপর আসলের সঙ্গে মোকাবিলা হবে। ব্যস, আর মাত্র তিন-চার দিন বাকি।"

একজন উকিল বারান্দার একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, "এতদিন ঘুরেই মরেছ! আমার কাছে কিংবা অন্য কোনো উকিলের কাছে এলে তিন দিনে কাজ হয়ে যেত।"

ল্যাংড়া আজকাল সাধুসন্তদের মতো মধুর হাসি হাসতে শিখে নিয়েছে। তার মুখে ঐ হাসিটা দেখলেই মনে হয়, অন্য লোকে শিশুসুলভ কথা বলছে আর সে যে তা সহ্য করছে সেটা তার সাধুতা। ল্যাংড়া এই হাসিটা একটু বেশি করে হেসে বলল, "উকিলের দরকার ছিল না বাবু, এ তো সত্যের লড়াই। পাঁচ

টাকা বাবুকে দিয়ে দিলে তিন দিন নয়, তিন ঘণ্টার মধ্যে নকল পেয়ে যেতাম। কিন্তু ওভাবে সে-ও নেবে না, আমিও দেব না।”

উকিল বললেন, “কেন সে নেবে না? তুমি টাকা দিলে আর সে নিল না?”

ল্যাংড়া ক্লান্ত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ার প্রস্তুতি করছিল। বলল, “এটা সত্যের লড়াই বাবু! তুমি উকিল, বুঝতে পারবে না।”

লোকেরা হাসতে লাগল। ল্যাংড়া চুপ করে শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। তারপর আস্তে করে একটু কাতরাল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, “কী ব্যাপার ল্যাংড়া, ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছ!”

ল্যাংড়া চোখ বুজে মাথা নাড়ল। কিছু বলল না। তার পাশে যে লোকটা বসে আছে সে তার গায়ে হাত দিয়ে বলল, “জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে।”

এক বুড়ী চুপচাপ বসে বসে তার পেঁচার মতো চোখদুটো দিয়ে দার্শনিকের মতো পৃথিবীটাকে দেখছিল। সে বলল, “দিনকাল বড়ো খারাপ পড়েছে। আমার দু’ ছেলেও জ্বরে পড়ে আছে। ওদিকে ফসল পেকে উঠেছে। কাটার লোক নেই। ইঁদুরে-বাঁদরে খেয়ে যাচ্ছে।”

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস। গয়াদীন সাক্ষী দিচ্ছে। জেরা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হঠাৎ যোগনাথের উকিল প্রশ্ন করলেন, “তোমার একটি মেয়ে আছে?”

“হ্যাঁ।”

“তার নাম বেলা?”

“হ্যাঁ।”

"তার বয়েস প্রায় কুড়ি ?"

"হ্যাঁ।"

বিচারক গয়াদীনের দিকে সন্দেহপূর্ণ, তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন, কুড়ি বছরের মেয়ের বাপের দিকে যেভাবে তাকানো উচিত।

"তোমার বাড়িতে অন্য কোনো স্ত্রীলোক আছে ?"

"হ্যাঁ, আমার বিধবা বোন।"

"কিন্তু সে সব সময় তোমার ওখানে থাকে না ?"

"না, ও সব সময় আমার বাড়িতেই থাকে।"

উকিল গর্জন করে উঠলেন, "তুমি হলফ নিয়েছ, মিথ্যে কথা বললে তোমার বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করা হবে। এ কথা কি সত্যি নয় যে, তোমার বোন বেশির ভাগ সময় তার শ্বশুরবাড়ি থাকে আর তখন তোমার মেয়ে বাড়িতে একা থাকে ?"

গয়াদীন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। উকিল আবার গর্জন করে উঠলেন, "কথা বলছ না কেন ?"

"কী বলব ? আপনি এত রেগে যাচ্ছেন যে, কিছু বলা কঠিন।"

উকিল আগের মতোই বললেন, "আমি রাগছি না।"

গয়াদীন কিছু বললেন না। উকিল এবার গলার স্বর নামিয়ে এনে বললেন, "তোমার জবাব কী ?"

"আমার বিধবা বোন সবসময়েই আমার বাড়িতে থাকে।"

"তোমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে ?"

"না।"

"কবে নাগাদ মেয়ের বিয়ে দেবে ?"

"দেবার মালিক তো ভগবান।"

ভগবানের নাম শুনে বিচারক ওপর দিকে মাথা তুললেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি অন্য-সব কাগজপত্র দেখছিলেন, এই মকদ্দমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এবার তিনি উকিলকে বললেন, "মকদ্দমার সঙ্গে এ-সব প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই।"

উকিল বললেন, "হুজুর, আমি পরে সম্পর্ক দেখাচ্ছি।"

আদালতের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে পাবলিক প্রসিকিউটর তাঁর সাক্ষীকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। তিনি আপত্তি জানালেন, "হুজুর, এ-সব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক।"

বিচারক কঠোর দৃষ্টিতে পাবলিক প্রসিকিউটরের দিকে তাকালেন। তাঁর আপত্তির জবাব।

ওদিকে যোগনাথের উকিল যখন দেখলেন, বিচারকের মুড খারাপ হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি গয়াদীনকে তাঁর মেয়ের সম্পর্কে প্রশ্ন করা ছেড়ে দিলেন। অন্য সাক্ষীকে ডাকা হ'ল।

এ সেই সাক্ষী, যোগনাথের বাড়ি তল্লাসীর সময় যাকে দেখা গিয়েছিল এবং পালিয়ে যেতে যেতে পুলিসকে বলেছিল, সাক্ষী দেবার জন্য যে-কোনো সময় যেন তারা তাকে ডেকে নেয়। এর নাম বৈজনাথ, শিবপালগঞ্জের পণ্ডিত রাধেলালের শিষ্য। মিথ্যে সাক্ষী দিতে পণ্ডিত রাধেলালের আর জুড়ি নেই, অতিবড়ো উকিলও আজ পর্যন্ত তাঁকে জেরা করে কাবু করতে পারেন নি, এবং তাঁর মিথ্যে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসে না বলে গোটা জেলার মকদ্দমাবাজ আর সাক্ষীদের মধ্যে তিনি অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। কিছুদিন যাবৎ তাঁর পূর্বদেশীয় প্রেয়সীর প্রেম তাঁকে কিছুটা ঘর-কুনো করে দিয়েছে, তাই সাক্ষী দেবার প্রাইভেট প্র্যাকটিসে তিনি এখন বেশি সময় পাচ্ছেন না। এই কারণে এখন তিনি আগের তুলনায় মকদ্দমায় যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। বড়ো বড়ো উকিল

আর ডাক্তারের মতো এখন তিনি সাধারণ প্র্যাকটিস না করে বিশেষজ্ঞের প্র্যাকটিস করেন। তাঁর এখনকার প্র্যাকটিস কেবল দেওয়ানী মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা-ও উত্তরাধিকারের মামলা। ফৌজদারী মামলায় মিথ্যে সাক্ষী কায়েম রাখার জন্য গত কয়েক বছর যাবৎ তিনি কয়েকজন শিষ্য তৈরি করেছেন। তাদের মধ্যে বৈজনাথের স্থান সবার ওপরে।

বৈজনাথের বাড়ি ভিখমখেড়ায়। কিন্তু আশপাশের সব গ্রামে সাক্ষী দেবার জন্য সে আগে থেকেই হাজির হয়। এইভাবে তার প্র্যাকটিস কেবল ভিখমখেড়াতেই নয়, আশপাশের কতকগুলো গ্রামে জমে উঠেছে। যোগনাথকে যেদিন গ্রেপ্তার করা হয় সেদিন যে সে শিবপালগঞ্জেই ছিল, এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার। অবশ্য সাক্ষী দেবার জন্য তার ওখানে থাকা না-থাকা অপ্রাসঙ্গিক।

বৈজনাথ বাদীপক্ষের পুরো মকদ্দমাটা নতুন করে চালু করে দিল। সে জানাল, "আমার সামনেই যোগনাথের বাড়ি তল্লাসী হয়েছে, এই তিনটে গয়না আমার সামনে উদ্ধার করা হয়েছে, এগুলো আমার সামনে সীলমোহর করা হয়েছে, উদ্ধারের রিপোর্ট আমার সামনে লেখা হয়েছে, রিপোর্টে আমার দস্তখত আমার সামনেই করা হয়েছে…।"

যোগনাথের উকিল জেরা শুরু করলেন :

"তুমি ভিখমখেড়ায় থাকো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ভিখমখেড়া শিবপালগঞ্জ থেকে দু মাইল ?"

"জানি না।"

"তা হলে কত দূর ?"

"শিবপালগঞ্জে নাটক হলে ভিখমখেড়া থেকে শোনা যায়।"

"এক মাইল হবে ?"

"বলতে পারি না।"

"আধ ক্রোশ ?"

"জানি না।"

"কুড়ি মাইল ?"

"জানি না। আমি মাপি নি।"

বিচারক সাক্ষীর দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কতটা দূরত্ব হবে দুটো গ্রামের মধ্যে ?"

"মাঝে কয়েকটা ক্ষেত পড়ে।"

"ক'টা ক্ষেত ?"

"দশ-কুড়ি-পঞ্চাশটা ক্ষেত হবে।"

"ঠিক ঠিক বলো, ক'টা ক্ষেত হবে।"

"জানি না। আমি গুনি নি।"

বিচারক ঘুরে পাবলিক প্রসিকিউটরের দিকে তাকালেন। পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন, "হুজুর, সাক্ষী ঠিকই বলছে। ও ক্ষেত গোনে নি। তবে দুটো গ্রামই পাশাপাশি, এক মাইল দূরত্বে। দারোগার সাক্ষীতে পাওয়া গেছে।"

বিচারক যোগনাথের উকিলকে বললেন, "তা হলে দূরত্ব নিয়ে জেরা করার দরকার কী ? আপনি কি দারোগার কথা চ্যালেঞ্জ করছেন ?"

"চ্যালেঞ্জ করছি না হুজুর, কিন্তু জেরা তো করতেই হবে।"

"কেন ?"

"সাক্ষীর বুদ্ধিটা দেখানোর জন্য।"

"অথবা আপনার বুদ্ধি দেখানোর জন্য?"

বিচারকের মুখ থেকে এ কথা শুনে প্রতিবাদী পক্ষের উকিলের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে বিচারক জোরে জোরে হাসতে আরম্ভ করেছেন। এতে বোঝা গেল, কথাটা তিনি অপমান করার জন্য নয়, মজা করার জন্য বলেছেন। যারা যারা তা বুঝল তারা তারা হাসতে লাগল। শেষে যোগনাথের উকিলও হাসলেন। আদালতে একটা অলিখিত নিয়ম আছে, বিচারক আর উকিল আকবর-বীরবল-বিনোদের মতো কখনও কখনও উপস্থিত-বুদ্ধি দেখান আর পরস্পরের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করেন। এই অনাবশ্যক অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর বিচারক ভিখমখেড়া আর শিবপালগঞ্জের দূরত্ব নিয়ে যত প্রশ্ন করা হয়েছিল, সব বাতিল করে দিলেন। কিন্তু বাতিল করার আগেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আদালতের নথিপত্রে লেখা হয়ে গেছে।

বৈজনাথকে আবার প্রশ্ন করা হ'ল:

"এখন পর্যন্ত পুলিসের তরফ থেকে কতগুলো মামলায় তুমি সাক্ষী দিয়েছ?"

"মনে নেই।"

"আমি বলছি, আজ পর্যন্ত তুমি পুলিসের তরফ থেকে ষাটটা মামলায় সাক্ষী দিয়েছ।"

"বলতে থাকুন, আমার মনে নেই।"

"এর আগে কখনও তুমি পুলিসের সাক্ষী হয়ে কোনো মকদ্দমায় এসেছ?"

"পুলিসের সাক্ষী? সে আবার কী জিনিস?"

"প্রশ্নের জবাবে প্রশ্ন কোরো না। সোজা উত্তর দাও।"

"তুমি আমাকে তুমি-তুমি কোরো না। আমি কোনো হেলা-ফেলার মানুষ নই।"

এইরকম ভৎ‍র্সনা শুনে উকিল বিচারকের কাছে প্রতিরক্ষা চাইলেন। বিচারক বললেন, "এই, প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও।"

বৈজনাথ নত হয়ে বলল, "প্রশ্ন হওয়া চাই তো ধর্মাবতার। ইনি জিজ্ঞাসা করছেন, আমি কতবার পুলিসের হয়ে সাক্ষী দিয়েছি। পুলিস-টুলিস আমি কী জানি! আমি তো সত্যের সাক্ষী দিচ্ছি। যা জানি, বলতে বাধা নেই, তা সে পুলিসই ডেকে আনুক কি প্রতিবাদীই ডেকে আনুক।"

বিচারক কিছু বলার আগেই যোগনাথের উকিল রেগে উঠলেন। তিনি তাঁর রাগের জন্য খুবই বিখ্যাত। তাঁর দালালরা নতুন মামলাবাজদের তাঁর রাগ দেখানোর জন্য প্রায়ই এজলাসে ধরে আনে। রাগই তাঁর বিদ্যা, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর ওকালতি জ্ঞান, তাঁর অস্ত্রশস্ত্র আর কবচ। রাগই তাঁর সাইনবোর্ড, তাঁর বিজ্ঞাপন, তাঁর পিতা-মাতা-সহায়ক স্বামী-সখা। তিনি রাগলে অন্য লোকে কাঁপুক আর না-ই কাঁপুক, নিজে থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করেন। সমঝদার বিচারক তাঁর রাগে বিচলিত না হয়ে চুপচাপ নিজের কাজ করে যান আর তাকে হাঁচি-কাশির মতো সাধারণ জিনিস মনে করে তার ওপর কোনো রায় দেন না। যদি কোনো বিচারক তাঁর রাগে আপত্তি করেন তা হলে তাঁর নিন্দায় তিনি বার অ্যাসোসিয়েশনে ভাষণ দেন আর অ্যাসোসিয়েশন প্রস্তাব পাস করে।

এই বিচারক সমঝদার লোক, তাই তিনি উকিলসাহেবের রাগকে আমল দিলেন না। ওদিকে উকিল গর্জন করে জিজ্ঞাসা করলেন,

"আমার প্রশ্ন সহজ, চালাকি করতে এস না। বলো, সরকারী মকদ্দমায় বাদী পক্ষ থেকে তুমি আজ পর্যন্ত কতবার সাক্ষী দিয়েছ?"

বৈজনাথ বলল, "তা হলে আমারও সহজ প্রশ্ন উকিলসাহেব, বলো, ডাকাত আর খুনীদের তরফ থেকে আজ পর্যন্ত তুমি কতগুলো মকদ্দমায় ওকালতি করেছ?"

উকিল তাঁর রাগের জবাবে লোকদের নরম হতে অথবা শক্ত হতে দেখেছেন, এতখানি বেয়াদবি কখনও দেখেন নি। বৈজনাথের জবাবে তিনি রাগে ফেটে পড়তে লাগলেন। তিনি বিচারকের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। বললেন, "হুজুর, এখন আপনিই দেখুন, সাক্ষী কীভাবে কথা বলছে। ও বেহুদার মতো কথা বলছে। এতে আদালতের মানহানি হচ্ছে।"

বৈজনাথ ধূর্ততার সঙ্গে মাথা নাড়াল, যেন উকিল দৌড়ুচ্ছেন আর সে এদিক থেকে তাঁকে লেঙ্গি মেরে দিয়েছে। বৈজনাথ ধীরকণ্ঠে বলল, "নিজের বেলায় কিছু না, আমি যে-ই কিছু জিজ্ঞাসা করলাম অমনি নালিশ করছ উকিলসাহেব!"

বিচারক একটা জরুরি কাগজ পড়তে আরম্ভ করেছেন। তাই উকিলকে তাঁর নিজের বুদ্ধির জোরেই এই গর্ত থেকে বার হবার পথ দেখতে হ'ল। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "টাকা নিয়ে পুলিসের তরফে মিথ্যে সাক্ষী দাও ব্যাটা, আর উলটে আমাকে জেরা করছ!"

বৈজনাথ চারদিকে একবার গর্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনুকম্পাভরে উকিলকে বলল, "নিজের নিজের ব্যবসা।"

বিচারকের জরুরি কাগজটায় সই করা হয়ে গেছে। ভালো

মানুষের মতো তিনি বললেন, "নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। হ্যাঁ উকিলসাহেব, জেরা চালিয়ে যান।"

উকিল বললেন, "হুজুর, এই সাক্ষীকে জেরা করা মুশকিল। প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাবে বাধা দেয়। এটা নোট করে নেওয়া হোক।"

বিচারক গভীরভাবে বৈজনাথের দিকে তাকালেন। বৈজনাথ পাবলিক প্রসিকিউটরকে দেখতে লাগল। পাবলিক প্রসিকিউটর বিচারককে দেখছেন।

বিচারক উকিলকে বললেন, "চালান।"

উকিল সারসের মতো পা বদলালেন, যেন জেরার একটা ঐতিহাসিক যুগ শেষ করে আর-একটা যুগে প্রবেশ করলেন।

"তুমি সরকার বনাম চুরইয়ের মধ্যে 379 দফা মকদ্দমায় বাদী পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলে?"

"আমার মনে নেই।"

"এই মাসেই তুমি ঐ সাক্ষী দিয়েছ।"

বৈজনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করল, তারপর বলল, "এ মাসে আমি একটাই সাক্ষী দিয়েছি। আমি আমার বাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, একটা লোক একটা পোঁটলা নিয়ে পালাচ্ছিল...।"

"সাক্ষীতে তুমি কী বলেছ তা বলার দরকার নেই। শুধু বলো, গত মাসেও তুমি একটা সাক্ষী দিয়েছিলে?"

"সাক্ষী দিয়েছিলাম, কিন্তু মকদ্দমার নাম মনে নেই।"

এতক্ষণ পরে বিচারকও রেগে উঠলেন। বললেন, "এটা কেমন করে হতে পারে?"

"আমি দেহাতী মানুষ হুজুর, লেখাপড়া তো জানি না।"

উকিল বললেন. "হুজুর, এই চালাকিটাও নোট করা হোক।"

বৈজনাথ বলল, "হুজুর কী কী নোট করবেন, নিজেই নোট করুন। আপনার মুনশিকে বলুন, সে সব নোট করে নেবে।"

বিচারক এবার বৈজনাথকে ধমকালেন। খুব ধমকালেন। এত ধমকালেন যে বৈজনাথ সত্যি সত্যিই ঘাবড়ে গেল। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ওদিকে ধমকাতে ধমকাতে বিচারকের মুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু বিচারকের ধমক দু মিনিট পার হয়ে তিন মিনিটে পড়তেই বৈজনাথ সামলে নিল। তার ওস্তাদ পণ্ডিত রাধেলালের কথা মনে পড়ে গেল। রাধেলাল তাকে বুঝিয়েছিলেন, "দেখো বাবা, সাক্ষী দেবার সময় কখনও কখনও উকিল কিংবা হাকিম রেগে যান। তাতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। তাঁরা বেচারা সারাদিন মাথার কাজ করেন। তাঁদের হজমের গোলমাল থাকে। তাঁরা প্রায়শই বদহজম, মন্দাগ্নি আর অর্শের রুগী হয়ে থাকেন। তাই তাঁরা খিটখিটে হন। তাঁদের ধমক-চিৎকারে ঘাবড়ানো উচিত নয়। এ কথা মনে করা উচিত যে, তাঁরা তোমাকে নয়, নিজেদের হজমের গোলমালকে ধমকাচ্ছেন। শুধু তা-ই নয়, আরও মনে রাখা উচিত যে, তাঁরা সব বড়ো বড়ো মানুষ, লেখাপড়া জানা লোক। তাঁরা তোমার ব্যাপার-স্যাপার বুঝতেই পারেন না। তাই যখন তাঁরা রেগে ওঠেন তখন তোমার মাথা পরিষ্কার রাখতে হবে আর ভাবতে হবে, এখন কী করে তাঁদের মিষ্টি কথায় ভোলানো যায়।"

বিচারক শেষ পর্যন্ত আদেশ দিলেন, প্রশ্নের জবাবে কেবল "হ্যাঁ" কিংবা "না" বলতে হবে। জেরার ট্যাঙ্ক এখন সমতল জায়গায় ঘড়্ ঘড়্ করে চলতে আরম্ভ করল।

"আজ থেকে ছ মাস আগে তুমি সরকার বনাম বিশ্বেশ্বরের মামলায় বাদী পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলে?"

"না।" (কথাটা সত্যি, কারণ বৈজনাথ এই সাক্ষী সাত মাস আগে দিয়েছিল।)

"এক বছর আগে তুমি সরকার বনাম ছুন্নুর মামলায় সাক্ষী দিয়েছিলে?"

"না।" (এই কথাটাও সত্যি, কারণ ছুন্নুর মামলা চোদ্দ মাস আগে হয়েছিল।)

"......"

"না।"

"......"

"না।"

"......"

"না।"

"......"

"হ্যাঁ।"

"......"

"হ্যাঁ।"

"এইভাবে তুমি আজ পর্যন্ত অনেকগুলো মামলায় সরকারী সাক্ষী হয়েছ।"

"আপনি এইরকম মাত্র দুটো মামলার কথা বলেছেন।"

"এতগুলো মামলায় প্রত্যেকবারই পুলিস তোমাকে সাক্ষী দেবার জন্য পায়, এর কোনো বিশেষ কারণ আছে?"

বৈজনাথ বিচারকের দিকে তাকিয়ে শহীদদের মতো স্বরে বলল, "কারণ এই যে, আমার সাহস আছে।" তারপর বুক টান টান করে দাঁড়িয়ে আবার বলতে লাগল, "বদমাশদের বিরুদ্ধে সাক্ষী

দেবার সাহস আমাদের ওদিকে কারও হয় না। আমি ভয়ডরহীন মানুষ, গুণ্ডাবাজির ঘোর বিরুদ্ধে। তাই যা দেখি, অকপটে বলতে ইতস্তত করি না।"

উকিল বৈজনাথকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। বিচারক হাত নেড়ে সাক্ষীকে কাঠগড়া থেকে নিয়ে যেতে বললেন, কিন্তু বৈজনাথের বক্তৃতা বন্ধ হ'ল না। সে বলেই চলল, "আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমাদের ওখান থেকে গুণ্ডাদের তাড়িয়ে ছাড়ব। আমি আমার প্রতিজ্ঞায় অটল। এতে যদি আমার প্রাণ যায় তো কুছ পরোয়া নেই।"

"তোমার নাম?"

"ছোটে পালোয়ান।"

পাবলিক প্রসিকিউটর সংশোধন করে দিলেন। পেশকারকে বললেন, "লিখুন, ছোটেলাল।"

ছোটে পালোয়ান এমনভাবে তাকালেন, যেন সত্যি সত্যিই তাঁকে ছোটো করে দেওয়া হয়েছে। রাগে তিনি একটা ঢোঁক গিললেন।

পরের প্রশ্ন, "বাবার নাম?"

"কুসেহর।"

পাবলিক প্রসিকিউটর আবার সংশোধন করলেন, "কুসেহর প্রসাদ।"

ছোটে পালোয়ান এবার এমনভাবে তাকালেন, যেন কেউ তাঁর বাবাকে গালাগাল দিয়েছে।

"জাত?"

"বামুন।"

"বাড়ি?"

"আমি গঞ্জের লোক।"

"ঠিক আছে, কিন্তু তোমার গ্রামের নাম কী?"

"গঞ্জ।"

"কোন্ গঞ্জ?"

ছোটে পালোয়ান কঠিনভাবে বললেন, "এক'শ-দু'শ গঞ্জ আছে নাকি?" একটু থেমে বললেন, "শিবপালগঞ্জ।"

"বলো, ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, যা বলব, সত্যি বলব।"

"বলেছি।"

"বলেছি নয়, মুখে বলো, ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, যা বলব, সত্যি বলব।"

"মুখেই বলেছি।"

আরদালী বিচারকের দিকে তাকাল। আদালতের কাজে অচলাবস্থা এসে গেছে। বিচারক গভীর দৃষ্টিতে ছোটে পালোয়ানের দিকে তাকালেন— চওড়া কব্জি, মোষের মতো ঘাড়। গয়াদীন বলে, শুঁড়হীন হাতি। ওদিকে বিচারক বুদ্ধিজীবী মানুষ। আরদালীকে তিনি হুকুম দিলেন, "সাক্ষীকে বলো, বাইরে গিয়ে মুখ পরিষ্কার করে আসুক।"

"বাইরে গিয়ে মুখ পরিষ্কার করে এস।"

ছোটে পালোয়ান গামছা দিয়ে তাঁর মুখের কল্পিত ঘাম মুছলেন। তারপর নির্বিকারভাবে কাঠগড়া ধরে এমন করে ঝুঁকতে লাগলেন, যেন কোনো জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রে জলজন্তু দেখছেন। বিচারক হুকুম দিলেন, "সাক্ষীর মুখ পরিষ্কার করাও।"

পাবলিক প্রসিকিউটর ছোটে পালোয়ানকে বললেন, "বাইরে গিয়ে মুখের পান ফেলে দিয়ে এস।"

ছোটে পালোয়ান সত্যি সত্যিই খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে পান চিবুচ্ছিলেন। তাঁর মনে হ'ল, তাঁকে তাঁর আত্মবিশ্বাস ফেলে দিতে বলা হচ্ছে। কথাটা তিনি শুনেও শুনলেন না। কিন্তু আস্তে করে পানটা গিলে ফেলে আর-একবার গামছা দিয়ে মুখ মুছলেন।

বিচারক আরদালীকে হুকুম দিলেন, "সাক্ষীকে হলফ পড়াও।"

আরদালী এই সমঝোতাটাকে সহজ দৃষ্টিতে না দেখে ছোটে পালোয়ানকে বলল, "বলো, ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, যা বলব, সত্যি বলব।"

"সত্যি বলব।"

"ঈশ্বরের নামে শপথ করছি।"

ছোটে পালোয়ান এদিক-ওদিক তাকিয়ে এবার অনায়াসেই বলে ফেললেন, "ঈশ্বরের নামে শপথ করছি।"

পাবলিক প্রসিকিউটর ছোটে পালোয়ানকে প্রথমে যোগনাথের বাড়ি তল্লাসী সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। তিনি এই পর্যন্ত জবাব দিলেন যে, দারোগাবাবু যোগনাথকে সঙ্গে করেই তার বাড়ি ঢুকেছিলেন।

"তারপর বাড়ি তল্লাসী হ'ল?"

"হ্যাঁ।"

"কী পাওয়া গেল?"

"কিছু না।"

পাবলিক প্রসিকিউটরের চোখ মাথায় উঠে গেল। তিনি জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি জিজ্ঞাসা করছি, তল্লাসী করে কী পাওয়া গেল?"

"কী আবার পাওয়া যাবে! ঘণ্টা।"

যোগনাথ আর তার উকিল দুজনেই মুচকি হাসলেন। পেছন থেকে শনিচর বলে উঠল, "সাবাস! চালিয়ে যাও বেটা।"

বিচারক গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে বলল, এ কথা? এ কোন্ অসভ্যতা?"

শনিচর ততক্ষণে আদালতের বাইরে চলে গেছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন, "তল্লাসীতে তিনটে গয়না পাওয়া গেছে এবং সেগুলো তোমার সামনেই আছে।"

যোগনাথের উকিল লাফিয়ে সামনে চলে এলেন, বিচারককে উদ্দেশ করে বললেন, "হুজুর, এটা তো জেরা!"

পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন, "হুজুর, সাক্ষী বিগড়ে গেছে, আমি একে জেরা করার অনুমতি চাইছি।"

বিচারক গম্ভীরভাবে বললেন, "করুন।"

যোগনাথের উকিল আপত্তি জানালেন, "হুজুর, ইনি লিখে দিন যে, সাক্ষী বিগড়ে গেছে বলে ইনি স্বীকার করে নিচ্ছেন।"

পাবলিক প্রসিকিউটর তাঁর ফাইল থেকে একটা দরখাস্ত বার করলেন। দরখাস্তটা নিশ্চয় আগে থেকে লিখে রাখা হয়েছে। দরখাস্তটা এজলাসে পেশ করা হ'ল।

প্রতিবাদী পক্ষের উকিল আবার আপত্তি জানালেন, "হুজুর, এই দরখাস্ত আগেকার লেখা।"

বিচারক রায় দিলেন, "তাতে কিছু আসে যায় না।"

কিন্তু অপর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কিছু বলার দরকার হয়ে পড়ল। পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন, "হুজুর, এ তো রোজকার কারবার। আদালতের কৌশল। সব পরিস্থিতির জন্য আগে থেকেই তৈরি হয়ে আসি।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি জেরা করুন।"

পাবলিক প্রসিকিউটর ছোটে পালোয়ানের দিকে ফিরে তাঁর আগের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন, "এই যে তিনটে গয়না তোমার সামনে রাখা আছে, এগুলো তল্লাসীর সময় যোগনাথের বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে?"

ছোটে পালোয়ান বিচারককে বললেন, "আমার যা উত্তর ছিল তা আমি আগেই দিয়েছি। তল্লাসীতে কিছুই পাওয়া যায় নি।"

পাবলিক প্রসিকিউটর তাঁর ফাইল থেকে একটা কাগজ বার করে বললেন, "এই ফর্দটা তোমার সামনে লেখা হয়েছিল?"

"আমার সামনে তো কেবল গালিগালাজ হয়েছিল, লেখাপড়ার ব্যাপার হয় নি।"

"এই ফর্দটাতে তুমি সই করেছ? দেখে বলো।"

ছোটে পালোয়ান কাগজটাকে দেখলেনও না, চট করে বলে দিলেন, "না।"

পাবলিক প্রসিকিউটর একটা জায়গায় ছোটের সইটা দেখিয়ে বললেন, "এই দেখো, ভালো করে দেখো। এই সই তোমার।"

ছোটে পালোয়ান বিচারককে বললেন, "আমার উত্তর তো আমি দিয়ে দিয়েছি হুজুর, তা হলে ইনি কেন বারবার ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করছেন?"

কিন্তু বিচারক এবার তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখালেন না, হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, "কাগজটা দেখে জবাব দাও। মিথ্যে কথা বললে জেল হয়ে যাবে।"

ছোটের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়ল না। বুক টান করে তিনি বললেন, "জেলের কারবার তো আছেই হুজুর। আদালতে

যখন এসেছি তখন তো এক পা জেলে রেখেছি, আর-এক পা বাইরে। কিন্তু কাগজে আমি কী দেখব, লেখাপড়া তো আমার কাছে একেবারে হারাম।"

পাবলিক প্রসিকিউটর গলা চড়িয়ে বললেন, "তা হলে তুমি সই করো কী করে? এ সই তুমি করো নি?"

এতক্ষণ পরে আবার যোগনাথের উকিল মুখ খুললেন। যেন কোনো বাচ্চাকে আদর করছেন এমনভাবে বললেন, "আস্তে আস্তে একটা একটা করে প্রশ্ন করুন। সাক্ষী কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না।"

পাবলিক প্রসিকিউটর কথাটা গ্রাহ্য করলেন না। তিনি প্রশ্ন করলেন, "তা হলে তুমি সই করো কী করে?"

"কে সই করে? আমার সাতপুরুষে কেউ সই করেছে যে, আমি করব! দেখো গিয়ে, পাঁচ শ কাগজ আছে, প্রত্যেকটাতে আমি আঙুলের টিপছাপ দিয়েছি। বরাবর।"

ছোটে পালোয়ান গর্বভরে আদালতের চারদিকে তাকালেন। পাবলিক প্রসিকিউটর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি জিজ্ঞাসা করছি, এই কাগজটাতে তুমি সই করেছ?"

"বলছ তো তুমি তিতিরের মতো, বলে যাও। কে মানা করছে!"

বিচারক ধমকে উঠলেন, "ভদ্রভাবে কথা বলো।"

ছোটে পালোয়ান উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "নিজের নিজের ভদ্রতা হুজুর, এঁর তর্জনেগর্জনে ভয় পেয়ে মিথ্যে কথা কেন বলব।"

পাবলিক প্রসিকিউটর তাঁর কাগজ গুটিয়ে ফেলে বললেন, "আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করব না।"

ছোটে পালোয়ান লুঙ্গিটা ঠিক করতে করতে সরে পড়ার উপক্রম করতেই যোগনাথের উকিল বললেন, "আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব হুজুর।"

বিচারক আপত্তি করলেন না। উকিল জিজ্ঞাসা করলেন, "গয়াদীনের মেয়ে বেলাকে তুমি চেনো?"

"কে চেনে না?"

"এদিক-ওদিক কথা বোলো না। তোমার নিজের কথা বলো। তুমি নিজে চেনো কিনা?"

"কেন চিনব না?"

"মেয়েটা কেমন?"

"দুশ্চরিত্র।"

বিচারক বললেন, "এই জেরার কোনো অর্থ হয় না। মামলার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।"

"কেন নেই হুজুর! ব্যাপারটা এখুনি পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।"—উকিল ছোটে পালোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কী করে বলছ যে, বেলা দুশ্চরিত্র?"

"নিজের চোখে দেখেছি।"

"কী দেখেছ?"

"দেখেছি যে, যোগনাথের সঙ্গে সে দুশ্চরিত্রের কাজ করছে। তাই গয়াদীন যোগনাথকে এই মকদ্দমায় ফাঁসিয়েছে।"

এরপর জেরা সেই পুরনো ধাঁচে পড়ে গেল, যে ধাঁচে আদালতে হাজার বার প্রমাণ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে কেউই চোর নয়, যাকে চোর মনে করা হচ্ছে সে গৃহস্বামীর স্ত্রী, ভগ্নী অথবা কন্যার প্রেমিক, এবং সেই প্রেমিক তাকে রাত্রে একান্তে শয্যাসঙ্গিনী

হবার জন্য আহ্বান করেছিল, কিন্তু গৃহস্বামী তাকে বন্ধু, ভগ্নীপতি অথবা জামাতা বলে সম্বোধন করে নি। তাকে সে চোর প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, তার তার পরিণাম হুজুর,…।

আগের সেই দারোগাবাবু এখন আর শিবপালগঞ্জে নেই। তিনি তাঁর ভাঙাচোরা পালঙ্ক, দুধেল গোরু আর উদ্ভিন্নযৌবনা কন্যাকে নিয়ে শহরে চলে এসেছেন। শহরের এক গলিতে অনেক কষ্টে ছোটো একটা বাড়ি ভাড়া পেয়েছেন। এখানে তাঁকে অন্য একটা বিশেষ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাতে তাঁকে একজন সাধারণ নাগরিকের মতো থাকতে হয়। কিন্তু সরকারী লোকদের পক্ষে সাধারণ নাগরিকের মতো থাকা বড়ো দুঃখজনক। তাই সব সময়ে তিনি দুঃখ করেন।

যোগনাথের বিরুদ্ধে চুরির মামলার তদন্ত তিনিই করেছিলেন। তাই আজ তাঁকে এজলাসে এসে আবার গ্রামের লোকেদের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। ছোটের সাক্ষী শুনতে শুনতে তিনি ছি-ছি বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন আর বিচারক তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি গয়াদীনের হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। বাইরে দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

শেষে দারোগাবাবু বললেন, "এইসব গ্রামের লোকেরা বেইমানেরও হদ্দ। এমন মেয়ে সম্পর্কে এইরকম সব কথা বলতে ওদের জিভ খসে পড়ে না!"

গয়াদীন মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন। দুটো ইঁটের মাঝখানে একটা আলপিন পড়ে আছে। মনে হচ্ছে, তিনি ভাবছেন, আলপিনটা তুলবেন কিনা।

দারোগাবাবু ধিক্কারের স্বরে বললেন, "যার যা ইচ্ছে তা-ই বলবে, ভালো মানুষদের দেখার কেউ নেই।"

গয়াদীন তাঁর অভ্যস্ত ক্লান্তিতে ভরা ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, "এমন হবে, সে তো আমি জানতাম দারোগাবাবু! যেদিন আপনি যোগনাথকে ধরেছিলেন সেইদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার বাড়িতে আর কারও মান-ইজ্জত থাকবে না।"

"আমি খুব দুঃখিত।"

"দুঃখিত হবার কিছু নেই। আপনার কী দোষ? যাকে আপনি চোর বলে জেলে পাঠাতে চাইবেন সে কি তার নিজের তরফ থেকে চেষ্টা কম করবে!"

"আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।"

"আমার জন্য গা জ্বালাবেন না দারোগাবাবু। এ-ই তো আমাদের দেশের রীতি। কাছারীতে যখন আসতে হয়েছে তখন সব-কিছুই সহ্য করতে হবে। যাদের এখানে আসতে হয়, তাদের কর্মফলই খারাপ। তুমি গা জ্বালিয়ে কী করবে দারোগাবাবু!"···

যোগনাথের উকিল তীরের মতো বাইরে বেরিয়ে অন্য এক এজলাসের দিকে ছুটে চলে গেলেন। তাঁর পেছন পেছন যে-সব মক্কেল দৌড়চ্ছিল তাদের তিনি বললেন, "তাড়াতাড়ি কোরো না, এখন যেতে দাও যোগনাথকে। পরে সবাইকে দেখে নেব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুলিসকেও বাদ দেব না।"

দারোগাবাবু চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকালেন, কিন্তু তাঁর দেখার কিছু ছিল না।

একুশ

প্রিন্সিপালসাহেব বৈদ্যজীর সঙ্গে কলেজের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, অর্থাৎ খান্না মাস্টারকে গালাগাল দিচ্ছিলেন।

এর একদিন আগে 107 নম্বর ধারার মকদ্দমায় যখন তিনি এজলাসে গিয়েছিলেন তখন তিনি মকদ্দমায় এক নতুন মোড় দেখতে পেয়েছিলেন, কারণ খান্না মাস্টারের উকিল তাঁর সওয়ালে অনেকটা এই ধরনের কথা বলেছিলেন: "হুজুর, এই মকদ্দমা 'হ্যাভ্‌স্‌' আর 'হ্যাভ নট্‌স্‌'-য়ের। এর একদিকে আছেন কলেজের ম্যানেজার, যিনি বৈদ্য মহারাজ বলে পরিচিত। আসলে তিনি বৈদ্য কম, মহারাজই বেশি। তাঁর পেছনে তাঁর কয়েক শ সমর্থক আর গুণ্ডা আছে। তাদের মধ্যে কলেজের প্রিন্সিপাল আর আট-দশ জন মাস্টারও আছেন। তাঁরা হয় তাঁর আত্মীয়, নয়তো আত্মীয়ের আত্মীয়। তাঁদের সকলেরই আর্থিক অবস্থা ভালো। আর যদি ভালো না-ও হয় তো কলেজের ফাণ্ড থেকে তা পূরণ করে দেওয়া হয়। হুজুর, আর এর অন্যদিকে আছেন খান্না আর তাঁর মতো আট-দশ জন মাস্টার। তাঁরা গরিব, তাই এই-সব লোকদের কুচক্র সবসময় তাঁদের দমন করে রেখেছে। নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের এই হচ্ছে প্রধান কারণ।"

বিচারক ইংরেজীতে বলেছিলেন, "অর্থাৎ রুটি আর মাছ নিয়ে বিবাদ।"

উকিল তাঁর কথা খণ্ডন করে, সংশোধন করে, কমিয়ে, বাড়িয়ে, তারপর এদিক-ওদিক করে আর তা থেকে বিচ্যুত হয়ে বলেছিলেন, "না হুজুর, আমার উদ্দেশ্য তা নয়। আমি শুধু বলছিলাম, এই ঝগড়া নীতি নিয়ে।"

"আপনি তো তা বলেন নি।"

"বলতে যাচ্ছিলাম হুজুর। জনসাধারণের টাকা এইভাবে অপব্যবহার করা হচ্ছে, খান্না আর তাঁর মতো বিচারশীল লোকেরা তা সহ্য করতে পারছেন না। হুজুর, এঁরা সকলেই বয়েসে তরুণ। তাই বেইমানী আর ভণ্ডামির সঙ্গে আপস করার অভ্যাসটা এখনও এঁদের রপ্ত হয় নি।"...

বিচারক মুচকি হেসে বলেছিলেন, "তা হলে তাঁদের মকদ্দমা আর জেলে ঘাবড়ানো উচিত নয়।"

উকিল কথাটা না-শোনার মতো করে বলেই চলেছিলেন, "তাই তাঁরা কলেজের দুর্নীতির ব্যাপারে সাংবিধানিক উপায়ে প্রতিবাদ জানান। হুজুর, কিছুদিন আগে ঐ কলেজে ম্যানেজার নির্বাচন হয়েছে আর তাতে পিস্তলের জোরে বৈদ্যমহারাজ আবার ম্যানেজার নির্বাচিত হয়েছেন। ডেপুটি ডাইরেক্টর অভ এডুকেশনের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করা হয়েছে। খান্না ওঁরা এই নির্বাচনে আপত্তি জানিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁরা ডেপুটি ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। এখন শিগ্‌গিরই পুরো ব্যাপারটার তদন্ত হতে চলেছে। বৈদ্যমহারাজ যে কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তাতে চুরি হয়েছে। ব্যাপারটা ছ মাস চাপা

পড়ে ছিল। খান্না আর তাঁর সঙ্গীরা কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিস্ট্রারের সঙ্গে দেখা করে তার তদন্ত শুরু করিয়েছেন। দরকার হলে এই দুজন অফিসারকে আমি সাক্ষী হিসাবে হাজির করাব।"

উকিল আরও বলেছিলেন, "হুজুর, এই-সব তদন্তের সময় খান্না আর তাঁর সঙ্গীদের দাবিয়ে রাখার জন্য, জোর করে তাঁদের মুখ বন্ধ করার জন্য এই মকদ্দমা চালানো হয়েছে। এই মকদ্দমাও একরকমের ষড়যন্ত্র। হুজুর,...।"

প্রিন্সিপালের উকিল এজলাসে কী বলেছিলেন, সে কথা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু সেদিন প্রিন্সিপালসাহেব গ্রামে ফিরে এসে বৈদ্যজীকে বলেছিলেন, কলেজের নির্বাচন আর কো-অপারেটিভের চুরি, দুই ব্যাপারেই তদন্ত হতে চলেছে।

কথাটা শুনে বৈদ্যজীর মুখে একটাও চিন্তার রেখা পড়ে নি। তিনি শুধু ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন, "হরির ইচ্ছা" বলে চুপ করে গিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রিন্সিপালসাহেব তাঁর পরিকল্পনা তৈরি করেই এসেছিলেন। তিনি খুব উত্তেজিত ছিলেন। তাই অবধীভাষায় বলেছিলেন, "মহারাজ, আমার মত হচ্ছে, খান্না ওদের হাত-পা ভেঙে কোনো নালার মধ্যে ফেলে দেওয়া হোক। আর তা যদি না হয় তো সকলের কান ধরে কলেজের বাইরে বার করে দেওয়া হোক। পাছায় চারটে লাথি মেরে আর...।"

কিন্তু বৈদ্যজীর ওপর এ কথার কোনো প্রভাব পড়ে নি। তিনি বলেছিলেন, "হিংসার কথা আমার ভালো লাগে না।" তারপর একটা ঢোক গিলেছিলেন।

প্রিন্সিপাল অপেক্ষা করছিলেন, এর পর তিনি আবার "হরির ইচ্ছার কথা বলবেন। কিন্তু তিনি কিছুই বলেন নি। হয়তো অহিংসা, পিস্তল, চুরি, দেশের কল্যাণ ইত্যাদি বিষয় তাঁকে নীরবে চিন্তিত করে তুলেছিল।

শরাবখানা থেকে প্রায় একশ গজ দূরে একটা বটগাছ আছে। ঐ গাছে একটা ভূত থাকে। অনেকদিনের পুরনো ভূত। স্বাধীনতা লাভ, জমিদারি প্রথার বিলোপ, গ্রামসভার পত্তন, কলেজ স্থাপন—এইরকম কয়েক শ ঘটনা সত্ত্বেও সে মরে নি। যারা এই ভূতের কথা জানে, সূর্য ডোবার পর তারা আর ঐ পথে যাওয়া-আসা করে না। যদি কখনও করেও, নানারকম আওয়াজ শুনতে পায়। ঐ-সব আওয়াজে পরে জ্বর আসে। জ্বরেই বেশির ভাগ লোক মরে যায়। যদি না মরে তো লোকে বলে, পণ্ডিত রাধেলাল খুব ভালো ভূত ঝাড়েন।

একদিন সন্ধ্যায় একজন লোক সাইকেলে করে ঐ বটগাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। গাছটা রাস্তার ধারে, তাই তার তলা দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ভূতের কথা সে জানত, কিন্তু তার আগে আগে ধীরগতিতে একটা ট্রাক যদি না যেত তা হলে এই সময় এই পথ দিয়ে যাবার সাহস হয়তো তার হ'ত না। ট্রাকের পেছন দিককার লাল আলো ধরে আর পশ্চিমে সূর্যের আলোর যেটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল তাকে দিনের নিশানা মনে করে সে ঝট্‌ করে বটগাছটা পার হয়ে গেল।

পার হয়ে গিয়ে সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তার গায়ে ফাল্গুনের হিমেল হাওয়া এসে ধাক্কা মারছে, তার ভালো লাগছে।

হঠাৎ তার উৎসাহ বেড়ে গেল, দু-তিনবার সে "কটিলোঁ-কটিলোঁ" বলে তিতিরের ডাক ডেকে এক কাল্পনিক জনসমাবেশকে শোনাল। তারপর অমরসিংহ রাঠোরের বিখ্যাত পালগান থেকে "নিকল গয়া জেয়সে শের শিকারী কো মার" গানটা গুন্‌গুন্ করে গাইতে আরম্ভ করল। আস্তে আস্তে গানের ভলিউম আপনা থেকে বাড়তে লাগল।

হঠাৎ লোকটা চমকে উঠল। রাস্তার একেবারে কিনারায় একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনতে পেল। মানুষের আওয়াজ বলে মনে হ'ল না। সাইকেল-আরোহী কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই বুঝতে পারল, এটা ভূতের আওয়াজ। তার ওপরের নিশ্বাস ওপরেই আটকে রইল আর নিচের হাওয়া নিচে দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার মনে হ'ল, ভূতটা কোনো আভাস না দিয়েই তার স্থান বদলে নিল, বটগাছ থেকে নেমে বোধ হয় পাকুড়গাছে এল।

আবার গোঁ গোঁ আওয়াজ শোনা গেল, এবং এবার বেশ জোরে। এর সঙ্গে কয়েকজন লোকের দুরকম আওয়াজও শোনা গেল। একজন জোরে হাসল, আর-একজন বলল, "বলেছিলাম না বেশি খেয়ো না, কিন্তু আমার কথা শুনলে না তো! আরও খাও বাপ!"

আর-একটা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, গান গাইছে। হাসির সঙ্গেই কে যেন হামিদ ডাকাতের পালার একটা তারানা শুরু করে দিয়েছে, "ন কীজৈ শোরগুল চিকচিক, শীশ সবকো ঝুকাতে হ্যায়।"

গোঁ গোঁ আওয়াজে এখন কয়েকটা আরোহ-অবরোহ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে একজন আরম্ভ করার ভঙ্গিতে বলল, গোঁ গোঁ। তারপর বোধ হয় কিছুটা মৌলিকতা দেখানোর জন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার

করে উঠল, "বাঁচাও!" তারপর আবার ঐ গোঁ গোঁ গোঁ। কিন্তু এবার আওয়াজে সেই জোর ছিল না, কেবল চিৎকার করতে হবে বলেই করা।

সঙ্গে সঙ্গে হামিদ ডাকাতের পালার গান বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আবার সে-ই হয়তো বলল, "বলেছিলাম বাপ, বেশি খেয়ো না। কিন্তু ফোকটের মদ!" তারপর আবার সেই হাসি। সেই হামিদ ডাকাতের গান।

সাইকেল-আরোহীর শরীরের ভেতরকার হাওয়ায় যে পরিবর্তন হয়েছিল তা ভূতের জন্য, মানুষের জন্য নয়। তাই মানুষের কথা শুনে একটা গোলযোগ আশঙ্কা করে সে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। তারপর চিৎকার করে বলল, "ঘাবড়িয়ো না পালোয়ান, এসে গেছি। খবরদার, হাত লাগিয়ো না।"

পাকুড়গাছের অন্যদিকে একটা ঝোপ আছে। তার পেছনে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে পাঁচ-ছজন লোক চলাফেরা করছে। কয়েক রকমের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে :

"গোঁ গোঁ গোঁ।"

"বাঁচাও।"

"বেশি কথা বোলো না বাপ! বলেছিলাম, বেশি খেয়ো না।"

"ন কীজৈ শোর-গুল চকচক, শীশ সবকো ঝুকাতে হ্যায়।"

সাইকেল-আরোহী অবাক হয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল আর কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে কোনো অজ্ঞাত বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করতে লাগল। এতক্ষণে একটা লোক ঝোপের পেছন থেকে বেরিয়ে বেশ সপ্রতিভভাবে সাইকেল-আরোহীর কাছে এসে দাঁড়াল। তার মুখ থেকে দেশী মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। সে বেশ

রোয়াব নিয়ে বলল, “কী ব্যাপার যুবক ? চেঁচাচ্ছ কেন ? কী কষ্ট হচ্ছে তোমার ?”

সাইকেল-আরোহী ঝোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, “ওখানে কে যেন ‘বাঁচাও বাঁচাও’ বলে চিৎকার করছে।”

“ওরা মদ খেয়ে মশগুল হয়ে পড়ে আছে। সব শালা চেঁচাতে চায়। কিন্তু তুমি কী করতে চাও ?”

রাস্তা দিয়ে আরও দুজন সাইকেলে করে যাচ্ছিল। এদের দেখে তারা সাইকেল থেকে আস্তে করে নেমে পড়ার উদ্যোগ করল। ঝোপের ধারের আওয়াজ এখন আরও জোর হয়েছে, কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। ঐ লোকটা মিলিটারি স্টাইলে বলল, “তোমাদের দাঁড়াবার দরকার নেই। এ-সব গাঁইয়াদের ব্যাপার। সব শালা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছে। তোমরা নিজের নিজের রাস্তায় ফল-ইন হয়ে যাও।”

সাইকেল-আরোহী দুজন এই উপদেশবাক্য শুনে তাদের গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। আগের সাইকেল-আরোহীও নাক কুঁচকে এগুল। যাবার সময় বলতে বলতে গেল, “সব শালা লুচ্চা। এই-সব মাতালদের জন্য সারা এলাকা বদ গন্ধে ভরে গেল।”

মিলিটারি স্টাইলের লোকটা জবাবে বলল, “তুমি ঠিক বলছ যুবক ! মদ খাওয়া ঠিক নয়।”

রাস্তা এখন নির্জন। লোকটা ওখান থেকেই বলল, “চলো ছেলেরা, ডবল মার্চ লাগাও। চলপ্ !”

জনপাঁচেক লোক ঝোপের ধার থেকে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল। তাদের কারও পা টলছে না। সবাই চুপচাপ। সবাই এমনভাবে এগুচ্ছে, যেন গেরিলা যোদ্ধদল, চীন আমাদের যে ভূখণ্ড দখল করে

নিয়েছে তা উদ্ধার করার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। ভূতের বটগাছটার ধার পর্যন্ত আসতে আসতে তারা রাস্তা ছেড়ে দিল। এটা ভূতের জন্যও হতে পারে, আবার জোরাল আলো জ্বালিয়ে সামনের দিক থেকে যে গাড়িটা আসছে তার জন্যও হতে পারে। রাস্তা থেকে নিচে নেমেই তারা একটা ফসলের ক্ষেতে পা দিল। ক্ষেতের চারদিকে বাবলা কাঁটার বেড়া দেওয়া। ক্ষেতে কোনো ফসল নেই, কেবল জমিটা রক্ষা করার জন্য কাঁটার বেড়া।

দলটা ক্ষেতের ওপর থেকে আবার রাস্তায় এল। শরাবঘর আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। একজন বলল, "রামচন্নার নিজের তো একটাও বাবলাগাছ নেই, এ-সব কার বাবলা সে উজাড় করে নিয়ে এসেছে ?"

"কে জানে কার বাবলা।"

"বোলো না। আমি এমনিতেই জানতে পারব।"

"জানতে পারবে তো জিজ্ঞাসা করছ কেন ?"

"জিজ্ঞাসা করছি, যাতে তোমার রঙটাও জানা যায়।"

লোকটা হাসতে লাগল। সকলকে উদ্দেশ করে বলল, "যোগনাথ জেল থেকে জেরা করা শিখে এসেছে।"

তারা সবাই শরাবঘরে ঢুকল। এখানে কেবল পাঁচ-সাতজন আগে থেকে আছে। একজন উৎসাহভরে বলল, "যোগনাথ! কবে ফিরলে জেল থেকে ?"

"আজ দুপুরের পরে।"

সে আরও উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন ছিলে ?"

"খুব ভালো ছিলাম।"

"চেনাজানা কাউকে পেয়েছিলে?"

"সবার সঙ্গে চেনাজানা হয়ে গিয়েছিল।"

"ওখানে বিশ্বেশ্বরও তো আছে! দেখা হয়েছে?"

"না। ওখানে সবাই বিশ্বেশ্বরের বাপ।"

"রামবাঁশ কাটতে হয়েছিল?"— কে যেন এক কোণ থেকে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল। যোগনাথ রেগে গিয়ে বলল, "কে বলছে এ কথা? কোন্ মুর্গির···?"

"আমাদের অতিথি।"

"ওঁকে বলে দাও, ওঁর শিঙাটা যেন বন্ধ রাখেন। শিবপালগঞ্জে ওর কদর নেই।"

"শুনেছ অতিথি? এ হচ্ছে যোগনাথ। সবে জেল থেকে এসেছে। বলছে, তোমার শিঙা বন্ধ রাখো।"

"আমার কাছ থেকেও শুনে নাও। আগেই বলে দিচ্ছি, আমি এক নম্বরের হারামী। চুপচাপ মদ গিলে যাও আর ওখানে ঐ কোণে গিয়ে উল্টে পড়ো। ফের রামবাঁশের কথা বললে একেবারে রামবাঁশই দেখিয়ে দেব।"

"শুনেছ অতিথি?"

"কে শুনবে? এখানে কোণ তো খালি।"

"আরে, কোথায় গেল অতিথি? সটকে পড়ল নাকি?"

"আরে বা রে অতিথি!"

যোগনাথ দশ টাকার একটা নোট বার করে দোকানদারকে দিতে দিতে বলল, "সবাইকে এক এক গেলাস দাও। কেউ যেন বাদ না পড়ে। অনেকদিন পরে নিজের ভিটেতে এসেছি।"

'অনেক পয়সা নিয়ে এসেছ।"

"শনিচর ব্যাটা প্রধান হয়েছে, তার হুকুম আজ সবাই মৌজ করে খাবে।"

"কিন্তু শনিচরের কাছে পয়সা কোথায়?"

"এখন শনিচর আর শনিচর নেই, প্রধান হয়েছে। বুঝেছ?"

সবাই এক এক গেলাস নিয়ে বসে গেছে। এটা দোকানের বাইরের বারান্দা, একটা শিকের দেয়াল দিয়ে রাস্তা থেকে আলাদা করা। দোকানটা ভেতরের এক ঘরে। বারান্দায় একটা লণ্ঠন জ্বলছে, তাতে যারা মদ খাচ্ছে তাদের দেখা যাচ্ছে। দোকানের ভেতরে একটা কুপি জ্বলছে, তাতে যে মদ খাওয়াচ্ছে তাকে দেখা যাচ্ছে না। বারান্দায় একটা বেঞ্চে দুজন লোক বসে আছে। যোগনাথও তার ওপর গিয়ে বসল। বাকি সবাই নিচে শতরঞ্জির ওপর বসেছে, কিছু কাঁচা মাটিতে বসেছে। সাকী, সরাই, পেয়ালা —সব-কিছুই এর মধ্যে আছে। দেশী মদের বদ গন্ধ রাস্তায় অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। যোজনগন্ধার সুগন্ধমাত্রেই রাজা শান্তনু যেমন দূর থেকে তা টের পেতেন, তেমনি এই গন্ধ থেকেই দূর-দূরান্তের লোকেরা জানতে পারে এখানে দেশী মদ বিক্রি হয়। আমাদের এখানে গন্ধই দেশী মদের বিজ্ঞাপন। তাই ভালো ভালো খবরের কাগজে বিলিতি মদের বিজ্ঞাপন দেখা গেলেও দেশী মদের কোনো উল্লেখ থাকে না। দেশী মদের বিজ্ঞাপনের দরকার হয় না।

দু-তিন ঢোঁক খাবার পর যোগনাথ এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "জল মেশানো।"

"কী?"

"জল! মদে জল মিশিয়ে বিক্রি করছে।"

"আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।"

"আমারও।"

"আমারও। অনেকদিন থেকেই এমন মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন তো জল মেশানো মদ আসল মদের মতো লাগছে।"

দোকানদার তার জায়গা থেকে উঠে যোগনাথের কাছে এসে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা স্বরে বলল, "মৌজ করে খাও। তোমার হাওয়া তো প্রথম গেলাসেই বেরিয়ে যাচ্ছে। একপোয়া-আধপোয়া ফোকটে খেতে চাও তো সাফসাফ বলো, খাইয়ে দেব। কিন্তু জল-টল চিড়িমাররা মেশায়, এখানে ও-সব নেই।"

যোগনাথের ওপর এর উপযুক্ত প্রভাব পড়ল। পকেট থেকে কয়েকটা দশটাকা আর পাঁচটাকার নোট বার করে বলল, "ফোকটে খেতে হলে খাব, কিন্তু ঘাবড়িয়ো না, এই দেখো। কখনও দেখেছ এত?"

দোকানদার রোগাপাতলা মানুষ, কিন্তু চালাক। তাই বেশি কথা না বাড়িয়ে রাগতভাবে ফিরে গেল। বলল, "আমার দেখার দিন চলে গেছে। এখন তোমার দেখার দিন এসেছে, দেখে যাও।"

আবার গেলাস ভরে উঠল। একজন জিজ্ঞাসা করল, "এখন কী ইচ্ছে যোগনাথ?"

"টাকার দরকার।" কথাটা যোগনাথ এমনভাবে বলল যেন কারও তা বিশ্বাস করা উচিত নয়। যোগনাথ বলল, "আগে দারোগাবাবুর সঙ্গে একহাত হবে। বদলি হয়ে গেছেন তো কী! আমি ছাড়বার পাত্র নই। এখানে আসার আগে শহরে ওঁর ওপর এক মামলা ঠুকে এসেছি। দশটা শুনানীতে প্লাস্টার ঢিলা হয়ে যাবে।"

"কিসের মামলা?"

"দেওয়ানী। তুমি জানো না, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে করে চুরির

মামলা চালিয়েছিল। দু-তিন মাস আমাকে হাজতে থাকতে হয়েছিল।”

“বৈদ্যজী জামিনের ব্যবস্থা করেন নি?”

“উনি তো করতেন, কিন্তু আমি জিদ ধরলাম। বললাম, দারোগার নামে এখানেই থাকব। থাকার জন্য তো আর ভাড়া লাগে না।”

“তারপর?”

“তারপর আর কী! আমার বেইজ্জতি হ'ল, চাষবাসের ক্ষতি হ'ল। একটা ক্ষেত রামচন্না দখল করে নিল। এই-সব ক্ষয়ক্ষতির জন্য আট হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলা ঠুকে দিয়েছি। ডিক্রি হয়ে গেলে দারোগাবাবু বিকিয়ে যাবেন।”

“কিন্তু কোর্ট-ফী'র কী হবে? দেওয়ানী মামলায় তো অনেক খরচ।”

“সব ভগবান দেবে।”

“দেখো ভাই যোগনাথ, বামুনের ঘরে জন্মে এদিক-ওদিক হেঁকো না। সত্যি কথা বলো।”

“হ্যাঁ ভাই, আমিও বলছি, ভগবানকে এর মধ্যে এনো না। কোর্ট-ফী কে দেবে?”

“বললাম তো, ভগবান দেবে।”

“এখন ও ভয় পেয়ে গেছে, বলবে না। না বলো, আগে বাড়ো। তো মকদ্দমা ঠোকা বাকি আছে, না ঠুকে দিয়েছ?”

“ঠুকে দিয়েছি।”

“কবে ঠুকেছ?”

“আজ ঠুকেছি।”

ঝোপের পেছন থেকে একজন লোক টলতে টলতে বেরুল। কাতরাতে কাতরাতে রাস্তা দিয়ে চলল। লোকটা আত্মদয়া, আক্রোশ ইত্যাদি কয়েকটা সাহিত্যিক গুণে পীড়িত। শরাবঘরে তার যে কথাগুলো পৌঁছুল তাতে বোঝা গেল, খানিকক্ষণ আগে সেই ভূতের বটগাছটা ছাড়িয়ে রাস্তার ধারে রাহাজানি হয়েছে। কয়েক-জন লোক তার সব-কিছু লুঠ করে নিয়েছে। সে থানায় রিপোর্ট লেখাতে যাচ্ছে। এখন সে সবাইকে দেখে নেবে।

যোগনাথের পায়ের কাছে কাঁচা মাটিতে একটা লোক অচঞ্চলভাবে গেলাসের পর গেলাস খেয়ে চলেছে। হঠাৎ সে বলল, "তোমাদের গ্রামে এটা বড়ো অন্যায় ব্যাপার পালোয়ান। দিন ডুবতেই লোকে লেফ্‌ট্‌-রাইট করতে করতে রাহাজানি করে! এটা অত্যন্ত বাজে জিনিস। কী জওয়ান? কী বলছ?"

যোগনাথ শুধু মাথা নাড়ল। তারপর দোকানদারকে ডেকে বলল, "এক পোয়া আরও দাও ভাই। ইচ্ছে হলে এটা ফোকটেই দিয়ো।"

একটু পরে যখন তারা টলতে টলতে শিকের পর্দার বাইরে এল তখন তাদের সামনে রাস্তা। রাস্তায় দু-একটা খেঁকী কুকুর ছাড়া আর কেউ নেই।

যে লোকটা কাতরাতে কাতরাতে আসছিল, সে সিধেসাধাভাবে তাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। তারা তা টেরই পেল না। ফেরার সময় লোকটার ভেতরকার কলুষ ধুয়েমুছে গেছে। ধর্মের প্রতি তার আস্থা বেড়েছে, কারণ থানায় যাবার আগেই একজন বিদ্বান্ তাকে বুঝিয়েছে, "কী হবে রিপোর্ট লিখিয়ে? যা গেছে তা গেছে। হারানো মাল কখনও ফিরে আসে? বলো, তুমি

হিন্দু, না মুসলমান? হিন্দু হলে ভাগ্য মানো কি মানো না? তোমার ভাগ্যে এই পঁয়তাল্লিশ টাকা লেখা ছিল না। এখন দৌড়-ঝাঁপ করা অনর্থক। ভগবান এ-ই চেয়েছিলেন। যাও, প্রাণে বেঁচে গেছ, এ-ই যথেষ্ট। গত বছর ওখানে একটা লোককে ছাগল কাটার মতো কাটা হয়েছিল। রাম নাম করো আর বাড়ি গিয়ে সত্যনারায়ণের পুজো দাও। মামলা-মকদ্দমায় যা খরচ করতে তা ধর্মকর্মে খরচ করো। গরম ত্বধে হলুদ দিয়ে খেয়ো আর পাশ ফিরে শুয়ো, কাল সকালে সব ভুলে যাবে।"

বাইশ

আখড়া থেকে ত্ব'জন পালোয়ান হেলতে ত্বলতে বেরুলেন। একজন বড়ী, আর একজন ছোটে। ত্ব'জনেরই মাথা কামানো। কামানো মাথায় ঘামে আর মাটিতে একটা পলেস্তারা মতো পড়েছে। ঘাড়ে গণ্ডারের মতো ভাঁজ।

ছোটে পালোয়ান থেকে থেকে খুব আস্তে করে বিলাপ করে উঠছেন। কিন্তু আত্মসম্মানের জন্য সেই বিলাপ মুখ থেকে 'হায়' হয়ে না বেরিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে 'হাফ্' হয়ে বেরুচ্ছে। বড়ী চুপচাপ তাঁর সঙ্গে চলেছেন, যেন এ-সবের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।

বদ্রী পালোয়ান আজ ছোটেকে ধোপার পাটে আছড়ানোর মতো আছড়ে চিত করে ফেলেছিলেন। বদ্রী পালোয়ান যদি ছোটের ওস্তাদ না হতেন তা হলে ছোটে এখন চোখ থেকে জল আর মুখ থেকে ফেনা বার করে তাঁকে হাজার রকমের গালাগাল দিতেন। কিন্তু ওস্তাদকে সম্মান দেখিয়ে তিনি এখন চুপ করে আছেন। চুপ করে চলা যখন কঠিন হয়ে পড়ছে তখনই তিনি মুখ থেকে একটা 'হাফ' বার করেছেন।

কিন্তু বিপদ এখানেই শেষ হ'ল না। বদ্রী পালোয়ান হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেদিন যোগনাথের সাক্ষীতে তুমি কী বলে এসেছ?"

ছোটে বেপরোয়াভাবে— কোমরের ব্যথাটা চেপে— জবাব দিলেন, "কোন্ শালা যোগনাথের সাক্ষী ছিল? আমি তো পুলিসের সাক্ষী দিতে গিয়েছিলাম।"

বদ্রী শান্তভাবেই বললেন, "সোজা কথা বললে সোজা উত্তর দাও। মাঝখানে শালা-ভগ্নীপতিকে টেনো না।"

"তো কে টেড়া-বাঁকা বলছে?"— ছোটে এ কথা বললেও তাঁর গলার স্বর কিছুটা নরম মনে হ'ল।

বদ্রী পালোয়ান এই নিরর্থক কথাটা যেন শুনেও শুনলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সাক্ষীতে তুমি বেলার সম্বন্ধে কী বলেছ?"

"বলব আর কী! যা মুখে এসেছে, বলে দিয়েছি।"

বদ্রী পালোয়ান খুব মোলায়েম স্বরেই কথা বলেছেন। তিনি ছোটের হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "যোগনাথের সঙ্গে ওর কোনো সাটগাট আছে নাকি?"

ছোটে আস্তেকরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন। একটু আগেই তিনি

দেখেছেন, আঙুল ধরে কব্জি ধরা যায় আর কব্জি ধরে ধোবীপাট প্যাঁচের সাহায্যে চিত করে ফেলা যায়। কথাটা এড়াবার জন্য তিনি বললেন, "আমি কী করে জানব, কার সঙ্গে কার সাটগাট আছে। গ্রামের চারিদিকে অড়হরের ক্ষেত, আমি কোথায় কোথায় দেখে বেড়াব, কে কার সঙ্গে জাপটা-জাপটি করছে?"

বদ্রী পালোয়ান আগের মতোই মেলায়েম স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু তুমি তো বলেছ, বেলাকে তুমি যোগনাথের সঙ্গে লটরপটর অবস্থায় দেখেছ।"

"বলেছি তো কী হয়েছে?"

বদ্রী পালোয়ান দাঁড়িয়ে পড়লেন। গলার স্বর কঠিন করে বললেন, "কেন হবে না? বলেছ কিনা বলো।"

ছোটে পালোয়ান এবার কিছুটা ভয় পেলেন। তার গলার স্বর থেকে আত্মবিশ্বাসের জোর কমে যেতে শুরু করল। শাশ্বত সাহিত্য-লেখক ক্রান্তিদর্শী সাহিত্যিকও যেমন রেডিওর কর্মচারীদের সামনে সংকুচিত হয়ে কথা বলেন তেমনি ছোটে বদ্রী পালোয়ানের সামনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। মাপ চেয়ে বললেন, "বলব না কেন, গুরু! অনেক কিছুই তো বলেছি। আদালতের সাক্ষী, যা মুখে এসেছে, বলে গেছি। সত্যি কথা বলার বালাই তো ছিল না।"

বদ্রী পালোয়ান কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছু বললেন না। কোনো পালোয়ানই যে কাজ সহজে করতে পারেন না, তিনি তা-ই করতে লাগলেন। অর্থাৎ ভাবতে লাগলেন।

ছোটে এতে আরও বিভ্রান্ত হয়ে বললেন, "গুরু, কী ভাবছ?

চিন্তাভাবনা করা তো চিড়িমারদের কাজ। আমাকে অন্তত বলো, কী হয়েছে।”

বদ্রী ধীর স্বরে বললেন, “ভাবছি, তোমাকে লাথি মারব, না জুতো মারব। তোমার জিভে কুকুরের বাচ্চা মুতবে, শালা। ধিক্ তোমাকে।”

বদ্রী পালোয়ান ঘৃণায় মাটিতে থুতু ফেললে। ছোটে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। থেমে থেমে বললেন, “এমন কথা বোলো না গুরু। তুমি বলো, কোথায় আমার ভুল হয়েছে।”

“তুমি শালা কী বুঝবে। সারা ছুনিয়ার সামনে তুমি এক ভদ্রঘরের মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করেছ। তোমার কাছে এটা কিছুই না?”

শুধু এ-ই! ছোটে পালোয়ান স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তারপর বেপরোয়াভাবে বললেন, “গুরু, আমি যা বলেছি সে তো ভরা আদালতে ভগবানের নামে শপথ নিয়ে বলেছি। সবাই জানে, আদালতে যে-সব কথা বলা হয় তা সত্যি নয়। এতে কার কী ক্ষতি হয়?”

বদ্রীকে চুপ করে থাকতে দেখে ছোটের সাহস আরও কিছুটা বেড়ে গেল। তিনি তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, অর্থাৎ সারা ছুনিয়াকে পতঙ্গের মতো তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাঁর কথা শেষ করলেন, “এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি আমাকে জুতোচ্ছ, গুরু? বাঃ গুরু। তুমিও মাঝে মাঝে এমন করো গুরু যে, বাঃ! আমি তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না, কী হয়েছে।”

বদ্রী পালোয়ান তাঁর নিজের ঘাড়টা ছু হাত দিয়ে রগড়ে তার ওপর ছু-চারটে চড়ের মতো কষিয়ে দিলেন। এতে ঘাড়ে যে মাটির পলেস্তারা জমেছিল তা খসে গেল আর এতক্ষণ ধরে তিনি যে

চিন্তাভাবনা করছিলেন, হঠাৎ তা দূর হয়ে গেল। বদ্রী পালোয়ান বললেন, "তুমি একটা খানদানী গাড়ল। ডান-বাঁ তোমার চোখে পড়ে না। এই বেলা এখন তোমার মা হতে যাচ্ছে। এখন ওকে ইচ্ছে হয় ছিনাল বলো, কি অন্য কিছু। গালিটা তোমার ওপরই পড়বে।"

"কী বললে গুরু?"

"বলব আবার কী? মাসখানেকের মধ্যেই বেলার বিয়ে, বদ্রী পালোয়ানের সঙ্গে। তুমি বাজাবে শানাই। কিছু বুঝলে বাপ?"

বদ্রী পালোয়ানের কথা শুনে ছোটের মনে হ'ল, যেন কয়েক রকমের নিরর্থক কথার একটা স্তূপ তাঁর সামনে পড়ে আছে আর কেউ তাঁকে তার ওপর জোরে আছাড় মেরে চিত করে ফেলেছে। তার মুখ দিয়ে শুধু বেরুল, "কী বলছ, গুরু?"

বদ্রী খুব হালকাভাবে ঠাট্টার সুরে বললেন, "শুনতে পাচ্ছ না, কী বলছি। কী ব্যাপার? কানে অনেক ময়লা জমে আছে নাকি? তাকে কথা দিয়েছি। সেদিন তুমি যখন এজলাসে তার বদনাম করছিলে তখন আমার শরীরের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠেছিল। ইচ্ছে করছিল, একটা থাপ্পরে তোমার মাথা পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিই। কিন্তু তুমি আমার চেলা, পালক-বালক বলে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম।"

বদ্রী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাঁর কথা শেষ করলেন, "যাকগে, যা হবার, হয়ে গেছে। এখন জিভে লাগাম লাগিয়ে থেকো।"

ছোটের এখনও মনে হচ্ছে, যেন সেই নিরর্থকতার স্তূপের ওপর চিত হয়ে পড়ে আছেন আর বদ্রী পালোয়ান যা বলছেন তা স্বপ্নে শোনা কথা। ছোটে বলছেন, "গুরু, তুমি বামুন আর ও বেনিয়া।

একটু ভেবেচিন্তে বলো। বৈদ্য মহারাজ বেঁকে বসলে সারা স্কীম নষ্ট হয়ে যাবে।”

বদ্রী পালোয়ান বললেন, “হাতি তার পথে এগিয়ে যায় আর কুকুরে ডাকতেই থাকে।”

ছোটে অনেকটা যেন বিড়্‌বিড়্‌ করেই বললেন, “গুরু, তুমি তো প্রবাদবাক্য বলছ। বৈদ্যজী থোড়াই মানবেন।”

বদ্রী পালোয়ান যেন তাঁর মনের রহস্য প্রকাশ করে দিয়ে হালকা হয়ে গেছেন। ছোটের কথার তিনি কোনো জবাব দিলেন না। কেবল শিস্‌ দিতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ চলার পর ছোটের মাথায় পুরো ব্যাপারটা ঢুকল। বেলা সম্বন্ধে কিছুদিন ধরে খবর রটেছে যে, রুপ্পনবাবু তাকে একটা চিঠি লিখেছেন। উড়তে উড়তে এ কথাটাও তাঁর কানে পৌঁচেছে যে, একদিন রাত্রে একটা মেয়ে বৈদ্যজীর ছাদে এসেছিল, তারপর রঙ্গনাথের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফিরে গেছে। বৈদ্যজীর ছাদ থেকে যে-সব বাড়ির ছাদে যাওয়া যায় তার মধ্যে গয়াদীনের বাড়িও পড়ে। রুপ্পনবাবু একদিন এমন কথাও বলেছিলেন যে, একটা মেয়ের লেখা একটা চিঠি রঙ্গনাথের হাতে পড়েছে, কিন্তু রঙ্গনাথ সে সম্বন্ধে কিছু বলছে না। ছোটে পালোয়ানের সন্দেহ ছিল, রুপ্পনবাবু কিছুদিন থেকে বেলাকে ফাঁসিয়েই ফেলেছেন। এই অবস্থায় বদ্রী পালোয়ানের সঙ্গে বেলার এমন গভীর সম্পর্কের খবরে ছোটে ঘাবড়ে গেলেন।

ছোটে জিজ্ঞাসা করলেন, “কিন্তু গুরু, বেলার জন্য তো শুনছি রুপ্পনবাবু কিছু লেখাপড়াও করেছে।”

“হ্যাঁ, করেছেন। ছেলেমানুষ, না বুঝে করে বসেছেন।”

“আর শুনছি, ওদিক থেকেও চিঠি এসেছে।”

বদ্রী পালোয়ান ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কে বলেছে?”

“কেউ না, গুরু।”

“তা হলে জানলে কী করে?”

“শুনেছি, গুরু।”

“কার কাছ থেকে শুনেছ?”

“মনে নেই, গুরু। কিন্তু কেউ একজন এমনিই উড়ো কথা বলেছে।”

বদ্রী পালোয়ান চুপ করে রইলেন। আদালতে সত্যি কথা বলার শপথ নিয়ে পেশাদার সাক্ষী জেরার সময় যে আচরণ করে, কোনো লোক যদি কথাবার্তার সময় সেই আচরণ করতে থাকে তা হলে তাকে প্রশ্ন করা বৃথা। তাই বদ্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্পষ্ট করে বললেন, “হ্যাঁ, চিঠি এসেছিল। আমার চিঠি। কিন্তু সেটা ঠিক চিঠি নয়, আজকালকার মেয়েদের বোকামি। গানবাজনার কথা।”

ছোটে খোশামোদের সুরে বললেন, “তো গুরু, এই ব্যাপারটা নিশ্চয় কয়েক বছর ধরে চলছে? ছাদের পরেই···।”

বদ্রী বললেন, “ছোটে, এত বড়ো কথাটা সবার আগে তোমাকে বললাম এ-ই যথেষ্ট। এখন আর যাচাই-টাচাই কোরো না। আর দেখো, এখন কাউকে কিছু বোলো না।”

ছোটে অন্ধকারের মধ্যে একটা চবুতরার কোণায় ঘা খেলেন। মুখে একটা গালাগাল দিয়ে কোমরের ব্যথার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য একবার ‘হাফ্’ বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, “কাউকে বলব না, গুরু।”

"কিছুদিনের মধ্যেই কথাটা ছড়িয়ে পড়বে, তবু কথাটা এখন চেপে রাখতে হবে।"

"বললাম তো গুরু, কাউকে বলব না।"

একটু পরে বদ্রী পালোয়ান হাসতে লাগলেন। বললেন, "তুমি তো আচ্ছা লোক ছোটে, কী জোড় মিলিয়েছ! বেলা যোগনাথের সঙ্গে সাটগাট করবে! হুঁঃ! শালা ভাগাড়ের শকুন। বেলা ওর হাত ধরলে তো উদ্ধার হয়ে যাবে। তার সঙ্গে তুমি বেলাকে ভিড়িয়ে দিলে! তুমি খাটাশের খাটাশই রয়ে গেলে!"

ছোটে পালোয়ানের কোমরে একটা ফিক ব্যথার মতো উঠল। মনে হ'ল, কেউ তাঁকে ধোবীপাটের প্যাঁচ কষে আবার আছাড় মেরেছে।

ছাড়াছাড়ি হবার আগে বদ্রী আবার ছোটেকে সাবধান করে দিলেন, "আমার আর বেলার সম্পর্কের কথা এখন কারও কাছে বোলো না।"

ছোটে নিষ্ঠাভরে গোপনীয়তার শপথ নিলেন। কিন্তু এই গোপনীয়তার শপথ অনেকটা রাজভবনে যে গোপনীয়তার শপথ নেওয়া হয় তার মতো। তাই পরের দিন বদ্রী পালোয়ান এমন কিছু লোকের সাক্ষাৎ পেলেন, যাঁরা তাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছে।

তেইশ

এই গ্রামে একটা দুঃখী ছেলে আছে। তার নাম রুপ্পনবাবু। কিছুদিন আগেও তার প্রবল প্রতাপ ছিল, মর্যাদাও ছিল উচুঁ— কারণ, তার বাবার নাম বৈদ্যজী আর তা ছাড়া তার নিজেরও একটা নাম আছে। সে বেশ কয়েক বছর ধরে ক্লাস টেনে পড়ছে, ছাত্রদের লীডারও সে। তহসিলদার তার বন্ধু, থানাদার তার দরবারী, প্রিন্সিপাল তার গোলাম। সাধারণভাবে সে কলেজের মাস্টারদের আচরণ আর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট আর মাস্টাররা তাকে "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং" আর পিতার পিতা মনে করেন। বাড়িতে সবাই তাকে একটা তেজী বাছুরের মতো দেখে। এটা নিশ্চিত যে, দেশের রাজনৈতিক চারণভূমিতে বিচরণশীল সম্ভাবনাময় সন্তানদের মতো সেও একদিন বিচরণকলা শিখে ফেলবে এবং তার বাবার মৃত্যুর পর এদিক-ওদিক রাস্তায় একবছর কি ছ' মাস কাটিয়ে তারপর একদিন তার বাবার জায়গাতেই জাবর কাটবে।

পাঁচ মাস আগে এই গ্রামে একটা ছেলে এসেছে। তার নাম রঙ্গনাথ। লোকে তার বড়ত্বকে জানে, কারণ তার মামার নাম বৈদ্যজী আর তা ছাড়া তার নিজেরও একটা বড়ত্ব আছে— সে ইতিহাসে এম. এ. পাস করেছে। সে সহজ-সরল ভালোমানুষ,

কিন্তু ইচ্ছে হলে বাঁকা কথাও বলে। প্রায় প্রত্যেক লেখাপড়া জানা ভারতীয়ের মতো সে-ও তার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন প্রত্যেক ঘটনাকে ঘটনার মতোই দেখে এবং ভুলে যায়, আর পরে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। সে ইতিহাস পড়েছে বলে রাজনৈতিক আর সামাজিক শোষণ আর উৎপীড়নের অনেক কাহিনী তার জানা আছে। কিন্তু এ কথাটা কখনও তার মাথায় আসে নি যে, সে-ও ইতিহাসের একটা অংশ আর ইচ্ছে করলে সে-ও ইতিহাসকে ভাঙতে-গড়তে পারে। সে-ও দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন বুদ্ধিজীবীর মতো—যাঁদের বুদ্ধি আত্মতুষ্টি দেয়, তর্ক করার কায়দা শেখায়, অন্যদের কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় তা নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ায় এবং করা আর না-করার ব্যাপারে তাঁদেরও যে কিছু দায়িত্ব আছে এই বাজে চিন্তা থেকে তাঁদের কয়েক ক্রোশ দূরে রাখে।

যা-ই হোক, যে ছেলেটির নাম রুপ্পনবাবু, সে এখন দুঃখী। কারণ, কিছুদিন যাবৎ সে রাজনৈতিক পছন্দ আর অপছন্দর মধ্যে তার ব্যক্তিগত পছন্দও ঢোকাতে আরম্ভ করেছে এবং এতে যে-সব খারাপ জিনিস আগে তার চোখে পড়ত না সেগুলো এখন ফুটবলের মতো তার চোখের পাতার সঙ্গে ঝোলানো মনে হচ্ছে। আগে কলেজের প্রিন্সিপালকে সে তার বাবার গোলাম মনে করত, এখন তার মনে হতে আরম্ভ করেছে যে, সে নেহাৎ মূর্খ আর জেদী এবং মাস্টারদের প্রতি তার বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য তার বাবাকে জোটের মধ্যে টানছে। আগে কয়েকজন মাস্টারকে তার মূর্খ আর নির্বোধ মনে হ'ত, কিন্তু এখন কিছুছিন থেকে তার মনে হচ্ছে, তারা নির্বোধ হলেও বদমাশ নয়, এবং তাদের রক্ষা করা উচিত। বদ্রী পালোয়ানকে কিছুদিন আগেও তাঁর শক্তির সবচেয়ে বড়ো দুর্গ বলে মনে হয়েছে

এবং তাঁর এই শক্তির জন্য সে মনে মনে গর্ব অনুভব করেছে, কিন্তু এখন তার দৃষ্টি পড়েছে আশপাশের সব জেলার গুণ্ডাদের ওপর। এই-সব গুণ্ডারা মাঝে মাঝে শিবপালগঞ্জে আসে এবং বদ্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে যায়। অর্থাৎ ছেলেটার মনে এমন একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য মানুষ বিভীষণ, ট্রট্স্কি কিংবা সুভাষচন্দ্র বসু হয়ে কিছু দেখাতে চায় আর শেষে ফাঁসির তক্তায়, জেলে অথবা জয়প্রকাশনারায়ণ আর অচ্যুত পটবর্ধনের সন্ন্যাসের মধ্যে গিয়ে নিশ্বাস নেয়।

দ্বিতীয় ছেলেটাও কিছু আনমনা হয়ে পড়ছে, কারণ এই পাঁচ মাসে সে দেখে নিয়েছে যে, যা হাসিখেলার মধ্যে শুরু হয়েছিল, এখন তাতে লোকের হাত-পা ভাঙতে আরম্ভ করেছে আর হাসতে হাসতে অন্যের চোখে যে ধুলো ফেলা হয়েছে তাতে তার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। যখন শনিচরের প্রধান হবার কথা উঠেছিল অথবা যখন ছোটে পালোয়ান যোগনাথের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন তখন সবকিছু হাসিঠাট্টার মতো মনে হয়েছিল, কিন্তু যখন সে দেখল, শনিচর সত্যি সত্যিই গ্রামসভার প্রধান হয়েছে আর ছোটে যোগনাথকে জেল থেকে খালাস করে হাসতে হাসতে ফিরে এসেছেন তখন সে একটা ধাক্কা খেল। শনিচরের জয়লাভের দিন সে অনেক কিছু ভেবেছিল আর বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতে না-জানি কত বৈদ্যজী আর মন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর সারিতে না-জানি কত শনিচরকে ঢুকে পড়তে দেখেছিল।

যে ছেলেটির নাম রুপ্পনবাবু তার মনে যেদিন অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন আর-একটা ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু সেই ঘটনার সঙ্গে তার মনের অস্থিরতার কোনো সম্বন্ধ নেই। ছেলেটার অনেকদিন থেকেই একটি মেয়ের দরকার ছিল আর এই কথাটা অনুভব করে

ভেবেছিল যে, তার কেবল বেলাকেই দরকার। তারপর সে তার ইচ্ছাকে, যে ইচ্ছা পোকা-মাকড় পশু-পক্ষী ইত্যাদিতে ঋতু অনুসারে আর মানুষে ঋতু-অঋতু সব সময়েই প্রকাশ পায়, তাকে "প্রেম" আখ্যা দিয়েছিল। ছেলেটা ভাবতে আরম্ভ করেছিল যে, সে বেলাকে ভালোবাসে এবং পুরো খবর না জেনে সে এ-ও ভাবতে শুরু করেছিল যে, বেলাও নিশ্চয় তাকে ভালোবাসে। এই বেলাকে সে একটা প্রেমপত্র লিখেছিল। বেলা তো তার জবাব দেয়ই নি, বরং তার জন্য তাকেই কয়েক জায়গায় আর কয়েকবার জবাব দিতে হয়েছে। জবাব দেবার সময় সে তার গাম্ভীর্য বজায় রাখলেও ভেতরে ভেতরে লজ্জা পেয়েছে এবং যেদিন খান্না মাস্টারের কাছ থেকে শুনেছে যে, বেলা আর বদ্রী পালোয়ানের মধ্যে আটগাট আছে এবং বদ্রী বেলাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সেদিন থেকে তার মন ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছে, আর কে জানে কেমন করে, সেই অস্থিরতা তাকে প্রিন্সিপাল, বৈদ্যজী, বদ্রী পালোয়ান, শনিচর সবার সম্বন্ধে বাঁকাতেড়া ভাবতে বাধ্য করেছে। এতদিন পর্যন্ত সে যথার্থ প্রদর্শন করেছে, এখন তার জীবনে যথার্থের দর্শন শুরু হয়ে গেল।

এইসঙ্গে দ্বিতীয় ছেলেটিও বুঝতে পারল যে, শোষণ আর উৎপীড়নের কাহিনী মুখস্থ করাটাই যথেষ্ট নয়, যে গাধার পিঠে সারা বেদ, উপনিষদ্ আর পুরাণের বোঝা চাপানো হয়েছে সে অন্তর্রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ পরিষদের অধ্যক্ষ হলেও মানুষ হয় না— তা হবার জন্য বিদ্যার বোঝা বওয়া ছাড়া আরও কিছু করতে হয়।

খান্নামাস্টার রুপ্পনবাবুর কাছে বদ্রী পালোয়ানের প্রেমকাণ্ড বর্ণনা করার আগে আর একটা কথাও বলেছিলেন। তাঁদের সম্মেলনটা

হয়েছিল হোলির তিন দিন বাদে, চাঁদ বেরুবার পর, রাস্তার ধারে একটা কালভার্টের ওপর। এই কালভার্টের ওপর বসেই কিছুদিন আগে রঙ্গনাথ রুপ্পনবাবুর কাছে তার সেই রাত্রের ছাদের ঘটনা বলেছিল।

খান্নামাস্টারের সঙ্গে মালবীয়ও ছিলেন। তুজনেই আগে থেকে কালভার্টের ওপর বসে ছিলেন। রুপ্পনবাবু হোলি উপলক্ষ্যে অবিরাম ভাং খেয়ে খেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনি এখন আবার নতুন করে ভাং খেয়ে রঙ্গনাথের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন। কালভার্টের ওপর তুজন লোককে বসে থাকতে দেখে তিনি তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, "কে রে ?"

"কে ? রুপ্পনবাবু ? নমস্কার রঙ্গনাথজী, আমি খান্না।"

"আর-একজন কে ?"

"আমি মালবীয়। নমস্কার রুপ্পনবাবু। আসুন, বসুন।"

নিজের মাস্টারের অভিবাদনের এক চলতি জবাব দিয়ে রুপ্পনবাবু কালভার্টের ওপর বসে পড়লেন। রঙ্গনাথ অন্যদিকে গিয়ে বসল। "বিগ ফোর"-য়ের বৈঠক শুরু হয়ে গেল।

এখন রাত প্রায় ন'টা। কিন্তু কোথাও নিঝুমতা নেই। তহসিলের সামনে পানের দোকানে ব্যাটারিওয়ালা রেডিওটা সমানে বেজে চলেছে আর ফিল্মীগানের পয়োনালী থেকে "অরমান, সাজনা, হসীন জাতুগর, মঞ্জিল, নজর, তু কাহাঁ, সীনা, গলে লাগা লো, গলে লাগ জা, মচল-মচলকর, আঁধিয়া, গম, তমন্না, পরদেশী, শরাব, মুসকান, আগ, জিন্দগী, মৌত, বেরহম, তসবীর, চাঁদনী, আসমান, সুহানা সপন, যৌবন, মস্তী, উভার, ইন্তেজার, বেজার, ইসরার, ইনকার, ইকরার" প্রভৃতি শব্দ অবিরাম ঝরে পড়ছে। বুভুক্ষু দেশে নব-

জাগরণের বার্তা ছড়ানোর পক্ষে এগুলো সবদিক দিয়েই উপযুক্ত। পয়োনালী থেকে এই ঝরে পড়ার আওয়াজ দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে, আর বাতাসের ঝাপটায় এই কালভার্টের ওপরও এসে পৌঁছুচ্ছে।

কাছেই শেয়াল ডেকে চলেছে। তাতে প্রমাণ হচ্ছে যে, সমষ্টিগত-ভাবে বাস করার শক্তি তাদের মধ্যে যথেষ্ট আছে এবং গ্রামের আশপাশের সমস্ত জঙ্গল কেটে ফেলার দরুন আমাদের দেশের ছিন্নমূল ইহুদীদের মতো তারাও কোথাও বসতি করার জন্য আন্দোলন শুরু করতে চলেছে। কিন্তু হর্ন বাজিয়ে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে শহরের দিকে ছুটে চলেছে যে-সব ট্রাক তাদের আওয়াজ এই আন্দোলনের আওয়াজকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। রাত হয়েছে। শহরের কোনো শস্তা বারে রামের বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে, কোনো হোটেলে মাংস আর গরম তন্দুরী রুটি তৈরি হচ্ছে এবং কোনো জায়গায় কোনো ছুঁড়ি বিড়ি টানতে টানতে আমার জন্য অপেক্ষা করছে— এই চিন্তা কয়েক শ মাইল দূর থেকে আসা ট্রাক-ড্রাইভারদের উৎকণ্ঠিত করে দেবার এবং অ্যাকসিলারেটরের ওপর পুরো শক্তি দিয়ে পা চাপিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তার ফল এই হচ্ছে যে, প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর একটা করে ট্রাক ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ করে চলে যাচ্ছে। যাবার সময় কালভার্টের ওপর বসে থাকা মহাপুরুষ চারজন নিশ্বাস বন্ধ করে রাখছেন, তারপর ট্রাকটা চলে গেলে "আমরা বেঁচে গেলাম" ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অসম্পূর্ণ কথা শেষ করতে আরম্ভ করছেন।

এই-সব বাধা সত্ত্বেও কথাবার্তা চলছে। খান্নামাস্টার বিষণ্ণ স্বরে রুপ্পনবাবু আর রঙ্গনাথের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁর

পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে রুপ্পনবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, "এটা পড়ুন। দেখুন, আপনাদের প্রিন্সিপাল কী লিখেছে।"

রুপ্পনবাবু বললেন, "অন্ধকারে আমি পড়তে পারছি না। আপনি পড়তে পারলে পড়ে শোনান।"

খান্নামাস্টার মুখে মুখে তার সারাংশটা শোনালেন। কাগজটা মালবীয়ের চালচলন সম্বন্ধে। কাগজটাতে যা লেখা আছে তা যদি বিশ্বাস করতে হয় তা হলে মানতে হবে যে, ছাত্রদের সঙ্গে মালবীয়র প্রেম আছে এবং কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে তাঁর প্রেম একেবারে শারীরিক স্তরে পোঁছেছে। কাগজটাতে এমন কয়েকটা ঘটনার কথা লেখা আছে, যাতে মালবীয় কোনো একটা ছেলেকে শহরে নিয়ে গিয়ে তাকে সিনেমা দেখিয়েছেন, তারপর তার সঙ্গে রাত কাটিয়ে সামনের পরীক্ষায় যে-সব প্রশ্ন আসবে তা তাকে বলে দিয়ে শিবপালগঞ্জ ফিরে এসেছেন। কাগজটা কোনো সাহিত্যিক উদ্দেশ্যে লেখা হয় নি, জনসাধারণকে আসল ব্যাপারটা জানাবার জন্য লেখা হয়েছে। তাই তার বর্ণনশৈলী স্পষ্ট, সহজ আর কোথাও কোথাও নোংরা। এইরকম মাস্টারকে কলেজ থেকে কান ধরে বার করে দেবার জন্য কাগজটাতে প্রিন্সিপাল আর ম্যানেজারের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

খান্নামাস্টার কাগজটার সারাংশ শুনিয়ে রুপ্পনবাবুকে বললেন, "এর পরেও আপনি চান, আমরা চুপ করে থাকব ? প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে কিছু বলব না ?"

রুপ্পনবাবু ভাঙের ঘোরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হলে আপনাদের ইচ্ছা কী ?"

"আমাদের কাছে পুরো প্রমাণ আছে, এই কাগজ প্রিন্সিপালই

ছাপিয়েছে। আমরা তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করব।"

রঙ্গনাথ বলল, "বড়ো লজ্জার কথা।"

রুপ্পনবাবু নির্বিকারভাবে বললেন, "দেখুন, এক সময় মালবীয়-জীর বিরুদ্ধে এ রকম কথা উঠেছিল, এ তো সত্যি কথা! একটা ছেলে নিজে আমাকে বলেছে যে, মালবীয়জী তাকে সিনেমা দেখানোর কথা বলেছিলেন।"

একটা বিচিত্র আওয়াজে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল। মালবীয়জী অত্যন্ত জোরে নাক ঝাড়তে আরম্ভ করেছেন। সবার তখন খেয়াল হ'ল যে, তিনি অনেকক্ষণ থেকে চুপচাপ বসে কাঁদছেন।

খান্নামাস্টার উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "এই, এ-ই হচ্ছে ক্যারাকটার অ্যাসাসিনেশন। এইভাবে একজন ভালোমানুষের বদনাম করা হচ্ছে। আপনার কাছে সহানুভূতি আশা করেছিলাম, আর আপনিও এই ধরনের কথা বলছেন!"

রুপ্পনবাবু নির্দয়ভাবে বললেন, "আমি তো যা শুনেছি তা-ই বললাম। মাস্টাররা এই ধরনের কাজ তো করেই থাকেন। এই অভিযোগটা সত্যি হলেও তেমন নতুন নয়। কিন্তু আমি এই ধরনের কাগজ ছাপাছাপির বিরুদ্ধে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করব।"

খান্না আরও খানিকটা উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, "রুপ্পনবাবু, আপনি ঐ একই কথা আবার বলছেন—আমি এর বিরোধিতা করব। এটা মালবীয়র বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপ্যাগ্যাণ্ডা। এটা ক্যারাকটার অ্যাসাসিনেশন। একজনের বিরুদ্ধে যার যা খুশি তা-ই বলবে, এটা কী রকম কথা?"

খান্না বলে চললেন, "দেখুন, লোকে তো বদ্রী পালোয়ান সম্বন্ধেও বলতে আরম্ভ করেছে। কে জানে কী আজেবাজে বলছে। আমি তা বিশ্বাস করি নি।"

রঙ্গনাথই আগে জিজ্ঞাসা করল, "বদ্রীদাদা সম্বন্ধে কী বলছে ওরা?"

খান্না মাস্টার এদিক-ওদিক একটু ভূমিকা করে বদ্রীর প্রেমকাণ্ড শোনালেন। এই প্রেমকাণ্ড তিনি একজন ছাত্রের কাছে শুনেছেন, সে আবার আখড়ায় একজন পালোয়ানের কাছে শুনেছে, আর সেই পালোয়ান কার কাছে শুনেছে কে জানে। খান্না মাস্টার রুপ্পন আর রঙ্গনাথের কাছে যে রিপোর্ট দিলেন তাতে অন্যসব কথার মধ্যে এই কথাটাও ছিল যে, গয়াদীন মেয়ের বিয়ে না দিয়েই সাত-আট মাস পরে দাদু হতে যাচ্ছেন আর রুপ্পনবাবু উপহার হিসেবে একটা ভাইপো পাচ্ছেন।

খবরটা এমন প্রচণ্ড যে, রুপ্পনবাবু কালভার্টের ওপর থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন আর রঙ্গনাথ এই বলে কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করল যে, এটা ভাঙের প্রভাব। কিন্তু রুপ্পনবাবু যে সত্যি সত্যি বিচলিত হয়ে পড়েছেন, সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন তখন তাঁর সামনে এমন অনেক কথা ভেসে উঠল, যেগুলো আগে তাঁর নজরে পড়ে নি। তাঁর মনে পড়ল, কিছুদিন যাবৎ বদ্রীপালোন কসরৎ করার জন্য অনেক্ষণ ধরে ছাদে থাকছেন আর ঐ সময় সিঁড়ির দরজাটা ওপর থেকে বন্ধ করে দিচ্ছেন। সেদিন রাত্রে কোন্ মেয়ে রঙ্গনাথের চারপাইয়ের ওপর এসেছিল তা-ও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল।

রুপ্পনবাবু এখন সত্যি সত্যিই ভাঙের গরম অনুভব করলেন।

তিনি অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন। রঙ্গনাথ আর খান্না মাস্টার প্রিন্সিপাল আর তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যে 107 নম্বর ধারার মামলা হবে তা নিয়ে আলোচনা করছেন। খান্না মাস্টার আত্মদয়ার মহাকাব্যে একটা .নতুন অধ্যায় লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। রুপ্পনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাঁদের গভীরভাবে দেখতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, খান্না মাস্টার আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছেন আর মালবীয়জী, যিনি এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন, আসলে চুপ করে ছিলেন না, কাঁদছিলেন।

রুপ্পনবাবুর রাগ হতে লাগল। কিন্তু কার ওপর, বোঝা গেল না। এই-সব মাস্টার আর তাঁর নিজের ওপর করুণাও হতে লাগল। প্রিন্সিপালকে তিনি অনর্গল গালাগাল দিতে লাগলেন, আর রঙ্গনাথ যখন তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করল আর মাস্টারদের আগের মতো বলতে চাইল যে, এ কিছু নয়, স্রেফ ভাঙের ক্রিয়া, রুপ্পনবাবু তখন উলটে তাকেই চুপ করিয়ে দিলেন।

শহরের এক কোণে উঁচু চারদেয়ালে ঘেরা একটা লম্বা-চওড়া বাংলো আছে। বাংলোটার গড়ন দেখে মনে হয়, এটা কোনো তালুকদারের, জমিদারি উঠে যাবার পর নতুন যুগের কোনো তালুকদারকে ভাড়ায় থাকতে দেবার জন্য তৈরি করিয়েছে।

বাংলোর এক কোণের ঘরে জেলা বিদ্যালয়-নিরীক্ষকের দপ্তর। বাংলোর বাকি অংশটা তাঁর বাসস্থান। তাঁর থাকার পুরো অংশের ভাড়া সরকারই দিয়ে থাকেন— দপ্তর মনে ক'রে। দপ্তরের পুরো ভাড়া জেলা বিদ্যালয়-নিরীক্ষক তাঁর নিজের বাড়ির নামে দেন। এই ধরনের মৈত্রীপূর্ণ সমঝোতাকে ইংরেজীতে "অফিস-

কাম-রেসিডেন্স” বলে, হিন্দীতে বলে “অফিস-কাম-রেসিডেন্স-জেয়াদা”।

দপ্তর থেকে, অর্থাৎ কোণের ঘরের দরজা দিয়ে বৈদ্যজী, প্রিন্সিপালসাহেব আর রুপ্পনবাবু বেরুলেন। বাইরে থেকে কেউ দেখতে পেলে তার মনে হ’ত, তিনজন চোর বাংলোর ভেতর কোনো অলৌকিক ক্রিয়া দেখিয়ে গোসলখানার রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

কয়েক পা গিয়ে তাঁদের পা ভারী হয়ে উঠল। তাঁরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে লনের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ আর বাগানের শোভা দেখতে লাগলেন। পোর্টিকোর দিকে তাকিয়ে রুপ্পনবাবু বললেন, “ইন্সপেক্টরসাহেবের গাড়িটা একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে।”

প্রিন্সিপাল গাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, “ভাতা বোধ হয় আর বাড়ছে না।”

“হয়তো তা-ই।”— রুপ্পনবাবু চারদিকে লন, বাগান আর ইমারত দেখে বললেন, “যা-ই হোক, ঠাট আছে। সবই ফোকটের।”

ফটকে একজন চাপরাসীকে দেখা গেল। প্রিন্সিপালসাহেবকে দেখে সে এক বিশেষ রকমের মুখভঙ্গি করল। প্রিন্সিপালও অন্যরকমের মুখভঙ্গি করে মাথা নাড়লেন। চাপরাসী আর-এক রকমের মুখভঙ্গি করল। প্রিন্সিপাল এবার পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে তার হাতে দিয়ে বললেন, “ভাই, রোজ রোজ চাইবে ?”

চাপরাসী ভব্যভাবে জবাব দিল, “আপনাদের দানই তো খাই।”

রুপ্পনবাবু বললেন, “এতে সন্দেহ কী ?”

বৈদ্যজী কঠোরভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে চুপচাপ রাস্তায় চলে এলেন। তাতে রুপ্পনবাবুর প্রসন্নতায় কোনো বাধা পড়ল না। তিনি হালকা সুরে প্রিন্সিপালকে বললেন, “এমনসব ক্ষেত্রে দু

আনার বেশি দেওয়া উচিত নয়। ওতে দুটো পান হয়। ফোকটে এইটুকুই যথেষ্ট··· ।"

শহরের এই অংশটাকে ইংরেজরা সিভিল লাইন্স নাম দিয়ে তাদের উত্তরাধিকারী আর মানসপুত্রদের ছেড়ে দিয়ে গেছে। রাস্তায় লোকচলাচল খুব কম। মাঝে মাঝে এক-একটা ঝকমকে গাড়ি— তা সে সরকারী পয়সায় হোক, কি ধারের পয়সায়, কি ফোকটের— হুট্ করে চলে যাচ্ছে, আর যারা পায়ে হেঁটে পথ চলছে তারা ভাগ্য আর ভগবানের দয়ায় বেঁচে যাওয়ায় খুশি হয়ে একধারে চেপে দাঁড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে দু-একটা ঝরঝরে গাড়িও আস্তে আস্তে ঘড়্ঘড়্ করতে করতে যাচ্ছে। এগুলো আসল প্রাইভেট কার, বেশি ভাতা না পাওয়ায় রোগাপাতলা, অ্যানিমিয়া রোগগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে।

এখন বিকেল চারটে। চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী অফিসাররা উচুঁতলার অফিসারদের বাচ্চাদের সাইকেলে বসিয়ে কিড়িং কিড়িং করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলেছে। বাচ্চারা ইংরেজী স্কুলে পড়ে বাড়ি ফিরছে। সবাইকেই বাড়ি পৌঁছে কোনো-না-কোনো বড়ো খবর দিতে হবে। "তোমার মামি যদি তোমাকে আর একটা ড্রইং খাতা কিনে না দেয় তা হলে কাল তুমি পানিশ পাবে।" —এই কথাটা নিয়ে দুটো বাচ্চা তর্ক করতে করতে যাচ্ছে। একজন আছে সাইকেলের রডের ওপর আর-একজন ক্যারিয়ারে। তাদের মাঝখানে সীটের ওপর এক উর্দিহীন চাপরাসী।

বৈদ্যজী এতক্ষণ পরে কথা বললেন, তাঁর গলার স্বর বেশ গম্ভীর, "এই-সব ছেলেদের শিক্ষা দেখুন। আর আমাদের গ্রামের স্কুলের ছেলেরা! কত পার্থক্য!"

প্রিন্সিপালসাহেবের তুটো হাতই পাতলুনের পকেটে চলে গেল। ছোটো মুখে বড়ো কথা বলার প্রস্তুতি। তিনি বললেন, "ভাবছি, সামনের জুলাই থেকে আমাদের কলেজেও ছেলেদের জন্য ইউনিফর্ম চালু করে দেব।"

বৈদ্যজী বললেন, "উত্তম চিন্তা।"

রুপ্পনবাবু পরে প্রিন্সিপালসাহেবকে বললেন, "কোন্ ধরনের ইউনিফর্ম চালাবেন? এই চাপরাসীদের, না ঐ ছেলেদের?"

প্রিন্সিপালসাহেব বললেন, "রুপ্পনবাবু, আমি পুরো সোশালিস্ট। তুজনকেই এক মনে করি।"

"আমি আপনাকে নিয়ে তিনজনকেই এক মনে করি।"

সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ চলতে লাগলেন। খানিক পরে প্রিন্সিপালসাহেব বৈদ্যজীকে বললেন, "ইন্সপেক্টরসাহেবের বাড়ি থেকে পাত্রটা ফেরত এল না।"

বৈদ্যজী গম্ভীরভাবে হাঁটতে লাগলেন। একটু চিন্তা করে তিনি বললেন, "প্রায় দশ সের তো হবেই। যখন এতখানি ঘি-ই দিলেন তো পাত্রের জন্য শোক করা কেন?"

প্রিন্সিপাল হাসলেন। বললেন, "ঠিক আছে। যেতে দিন। গোরুই যখন চলে গেল তখন দড়ির জন্য কিসের আফসোস!"

"তা-ই তো।"— বৈদ্যজী আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন আর প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করলেন, "যখন হাতি দান করে দিলাম তখন অঙ্কুশ নিয়ে ঝগড়া। রাম যখন বিভীষণের রাজ্যাভিষেক করেছিলেন তখন জাম্বুবান বলেছিলেন, 'মহারাজ, সোনার একটা বাড়ি তো নিজের জন্য রাখতে পারতেন।' এর উত্তরে মর্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র বলেছিলেন, 'হে জাম্বুবান, বিক্রীতে করিণি কিমংকুশে

বিবাদঃ?' হাতি বিক্রি করে দেবার পর অঙ্কুশ নিয়ে ঝগড়া কেন?"

প্রিন্সিপালের মন থেকে যেন একটা কাঁটা উঠে গেল। কোনো শীর্ষস্থানীয় ভাগ্যবাদীর মতো মাথা নেড়ে তিনি বাহাদুরির সঙ্গে বললেন, "তা হলে ঠিক আছে। যেতে দিন। কী আছে একটা পাত্রে।"

রুপ্পনবাবু বললে, "কিন্তু নীতির দিক দিয়ে এটা ঠিক নয়। পাত্রটা তাঁর ফেরত দেওয়া উচিত ছিল। প্রত্যেকবার নতুন পাত্র কোথা থেকে আসবে?"

তারপর প্রিন্সিপালকে উদ্দেশ করে বললেন, "আপনার যদি কিছু বলতে সংকোচ হয় তো আমাকে হুকুম দিন, আমি পাত্রটা চেয়ে নিয়ে আসি।"

কিন্তু কেউ তাঁকে হুকুম দিলেন না।

তাঁরা এখন বাজারে এসে গেছেন। আজও হিন্দুস্তানের শহরে দু রকমের বাজার আছে। একটা কালো অর্থাৎ নেটিভদের বাজার, আর-একটা গোরাশাহী বাজার। এটা দ্বিতীয় রকমের বাজার। এখানে ইংরেজী সিনেমাঘর, শরাবখানা, হোটেল আর চোখ-ঝলসানো দোকান আছে। বিদ্যুতের ঝলমলে বিজ্ঞাপনও আছে। এই-সব বিজ্ঞাপনের প্রিয় বিষয় সিগারেট আর মদ। এখানে এলে মনে হয়, দেশে রুটি পাওয়া না গেলেও কেক প্রচুর পাওয়া যায়; আর জলের অভাবে তোমার গলা যদি শুকিয়ে যেতে থাকে তা হলে অনায়াসেই তুমি বিয়ার খেয়ে তরতাজা হতে পারো এবং প্রয়োজন হলে মাদকবর্জন সম্বন্ধে ভাষণও দিতে পারো।

সংক্ষেপে, এখানে এলে মনে হয়, তোমার খাওয়া-পরার কষ্ট ততক্ষণই আছে, যতক্ষণ তুমি জনতা হয়ে আছ ; আর যদি তুমি এই-সব কষ্ট থেকে রেহাই পেতে চাও তা হলে জনতাপনা ছেড়ে বড়ত্ব হাতাবার কোনো উপায় বার করো।

এক জায়গায় ফুটপাথের ওপর ধুতি-জামা-টুপি পরা চার-পাঁচজন ভদ্রলোক বেড়াতে বেড়াতে গল্প করছিলেন। তাঁরা খুবই খুশি। কখনও কখনও খুশির আধিক্যে একজন আর-একজনের পায়ের কাছে পানের লম্বা পিক ফেলছেন। রুপ্পনবাবু, যাঁর জন্ম "ইংরেজ, ভারত ছাড়ো" ধ্বনি তীব্র হয়ে ওঠার পর, অত্যন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "খোদা তাঁর গাধাদের জিলিপি খাওয়াচ্ছেন। প্রত্যেকটা ডালে পেঁচা বসে আছে।"

এই কাব্য জনসাধারণের মধ্যে খুবই প্রচলিত আর বিখ্যাত। রুপ্পনবাবু কথাটা বলে তেমন কোনো মৌলিকতা দেখাতে পারলেন না। কিন্তু যেভাবে তিনি কথাটা বললেন তাতে মনে হ'ল, তিনি গম্ভীর হয়ে পড়ছেন। প্রিন্সিপাল স্নেহভরে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বৈদ্যজীকে বললেন, "চলুন মহারাজ, কিছু খাওয়া-দাওয়া করা যাক। ছেলের মন বিগড়ে যাচ্ছে।"

সবচেয়ে আগে তিনি পানের দোকানের খোঁজ শুরু করলেন। হিন্দুস্তানীর পক্ষে এটা কোনো কঠিন কথা নয়। রবিনসন ক্রুসোর বদলে কোনো হিন্দুস্তানী যদি কোনো নির্জন দ্বীপে আটকে পড়ত তা হলে সে ফ্রাইডের জায়গায় পান তৈরি করতে পারে এমন কোনো লোককেই খুঁজে বার করত। সত্যিকারের হিন্দুস্তানীর পরিভাষা হচ্ছে, সে যে-কোনো জায়গায় পান খাবার বন্দোবস্ত করতে পারে আর প্রস্রাব করার জায়গা খুঁজে বার করতে পারে।

কিন্তু এই বাজারটাতে পানের দোকান খোঁজার দরকার হয় না। এখানে দোকানই মানুষ খোঁজে। এখানে সামনে পানের দোকান, পেছনে পানের দোকান, ডাইনে পানের দোকান, বাঁয়েও পানের দোকান। এই তিনজন সোজা তাঁদের সামনের পানের দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দোকানের বড়ো আয়নাটাতে বৈদ্যজী তাঁর মাথার পাগড়ির কোণা ঠিক করে নিলেন, রুপ্পনবাবু চোখ টিপে মুচকি হাসার চেষ্টা করলেন, আর প্রিন্সিপালসাহেব পানওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

তিনি আস্তে করে বললেন, "তিন গেলাস, একটু গাঢ় হয় যেন।"

বৈদ্যজী একটু বোকা সেজে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী? কী?"

প্রিন্সিপালসাহেব বললেন, "কিছু না। এই পানের আগে একটু পানির ব্যবস্থা করছি।"

পানওয়ালা ভাং তৈরি করে তিনটে গেলাসে ঢালল। প্রিন্সিপাল-সাহেব বললেন, "একটু বেশি করে গোলমরিচ আর বাদাম দিয়ো।"

পানওয়ালার দোকানে খুব সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান্ এক যুবকের ছবি টাঙানো রয়েছে। দেখে মনে হয়, ছবিটা এই থলথলে আর বেহুদা লোকটার দশ-পনেরো বছর আগেকার ছবি। রুপ্পনবাবু প্রিন্সিপাল সাহেবের কনুইটা স্পর্শ করে বললেন, "এখানে ধ্বংসাবশেষও নেই, যাতে বোঝা যেতে পারে, ইমারতটা খুব বড়ো ছিল।"

প্রিন্সিপালসাহেব বললেন, "অন্য কারও ছবি হবে।"

পানওয়ালা এই অপমানের কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল না। তবে তার ভাং তৈরির কাজটা বেশ জোর পেল আর পুরো কাজটা

সে পালোয়ানী ঢঙে করতে লাগল। চুরি করে ভাং বিক্রি করার অপরাধে পুলিস পাছে পানওয়ালাকে চালান করে দেয়, এই আশঙ্কায় রুপ্পনবাবু এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন।

চারদিকে ইংরেজীর বাহার। ইংরেজী বিজ্ঞাপন। ইংরেজীতেই দোকানের নাম। নোংরা কলারওয়ালা ক্লার্ক, ঝকঝকে কাপড়ওয়ালা ব্যবসায়ীর পুত্র, আওয়ারার মতো ভবঘুরে রাজনৈতিক কাবাড়ী, চোখের দৃষ্টিতেই সারা পৃথিবীকে পরাস্ত করনেওয়ালা থুতনি-উঁচু অফিসার— সবাই ইংরেজী বলছে। ইংরেজী পোশাকে লোকে চটপটে ভাবে আসছে আর চটপটেভাবে চলে যাচ্ছে। একটা ইংরেজী সিনেমার পোস্টারে একজন বিলিতি নারী— প্রায় উলঙ্গ— একটা খাটের ওপর আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে আর একজন পুরুষ তাকে চুম্বন করছে। দু-চারজন কালো-ময়লা বাচ্চা ছেলে পাশে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে দৃশ্যটা দেখছে। কাছের এক গ্র্যামোফোনের দোকানে পপ-মিউজিকের একটা রেকর্ড বাজছে আর কয়েকটা ছোকরা— হয়তো এ কথা ভুলে গিয়ে যে, তারা যে গম খেয়েছে তা তাদের দারিদ্র্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বাইরে থেকে আনা হয়েছে— উদ্ভট ভঙ্গিতে হাত-পা নাচিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে। রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের ধড় ওপরে দিয়ে আর মাথা নিচে ঝুলিয়ে পূর্ব আর পশ্চিমের সংস্কৃতির মহান্ মিলন হচ্ছে।

রুপ্পনবাবু ভাং খাবার পর গেলাসটা দোকানে ঠনাক্ করে রেখে দিলেন।

প্রিন্সিপালসাহেব খান্না সম্বন্ধে কিছু বলতে আরম্ভ করলেন। রুপ্পনবাবু তাঁর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি এই প্রিন্সিপালসাহেবকে একটু আটকান। ইনি যেন খান্না মাস্টারের

কথা এখানে না তোলেন। নইলে আমি যদি সাফ সাফ বলতে আরম্ভ করি তা হ'লে ইনি পালাবার পথ পাবেন না।"

বৈদ্যজী শান্তি আর ক্ষমার দেবদূতের মতো তাঁর পাখনা ফড়্ ফড়্ করে, অর্থাৎ গোঁফে গেলাস থেকে যে তরল পদার্থ লেগেছে তা দুদিক থেকে মুছে বললেন, "আমাকে মাঝখানে টেনো না রুপ্পন। প্রিন্সিপালসাহেবের বড়ো ক্ষোভ, তুমি আজকাল খান্নার পক্ষ হয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছ। তুমি নিজে ওঁর সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলো।"

তাঁরা রিকশা স্ট্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছিলেন। বৈদ্যজীর কথাটা শুনেই রুপ্পনবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঝোলাটা ফুটপাথের ওপরে রেখে প্রিন্সিপালসাহেবকে বললেন, "তাহলে এসো প্রিন্সিপালসাহেব প্রথমে খান্নার ব্যাপারটাই মিটিয়ে ফেলা যাক।"

প্রিন্সিপালসাহেব অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "পরে হবে।"

রুপ্পনবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, "আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দেবার মতো চিড়িমার অন্য কোথাও আছে। এই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি এখনই হবে। পরের জন্য রেখে দিলে আর কখনও হবে না।"

বৈদ্যজী একটা বটগাছের নিচে একটা শিবলিঙ্গ দেখতে পেয়েছেন। শিবলিঙ্গের ওপরে ছোটো মডেলের একটা মন্দির। শিবলিঙ্গ দেখেই বৈদ্যজী ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠলেন। এটা গোরাশাহী বাজার, এখানে লুকিয়ে ভগবানের নাম নিতে হয়— কথাটা ভুলে গিয়ে তিনি বটগাছের নিচে গিয়ে হাজির হলেন আর ভরাট গলায় শঙ্করের স্তুতি করতে লাগলেন।

আর ফুটপাথের ওপর প্রিন্সিপালসাহেব ও রুপ্পনবাবু কালকের কাজ আজ করার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বৈদ্যজী চোখ বুজলেন। তাঁর পেছনে মোটর যাওয়া-আসা করছে আর মেয়েদের ইংরেজী মেশানো আওয়াজ বাতাসে যন্ত্রণা সৃষ্টি করছে। একটা সিনেমায় এক খেলনাওয়ালী যে টিউন বাজিয়েছিল তা-ই নকল করে এক খেলনাওয়ালা কর্ণবিদারী সংগীত রচনা করছে। কিন্তু সত্যিকারের মিনিস্টার যেমন বিরোধী পক্ষের চিৎকার চেঁচামেচি আর গালিগালাজকে নিঃসার মনে করে স্বজন-পোষণের রাস্তায় সোজা চলতে থাকেন তেমনি নির্লিপ্তভাবে বৈদ্যজীও এই-সব আওয়াজ না-শোনা করে শঙ্করজীর প্রার্থনা করতে লাগলেন।

হাজার স্তোত্রের জড়িবুটি কুটেপিষে তাঁর প্রার্থনার কাপড়ে ছাঁকা যে গুঁড়ো বার হ'ল তা এইরকম :

"হে শঙ্কর, শত্রুদের মারো।"

"তুমি রুদ্র। তুমি মন্যুময়, অখিল সৃষ্টিতে সংহারক-ভাবে সন্নিবিষ্ট। গ্রামে কলেজের ম্যানেজারির নির্বাচনে রামাধীন ভিখমখেড়বী হেরেছে। ডেপুটি ডাইরেক্টর অভ এডুকেশনের ওখানে সে প্রার্থনাপত্র পাঠিয়েছে যে, এই নির্বাচন পিস্তলের জোরে হয়েছে। পুলিস ক্যাপ্টেনের ওখানেও সে অভিযোগ করেছে। তুমি ভাং আর ধুতরো খাও। হে শঙ্কর! এই-সব অফিসারদের ভ্রষ্ট বুদ্ধিতে তুমি তোমার ভাং আর ধুতরো মিশিয়ে তাকে আরও কিছুটা ভ্রষ্ট করে দাও। তাঁদের তুমি আমার পক্ষে রায় লিখতে অনুপ্রেরণা দাও। হে ভূতনাথ! রামাধীন ভিখমখেড়বীকে মারো।

"হে ত্র্যম্বক, সুগন্ধিময়, পুষ্টিবর্ধন, আমাকে তুমি মৃত্যুর সঙ্গ তেমনিভাবে ছাড়াও, যেমনভাবে দণ্ডের সাহায্যে দুধ থেকে মাখন

ছাড়ানো হয়। কিন্তু অমৃতত্ব থেকে আমার সঙ্গ ছাড়িও না। আর হে শিব, শত্রুকে তুমি দণ্ডের সাহায্যে অমৃতত্বের সঙ্গ ছাড়িয়ে মৃত্যুর অন্ধকূপে ঠেলে দাও। সেবকের বাধাকে তুমি তোমার নিজের বাধা বলে মনে করো। তুমি আমার মতো একজন সেবকের সেবক শনিচরের বাধা দূর করো। প্রধান-নির্বাচনে তার বিরুদ্ধ শত্রু নির্বাচনী ইস্তাহার তৈরি করেছে। ওতে শনিচরকে জিতিয়ে দাও। শত্রু যদি নির্বাচনী ইস্তাহার ফিরিয়ে না নেয় তা হলে তাকে মারো।

"হে উপাপতি, জগৎকারণ, পন্নগভূষণ শিব! কো-অপারেটিভের সুপারভাইজার রামস্বরূপের প্রশ্নটা উঠিয়ে শত্রুরা ইউনিয়নের চুরির কথা বলছে। তারা চেঁচাচ্ছে, ওতে আমারও হাত ছিল। কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর নীচ, ধূর্ত এবং সৎ। তাকে কাবু করা যাচ্ছে না। গতবার সে আমাকে একা পেয়ে ভয় দেখিয়ে গেছে। তুমি এই কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টরকে মারো।

"হে রুদ্র, দিবিলোকে তোমার অস্ত্র বর্ষা, অন্তরীক্ষে তোমার অস্ত্র বায়ু, ভূলোকে তোমার অস্ত্র অন্ন। শত্রুকে তুমি হয় বাজ ফেলে নয়তো ঝড় উঠিয়ে অথবা কলেরা কিংবা গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসে—যে অস্ত্রে তোমার সুবিধা সেই অস্ত্রে মারো।

"হে শিব, হে মহেশ, আমি তোমার ধ্যান করছি। তুমি পরানন্দময়, আপন তেজে তুমি নভোমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ, তুমি অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম, অনন্ত, অদ্য, নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত।

"সুতরাং হে শিষ, তুমি শত্রুদের মারো।"

বৈদ্যজী চোখ খুলে দেখলেন, এই ভৌতিক জগৎ তাঁর চোখ

বন্ধ করার আগে যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনই আছে। পার্থক্য শুধু, দশগজ দূরে রুপ্পনবাবু চিৎকার করে প্রিন্সিপালকে বলছেন, "তুমি বড়ো বীরবাহাদুর হয়েছ! আমাকে খান্নার ছেলে বলছ! আমি কোনো শালার জোটে নেই। আমি কেবল ন্যায়ের পক্ষে। কী বুঝলে প্রিন্সিপালসাহেব ?"

প্রিন্সিপালসাহেব বুড়োর মতো হেসে বললেন, "অনেক হয়েছে রুপ্পনবাবু, এখন চুপ করো।"

"এখন তো কিছুই হয় নি প্রিন্সিপালসাহেব। আমি বলে দিচ্ছি তুমি যে 107 নম্বরের মকদ্দমা চালিয়েছ, কালই সে ব্যাপারে মিটমাট হয়ে যাওয়া চাই। কালকের পরে যদি এর শুনানী পড়ে তা হলে শুনে রাখো, সব স্টুডেণ্ট 'ইনক্লাব-জিন্দাবাদ' করে নেমে পড়বে। তোমার পার্টিবাজি ওখানেই বন্ধ হয়ে যাবে।"

"রুপ্পন!"—বৈদ্যজী কাছে এসে কঠোর স্বরে ডাকলেন। কিন্তু বৈদ্যজীর উপস্থিতিতে রুপ্পনবাবুর ওপর কোনো প্রভাব পড়ল না। তিনি বললেন, "বাবা, আমি তখন বলি নি, খান্না মাস্টার আর প্রিন্সিপালসাহেবের মধ্যে যখন ঝগড়া হয় তখন আমি ওখানে ছিলাম। এবং আমিই মধ্যস্থতা করেছিলাম। 107 নম্বরের এই মকদ্দমা একেবারে মিথ্যে। খান্না মাস্টারকে ফাঁসানোর জন্য এই মকদ্দমা চালানো হয়েছে। স্টুডেণ্ট-সমাজ এটা মোটেই সাপোর্ট করবে না।"

বৈদ্যজী শান্তস্বরে বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাড়ি গিয়ে এ নিয়ে ভাবব।"

কে জানে প্রিন্সিপালসাহেবের কী হ'ল, তিনি হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ভাববেন তো মহারাজ, কিন্তু রুপ্পন এই

বাজারের মধ্যে আমার বেইজ্জতি করলেন। খান্নার ব্যাপারে ইনি আমাকে কী না বললেন! এখন কী বলব, মিসেস খান্না এঁর মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। পর্দার পেছনে কী হচ্ছে, আমি কী বলব!"

বৈদ্যজী গম্ভীরভাবে বললেন, "বলার কোনো দরকার নেই। আমি সব জানি।"

বৈদ্যজী এগুবার জন্য পা বাড়ালেন। রুপ্পনবাবু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "বাবা, এখন ব্যাপারটার এখানেই ফয়সালা হয়ে যাওয়া দরকার। বলুন, আপনি কী জানেন? বলুন, বলুন। মিসেস খান্নাকে এই-সব কথাবার্তার মধ্যে আপনি কেন টানলেন?"

বৈদ্যজী থেমে পড়লেন। তিনি নাটকীয় ভঙ্গিতে একবার প্রিন্সিপালের দিকে তাকালেন। ঐ দৃষ্টি প্রিন্সিপালকে জয় করে নিল। তারপর ঐ ভঙ্গিতেই তিনি রুপ্পনবাবুর দিকে তাকালেন। দুর্বল প্রকৃতির লোক হলে ঐ দৃষ্টিতে সে ওখানেই পড়ে যেত, কিন্তু রুপ্পনবাবু এ ব্যাপারে তাঁর বাবারও বাবা। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "বলুন, থামলেন কেন?"

বৈদ্যজী বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "আমি জানি রুপ্পন, কেন তুমি হঠাৎ তোমার গুরুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আরম্ভ করেছ আর কেন খান্না মাস্টার তোমার বন্ধু হয়েছেন। স্পষ্ট কথা এই যে, তোমার ওখানে যাওয়া-আসা করা আমার কাছে উচিত মনে হচ্ছে না।"

রুপ্পনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর গলার রুমালটা কষে বাঁধলেন। ঝোলাটা হাতে নিয়ে বললেন, "বুঝেছি। আপনি আমার ক্যারাকটার সম্বন্ধে সন্দেহ করছেন। আমি সব

বুঝতে পেরেছি।" তারপর আঙুল উঁচিয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করার মতো পোজে বললেন, "এই প্রিন্সিপালসাহেব আপনার কান ভাঙিয়েছেন। আমি জানি এর ফল ভালো হবে না।"

রুপ্পনবাবু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "আর বদ্রীদাদা? সারা গ্রামে তাঁকে নিয়ে ছি-ছি পড়ে গেছে। তিনি বেলাকে ঘরে আনছেন। তাঁকে কিছু বলার সাহস হয় না? তাঁর ক্যারাকটার সম্বন্ধে···।"

প্রিন্সিপাল বুঝতে পারলেন, এবার বজ্রপাত হবে। বৈদ্যজী তাঁর বড়োছেলের চরিত্রহীনতার কথা শুনে হয়তো অজ্ঞান হয়ে ফুটপাথের ওপর পড়ে যাবেন, তাই প্রিন্সিপাল রুপ্পনবাবুকে থামিয়ে বললেন, "কী বকছ রুপ্পনবাবু! মাথা ঠিক করো।"

তারপর বৈদ্যজীকে বললেন, "যেতে দিন মহারাজ। রুপ্পনবাবু এখনও ছেলেমানুষ। কোথাও কিছু শুনেছেন আর তা-ই বলে বেড়াচ্ছেন।"

কিন্তু প্রিন্সিপালের তরফ থেকে বৈদ্যজীকে এই ঠাণ্ডা করার বা সান্ত্বনা দেবার দরকার ছিল না। রুপ্পনবাবুর এই অভিযোগ তিনি শান্ত আর গম্ভীরভাবে সহ্য করছেন। গোঁফটা দু-একবার নড়ে ওঠা ছাড়া তাঁর মুখে কোনো "আকার-বিভ্রম" দেখা গেল না। রুপ্পনবাবু উত্তেজিতভাবে বদ্রীর প্রেমকাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি তার ইতিহাসে প্রবেশ করলেন। তারপর ব্যাপারটার তৎকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু তথ্য আর ঘটনার বিবরণ দিলেন, এবং শেষে বৈদ্যজীর সব দেখেও না দেখার ভান করার আর পক্ষপাতপূর্ণ নীতির নিন্দা করলেন। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে, বৈদ্যজী তাঁর আর বদ্রীর ব্যাপারে দু'রকম মানদণ্ড

ব্যবহার করছেন, যা গণতন্ত্রের মূল নীতির বিরোধী। কথা শেষ হতে হতে তাঁর মুখ লাল হয়ে গেল, ঠোঁট ফেনায় ভিজে গেল, এবং চোখ মিটমিট করতে লাগল।

প্রিন্সিপালসাহেব সান্ত্বনার কথা অনর্থক মনে করে আগেই চুপ করে গেছেন। বৈদ্যজীর ওপর কোনো রকম প্রতিক্রিয়া না দেখে রুপ্পনবাবুও চুপ করে গেলেন। বৈদ্যজী সমস্ত কথা শান্তভাবে শুনেছেন, যেন তা রুপ্পনবাবু অভিযোগপূর্ণ প্রলাপ নয়, গীতার সমত্বযোগের সারাংশ— ফুটপাথের ওপরে কেউ তাঁকে ভক্তিভরে শোনাচ্ছে।

রুপ্পন চুপ করে যাবার পর বৈদ্যজী প্রিন্সিপালসাহেবকে বললেন, "চলুন, স্টেশনে যাই। গাড়ির সময় হয়ে গেছে।"

রুপ্পনবাবু তাঁর বাবার এই শান্ত আচরণে অবাক্ হয়ে গেলেন। একটু ইতস্তত করে তিনি বললেন "আমি থাকছি, রাতের গাড়িতে যাব।"

তাঁর কথাটা যেন কেউ শুনেও শুনলেন না। উত্তেজনা হ্রাস করার জন্য প্রিন্সিপাল ঠাণ্ডা সুরে কিছু বলতে চাইলেন। তিনি বললেন, "বদ্রী পালোয়ানের ব্যাপারে··· ।"

বৈদ্যজী হাত দিয়ে ইশারা করে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। তারপর সরলভাবে বললেন, "কিছু বলার দরকার নেই। আমি স্থির করে ফেলেছি।"

রুপ্পনবাবু ঔৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কিন্তু উদাসীনতা দেখাবার জন্য কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার চলাচল দেখতে লাগলেন। বৈদ্যজী বেশ জোর গলায়, যাতে যাদের আগ্রহ নেই তারাও শুনতে পারে, এমনভাবে বললেন, "আমি অতখানি প্রাচীনপন্থী নই

গান্ধীজী অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে ছিলেন। আমিও আছি। বদ্রী আর বেলার বিবাহ সমস্ত দিক দিয়ে আদর্শ বলে স্বীকার করা হবে। কিন্তু জানি না, গয়াদীনের কী ইচ্ছে। পরে দেখব।”

কথাটা বলে বৈদ্যজী রুপ্পনবাবুর দিকে তাকালেন। রুপ্পনবাবুর তাঁর চোখের দিকে তাকাবার সাহস হ’ল না। অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, “আমি যাচ্ছি।”

চব্বিশ

দুপুর গড়িয়ে পড়ছে। বারান্দায় বৈদ্যজী আর বদ্রীপালোয়ন ছাড়া আর কেউ নেই। এটা বাড়ির পুরুষমহল, এখানে নারীরা খুব কমই আসে।

একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। রুপ্পনবাবু বারান্দার সঙ্গে লাগানো একটা ঘরে চুপচাপ শুয়ে আছেন। আজ কলেজ ছুটি, তা ছাড়া কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি জেগেছিলেন। তাই অনেকক্ষণ ঘুমিয়েও তিনি আবার ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় তাঁর বাবার শাস্ত্রীয় স্বর কানে এল, “আমি জানতাম না, তুমি এত নীচ।”

যে কানে এমন কথা প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা সোজা খাড়া হয়ে না যায় সে কান কুকুরের লেজেরও অধম। রুপ্পনবাবু কান খাড়া

করলেন এবং আস্তে করে উঁকি মেরে দেখলেন, বৈদ্যজী পায়ের ওপর পা রেখে বসে আছেন আর বদ্রীপালোয়ান কাছেই চবুতরার ওপর ভর দিয়ে বসে আছেন। কোনো রকম ঘোষণা ছাড়াই, সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর পরিবেশে দুজনের মধ্যে লড়াই চলছে। আবহাওয়া এমন ঘরোয়া যে, রুপ্পনবাবু যদি বৈদ্যজীর কথাটা শুনতে না পেতেন তা হলে তাঁর মনে হ'ত, তাঁর বড়ো ভাই আর বাবা নির্জনে "কো-অপারেটিভ ইউনিয়নে এক নতুন চুরির তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা"-র মতো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করছেন।

যা-ই হোক, রুপ্পনবাবু কথাটা শুনতে পেলেন এবং ঐ একই নিশ্বাসে বৈদ্যজীর মুখ থেকে আর-একটা কথা শুনতে পেলেন, "তুমি মূর্খ।...আমি এটা কল্পনাও করতে পারি নি।"

বদ্রীপালোয়ান একটা হাই তুলে নির্বিকারভাবে বললেন, "বাড়িতে গালিগালাজ করে কী লাভ? এটা ভালো, নয়।"

এই কথাটা বোধহয় বৈদ্যজীর ওপর একটা অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করল। তিনি সোহ্‌রাব মোদীর মতো বাচনভঙ্গি বদলে ফেললেন। সাধারণ কথাবার্তার ভঙ্গিতে বললেন, "আর তুমি যা করেছ, ভালো করেছ? এর পরিণাম কী, তুমি জানো? এতে আমার মনে কতখানি কষ্ট হয়েছে, তুমি বুঝতে পারো?"

বদ্রীপালোয়ান বোধহয় আজ সকালে ভাং খান নি। এটা একটা ভৌতিক সিদ্ধান্ত যে, যাঁরা ভাং খান না তাঁরা ভাং খেলে হাই তোলেন আর যাঁরা ভাং খান তাঁরা ভাং না খেলে হাই তোলেন। তাই বদ্রীপালোয়ানের মুখে হাইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ফুটে উঠল। তিনি তাঁর কাঁধের মশাটাকে অন্য হাত দিয়ে মোলায়েম করে একটা চড় মেরে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু মশাটা এমন যে, পালাতে পারল না,

মরে গেল। এরপর তিনি বৈদ্যজীর কথার জবাব দিলেন, “কষ্ট কিসের? বলো, কিছু অসুবিধা হলে দূর করা যাবে।”

বৈদ্যজী গলার স্বর নিচু করে বললেন, “তুমি এত বুদ্ধিমান হয়ে গয়াদীনের মেয়ের সঙ্গে কীভাবে ফেঁসে গেলে?”

বদ্রীপালোয়ান কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন, “আপনার সঙ্গে কথা বলা অনর্থক।”

কথাটা বলেই তিনি খুঁটি থেকে ঝোলানো জামাটা নামিয়ে কাঁধের ওপর ফেলে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। বৈদ্যজী বললেন, “পালাচ্ছ কোথায়?”

“কে পালাচ্ছে? কথার কোনো মানে থাকলে বলা যায়। বাড়ির মধ্যে অর্থহীন কথা হতে আরম্ভ করল তো ব্যস, হয়ে গেল।”

বৈদ্যজী তাঁর কণ্ঠস্বরের গিয়ার বদলে বললেন, “কিন্তু কথাটা তো কখনও-না-কখনও বলতেই হবে।”

বদ্রীপালোয়ান তাঁর পায়ের ব্রেক কষলেন। দূর থেকেই তিনি বললেন, “এখন তোমার মুখ থেকে উলটোপালটা কথা বেরুচ্ছে। এটা ঠিক নয়। পরে কথা বলব।”

“পরে কখন? যখন আমার নাক কাটা পড়বে?”

বদ্রীপালোয়ান বাধ্য হয়ে ফিরলেন। কাঁধের ওপর জামাটা রেখেই তিনি আবার চবুতরার ওপর হাতে ভর দিয়ে বসে পড়লেন। তারপর বললেন, “নাক-টাকের কথা বোলো না। নাক আছে কোথায়? সে তো পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদের সময়েই কাটা পড়েছে।”

বৈদ্যজী বললেন, “এখন তুমি নীচতার কথা বলছ।”

বদ্রীপালোয়ানের কণ্ঠস্বরের সাইলেন্সার ভেঙে গেল। কঠোর স্বরে তিনি বললেন, “বলছি যখন, তখন বলতেই দাও। তুমি বলছ,

আমি বেলার সঙ্গে ফেঁসে গেছি। তুমি আমার বাবা, তোমাকে আমি কী করে বোঝাব। ফাঁসা আর ফাঁসানো চিড়িমারদের কাজ। তোমার বংশে তোমার বাবা অযোধ্যাপ্রসাদ যেমন রঘুবীরের মায়ের সঙ্গে ফেঁসে গিয়েছিলেন। তাকেই ফাঁসা বলে। হ্যাঁ। নয়তো কী!"— একটু থেমে তিনি জোরে বলে উঠলেন, "যাক গে, এ-সব কথা এখন বন্ধ করো।"

বৈদ্যজীও তাঁর কণ্ঠস্বরের অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলেন। বললেন, "তোমার বংশ! তোমার বাপ! তুমি এইরকম ভাষা ব্যবহার করছ! এই বংশ কেবল আমার? তোমার নয়? এই-সব পূর্বপুরুষরা তোমরাও পূর্বপুরুষ নয়?"

বদ্রীর গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল, যেন রাস্তার চৌমাথায় লাল আলো জ্বলে উঠেছে। একটু থমকে বদ্রী বললেন, "তা-ই হ'ল তো? একটা সত্যি কথা বললাম আর অমনি তাতে চটে গেলে। যাক গে, যেতে দাও।"

বৈদ্যজী বললেন— যেন কোনো শিক্ষানবিস ক্লাচ আর অ্যাকসিলারেটারে একসঙ্গে চাপ দিয়ে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করছেন—"না বদ্রী, যেতে দেব না। কথাটা আজ শেষ করতে হবে। আমরা ব্রাহ্মণ আর ওরা বৈশ্য। এটা কেবল জাতের কথা নয়, নীতির কথা। এমন চরিত্রের মেয়েকে···। ছোটে আদালতে কী বলেছিল?"

বদ্রীপালোয়ান উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "ব্যস, আর কথা নয়! একটা কথা বলার পর আমার কথাও বন্ধ। আমি বাবা অযোধ্যাপ্রসাদের চাল চালতে পারি না। যা করব, নিয়মমাফিক করব। এদিক-ওদিক গিচির-পিচির আমার পছন্দ নয়।"

বদ্রীপালোয়ান দরজার দিকে পা বাড়ালেন। বৈদ্যজীও হঠাৎ চারপাই থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং বিনা জটা-জূট, গোঁফ-দাড়ি, কমণ্ডলু-কৌপীন অভিশাপ দেবার ভঙ্গিতে, দ্বিগুণ শক্তিওয়ালা হর্ন বাজিয়ে বললেন, "নীচ! তা হলে আমার কথাটাও শোন্… ।"

রুপ্পনবাবু অবাক হয়ে এই বাক্যালাপ শুনছিলেন। কাল শহরে বৈদ্যজীর কথা শুনে তার মনে হয়েছিল, বদ্রীর সঙ্গে বেলার বিয়েতে তাঁর মত আছে, এবং যদি কোনো বাধা পড়ে তো তা গয়াদীনের তরফ থেকেই পড়বে। সেই বাধাটা দূর করাও যাবে। কিন্তু এখন এই-সব কথাবার্তা শুনে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যেটাকে তিনি সংঘর্ষের শেষ মনে করেছিলেন, আসলে সেটা আরম্ভ।

নিজেকে তিনি সংবরণ করতে পারলেন না, কোমর দোলাতে দোলাতে বাইরে এসে শান্তিদূতের ভূমিকা নিয়ে বললেন, "বাবা, এখন আর শোনা-কওয়ার কিছু নেই। কাল প্রিন্সিপালের কাছে যা বলেছিলেন, এখন তা-ই বলুন। এখন থেকে তা-ই আউড়ে যান। এখন আমরাও বলতে আরম্ভ করব যে, আমরা জাতিভেদ-প্রথা মানি না। বদ্রী দাদা যখন বেলার সঙ্গে ফেঁসেই গেছেন তখন… ।"

রুপ্পনের কথাটা শেষ হতে পারল না: তাঁর মনে হ'ল, ঘাড়টা ভেঙে গেছে। বদ্রীপালোয়ান রোজই কারও-না-কারও ঘাড়ে হাত দিয়েই থাকেন, আজ রুপ্পনের ঘাড়টা ধরেছেন। কিন্তু রুপ্পনের চোখ দুটো এক সেকেণ্ডের মধ্যে উঠোনে দশটা চক্কর লাগিয়ে আত্মলীন হয়ে গেছে। বদ্রী দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "তুই বাড়ির মধ্যেই নেতাগিরি করবি! আমার সম্বন্ধে বলছিস, আমি ওর

সঙ্গে ফেঁসে গেছি! আর তা-ও আমার মুখের ওপর! জানোয়ার কোথাকার!"

বদ্রী রুপ্পনের ঘাড়টায় প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তাঁকে নির্মমভাবে উঠোনের অপর প্রান্তে ঠেলে দিলেন। রুপ্পনবাবু হতচকিত হয়ে এটুকুও স্থির করতে পারলেন না যে, এইভাবে তিনি যে "জানোয়ার" খেতাবটা পেলেন সেটা রাখবেন, না ফেরত দিয়ে দেবেন। ওদিকে বদ্রীপালোয়ান বৈদ্যজীকে বলে চলেছেন, "একেই বলে সাক্ষাৎ নেতা! রুপ্পন নিজেই ওকে দু'পাতার এক চিঠি পাঠিয়েছিল। কে জানে তাতে কী-সব গোলমেলে কথা ছিল। ও নিজে ফেঁসেছিল আর বলছে কিনা আমি ফেঁসেছি।"

রুপ্পনবাবু পড়তে পড়তে সামলে নিলেন। বেঁকে গিয়ে বললেন, "আমি এতখানি নীচ নই যে, এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব।" তারপর বৈদ্যজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাবা, এখন এঁকে কিছু বলা অনর্থক। যা করতে চান, করতে দিন।"

কিন্তু বৈদ্যজী উপদেশ নেবার জন্য নয়, দেবার জন্য উদ্যত হয়ে আছেন। তিনি কড়া স্বরে বললেন, "যা-ই হোক রুপ্পন, এটা তোমার বলার বিষয় নয়। তোমাদের সবার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে। তোমার চরিত্রের খবরও আমি রাখি।"

রুপ্পন রেগে উঠলেন, "এই কথা!" ঘাড়টা উঁচু করে, বুক চিতিয়ে তিনি জবাব দিলেন, "তা হলে আমিও আপনার চরিত্রের খবর রাখি।"

লড়াইয়ের এটা শেষ দৃশ্য। বদ্রী পালোয়ান ব্যঙ্গ করে তাঁর বাবাকে বললেন, "শুনলে?"

রুপ্পনবাবু ঝট করে বাইরে চলে গেলেন। বৈদ্যজী চারপাইয়ের

ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। সিনেমার হিরোর বাবার মতো এইরকম পরিস্থিতিতে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন না। নিজের ভ্রষ্টাচারের অভিযোগের ওপর কমিশন বসার আভাস পেয়ে বড়ো বড়ো নেতাদের মতো তিনি বললেন না যে, প্রথমে ভ্রষ্টাচারের এক সর্বমান্য সংজ্ঞা স্থির করা দরকার। আপন রচনার খারাপ সমালোচনা পড়ে টেক্সট-বুক কমিটির কৃপায় লাখপতি হওয়া সাহিত্যিকের মতো অবজ্ঞার হাসিও তিনি হাসলেন না। নিজের চরিত্রের বিরুদ্ধে এত বড়ো একটা চ্যালেঞ্জ শুনেও তিনি এ-সবের কিছু করলেন না। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর পেশায় যেটা সবচেয়ে সহজ কাজ তা-ও তিনি করলেন না, মুখ দিয়ে "হে রাম" পর্যন্ত বার করলেন না।

দুপুর গড়িয়ে পড়ছে। একটা হালুইয়ের দোকানে একজন হালুইকর বসে আছে, দূর থেকেই তাকে হালুইকর বলে মনে হচ্ছে। দোকানের নিচে একজন নেতা দাঁড়িয়ে আছে, দূর থেকেই তাকে নেতা বলে চেনা যাচ্ছে। ওখানেই সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে পুলিসের একজন সেপাই দাঁড়িয়ে আছে, দূর থেকেই তাকে পুলিসের সেপাই বলে বোঝা যাচ্ছে। দোকানে মিঠাইগুলো বাসি আর ভেজাল জিনিস দিয়ে তৈরি বলে মনে হচ্ছে, আসলেও তা-ই। দুধ মনে হচ্ছে জল মেশানো আর অ্যারারুট দিয়ে ঘন করা, আসলেও তা-ই। পৃথিবীতে স্বর্গের এ এমন একটা অংশ, যেখানে সমস্ত সত্য চোখের সামনে রয়েছে। কোথাও কিছু লুকোনো নেই, তার দরকারও নেই।

দোকানে জিলিপি, পেড়া আর গট্টা রয়েছে। এরই পাশে কাঁচের

ছোটো ছোটো পাত্রে গোটা কয়েক রুক্ষ-সুক্ষ কাঠের টুকরোর মতো বিস্কুট, কেক ইত্যাদি নামে কিছু স্থানীয় পদার্থ রয়েছে। শহরের মতো এখানেও এই-সব পদার্থ বলে দিচ্ছে, প্রাচ্য প্রাচ্যই আর পাশ্চাত্ত্য পাশ্চাত্ত্যই, মিঠাইয়ের মারফৎ শিবপালগঞ্জে এই দুইয়ের মিলন ঘটেছে।

এখানেই ল্যাংড়ার সঙ্গে রুপ্পনবাবুর দেখা হয়ে গেল। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী বিনা টিকিটের থার্ড ক্লাসের যাত্রীকে যেমনভাবে দেখে, রুপ্পনবাবুও অনেকটা তেমনিভাবে ল্যাংড়াকে দেখছেন। কিন্তু রুপ্পনবাবু আজ এমন উদাসীনতার জগতে রয়েছেন যেখানে বিশ্ব-মৈত্রী প্রভৃতি পঞ্চশীলের সমস্ত নীতি অনায়াসে কার্যকর করা যায়। তাই তিনি নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সেই ব্যাপারটার কী হচ্ছে?"

"আজ তো ছুটি, বাবু। খোঁজ পাই নি। অমনিতে নকল তো এখন বোধ হয় তৈরিই হয়ে গেছে।"— ল্যাংড়া আগের কাহিনী বলতে শুরু করল, "তৈরি তো তখনই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিতে যেতে পারি নি। আমার মেয়াদি জ্বর হয়েছিল। সেদিন যে সদরের কাছারিতে পড়ে গিয়েছিলাম, আর উঠতে পারি নি। তারপর ভাবলাম, মরতে যদি হয় তো নিজের গ্রামেই মরব। ওদিককারই একজন ঠাকুর ওখানে এসেছিলেন, তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। সেখানে লোকেরা বলল, ওটা মেয়াদী জ্বর।··· কিন্তু পরে একদিন কয়েকজন লোক মোটরে করে গ্রামে এল। সারা গ্রামের দেয়ালে দেয়ালে গেরুয়া রঙ দিয়ে ইংরেজীতে কী-সব লিখল। তারপর বাবু, তারা আমার গা থেকে রক্ত বার করে যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেখল। এখন দেখো তো বাবু, এই কলিযুগের

কী অবাক্ কাণ্ড, মানুষ হলাম আমি দেশী আর অসুখ হ'ল বিলিতি। মোটরে যারা এসেছিল তারা বলল, ল্যাংড়া বড়ো মানুষ, তার ম্যালেরিয়া হয়েছে।···কী বলব বাবু, তারপরেই মোটরওয়ালারা গ্রামে একটা বড়ো কাজ করল। দু-তিন জন করে লোক এক-একটা যন্ত্র নিয়ে চারদিকে কুয়ো-পুকুর, খানা-ডোবা সব জায়গায় কির্‌র্ কির্‌র্ করতে করতে ঘুরল। দু'জন লোক প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে গিয়ে গেরুয়া রঙ দিয়ে ইংরেজী অক্ষরে ম্যালেরিয়া মহারাণীর স্মৃতি লিখল। ঐ-সব অক্ষরের এমন প্রতাপ বাবু যে, সমস্ত মশা পালিয়ে গেল। আমিও বাবু, মাসখানেকক দুঃখ ভোগ করে আপনার দর্শন পাবার জন্য আবার উঠে দাঁড়িয়েছি।"

নেতা বলল, "কী কথাই তুমি শোনালে ল্যাড়ু

"লিখে দেখ অংরেজী অচ্ছর
ভাগে মলেরিয়া কে মচ্ছর।"

হালুইকর নেতার তারিফ করে বলল, "আপনিও কী কবিতা শোনালেন! আসুন, এরই ওপর জিলিপি খান।"

কোনো রকম সংকোচ না করে নেতা মাছি তাড়িয়ে থালা থেকে চার-পাঁচটা জিলিপি তুলে নিয়ে খেতে শুরু করে দিল। ওদিকে সেপাই ল্যাংড়াকে বলল, "তা হলে বলো যে, মরতে মরতে বেঁচে গেছ।"

"সে তো ঠিক কথা বাবু, কিন্তু আমি জানতাম যে, আমি মরব না। ভগবানের দরবারে এমন অবিচার হতে পারে না। যতদিন না তহসিল থেকে নকল পাচ্ছি ততদিন আমি মরতে পারি না।"

ল্যাংড়ার গলার স্বরে না-জানি কত কবীর, তুলসী, রুইদাস এসে

সুর ভরতে লাগলেন। ল্যাংড়া বলল, "নকলটা না দেখে আমার প্রাণ বেরুতে পারে না। আমি সত্যের লড়াই লড়ছি।"

সেপাই বলল, "তুমি শালা একটা গাড়ল। দুটো টাকার জন্য জীবনটা বরবাদ করে দিলে! ফেলে দিচ্ছ না কেন দুটো টাকা?"

ল্যাংড়া মাথা নেড়ে বলল, "সে তুমি বুঝবে না বাবু। এ সত্যের লড়াই।"

রুপ্পনবাবু কথাটা বদলে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হলে এখন হচ্ছেটা কী।"

ল্যাংড়া বলল, "কাল-পরশুর মধ্যে পেয়েই যাব। এখন থেকেই তহসিলে গিয়ে ধর্না দেব।"

নেতা বলল, "ওখানেই একটা ঘর তুলে নাও, দৌড়োদৌড়ি বেঁচে যাবে।" রুপ্পনবাবু বেঞ্চের ওপর বসে কিছুক্ষণ তাঁর পায়ের ডিম দুটো নাচালেন। তারপর হালুইকরকে বললেন, "এক ভাঁড় দুধ বার করো।" একটু চিন্তা করে আবার বললেন, "এক ভাঁড় ল্যাংড়াকেও দাও।"

ল্যাংড়ার সঙ্গে দুধ খেয়ে রুপ্পনবাবু যে-ই উঠতে যাচ্ছেন অমনি নেতা বলল, "তা হলে কীভাবে থাকবে ল্যাংড়ু? ওখানে তহসিলের সামনে একটা ঘর তুলে দেওয়া যাক!"

ল্যাংড়া একটা বৈষ্ণব-হাসি হেসে বোঝাল যে, নেতা একটা বেকুব আর সে নিজে খুব নম্র।

নেতা বলল, "কয়েকদিন পরে অনশন ধর্মঘট শুরু করে দিয়ো। ভালো হবে। খবরের কাগজে নাম ছাপা হবে। নকল পাওয়া যাক আর না-ই যাক, নাম হবে। ভেবে দেখো ল্যাংড়ু।"

রুপ্পনবাবুর মনের যে অবস্থা তাতে নেতার এই ঠাট্টা তাঁর খারাপ

লাগল। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হ'ল, লোকটা ল্যাংড়াকে ঠাট্টা করছে। আর আমরাও তাকে ল্যাংড়া বলি, এটা কী? ওর আসল নাম কী?

এ কথা ভাবতেই তাঁর ভাবনার দরজা খুলে গেল। হঠাৎ তাঁর কতকগুলো নাম পড়ল। ল্যাংড়াকে এখানে লোকে ল্যাংড়া বলে। তাঁদের বাড়িতে একজন অন্ধ আসত, লোকে তাকে 'সুরে' বলত। কুস্তি করার সময় একজনের কান ফেটে গিয়েছিল, তার নাম দাঁড়িয়েছে "ফাট্টা।" বৈদ্যজীর রুগীদের মধ্যে একজন কাণা ছিল, বৈদ্যজী তাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করতেন, "বলো শুক্রাচার্য, কী খবর তোমার।" এক বুড়ো ছিল, লোকে তাকে "কালাবাবা" বলে সম্মান দেখাত। একজনের মুখে বসন্তের দাগ ছিল, শিবপালগঞ্জের সবাই তাকে "মৌচাকপ্রসাদ" বলে ডাকত আর মৌচাকের প্রতি ইঙ্গিত করত। যার হাতে ছ'টা আঙুল তার নাম তো ছ-আঙুলরাম হবেই।

বিকলাঙ্গ আর অঙ্গহীনদের প্রতি এই আমাদের ভালোবাসা! রুপ্পনবাবু ঠিক করলেন, লোকটা যদি আবার ল্যাংড়ু বলে তা হলে তিনি তাকে জুতাপেটা করবেন। তিনি রেগে গিয়ে বললেন, "তুমি একে ল্যাংড়ু বলছ কেন? আসল নাম ধরে ডাকছ না কেন?"

নেতা ল্যাংড়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার আসল নাম কী?"

ল্যাংড়া জবাব দিল, "এখন তো সবাই ল্যাংড়া বলেই ডাকে, বাবু।" তারপর একটু চিন্তা করে বলল, "অমনিতে মা-বাবার দেওয়া আসল নাম ল্যাংড়াপ্রসাদ।"

সমস্ত যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত জায়গাতেই কিছু-না-

কিছু গোলমাল আছে। চেনা-জানা সবাই চোর। রাস্তায় কেবল কুকুর, বেড়াল আর শূওর ঘুরে বেড়ায়। কেবল ধুলো উড়ানোর জন্যই বাতাস বয়। আকাশের কোনো রঙ নেই, তার নীল রঙ মিথ্যে। বেকুবরা বেকুব বানাবার জন্য বেকুবির সাহায্যে বেকুবদের বিরুদ্ধে বেকুবি করে। ঘাবড়ানোর, তাড়াতাড়িতে আত্মহত্যা করার দরকার নেই। বেইমান আর বেইমানি সব দিক থেকে সুরক্ষিত আছে। আজকের দিনটা আটচল্লিশ ঘণ্টার। .

রুপ্পনবাবু একটা ঘন আমবাগানের ধার দিয়ে চলেছেন। চৈত্র মাস। ফসল প্রায় সব কাটা হয়ে গেছে। বাগানে কাটা ফসল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। খালি ক্ষেতে শ'য়ে শ'য়ে গোরু আর মোষ নিশ্চিন্তে ঘুরছে আর পাশের যে-সব ক্ষেতের ফসল এখনও কাটা হয় নি সেইসব ক্ষেতে গিয়ে আরাম করে চরছে। রাখালেরা বাগানে কাটা ফসলের গাদার পেছনে লুকিয়ে— কয়েকজন না লুকিয়েই— মাটিতে নির্বিবাদে বসে জুয়া খেলছে। কড়ি দিয়ে জুয়া খেলা চলছে, আর সবাই ভাবছে, এই পৃথিবীতে এসে যত পারো লুটে নাও, কারণ অন্তিমকালে যখন প্রাণপাখি উড়ে যাবে তখন পস্তাতে হবে। এই খেলায় যারা লুণ্ঠিত হয়েছে তারা প্রাণপাখি ওড়ার অপেক্ষায় না থেকে এখনই পস্তাতে শুরু করেছে আর জুয়াড়ীদের গোল থেকে কিছু দূরে সরে বসে চরস খাচ্ছে। রাখালদের মধ্যে মাত্র দু-তিন জনই সিনিয়র। বাকি সবাই কাঁচা বয়েসের, সার্বজনিক সভায় যাদের দেশের ভবিষ্যৎ গান্ধী, নেহরু, রবীন্দ্রনাথ আর সি. ভি. রামন্ বলা হয়ে থাকে।

জুয়াড়ীদের আড্ডা বেশ ভালো জমেছে দেখে রুপ্পনবাবু জোর কদমে ওদিকেই এগুলেন। কিন্তু আজ তাঁর মনের যে অবস্থা

তাতে গোচারণলীলার এই দৃশ্য, যেখানে পশুরা দুর্বল চাষীদের ক্ষেত চরছে আর রাখালেরা পশুরা ঠিক জায়গায় আছে মনে করে দত্ত-চিত্ত হয়ে জুয়া খেলছে, খুব চিত্তাকর্ষক মনে হ'ল না। তাঁকে দেখে জুয়াড়ীরা সবাই যখন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উঠে দাঁড়াল তখন স্কুল মাস্টারের কায়দায় তিনি বললেন, "বোসো বোসো। নিজেদের কাজ করো।"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তিনি জুয়ার প্রগতি নিরীক্ষণ করলেন। এগারো বছরের একটি ছেলে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে মুখ থেকে চরসের ধোঁয়া বার করতে লাগল। এতক্ষণ ধরে বার করতে লাগল যে, রুপ্পনবাবুর মনে হ'ল, ও আর শেষ হবে না। তিনি এগুলেন। জুয়াড়ীবৃন্দ পেছন থেকে কোরাস গেয়ে তাঁকে প্রণাম জানাল। আশীর্বাদ করার জন্য তিনি একবার ঘুরেও তাকালেন না, এগিয়ে চললেন। খানিকটা দূর গিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "এই হারামিরা, এই ফসল চরিয়ে দিচ্ছিস কেন? এগুলো কার গোরুমোষ?

"আমার নয়।"

"আমার নয়।"

"আমারও নয়।"

"আমার গুলো তো ওদিকে— ঐ।"

"কে জানে কার।"

ফসল চরা গোরুমোষ সম্বন্ধে এই জবাব শুনে রুপ্পনবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। চিৎকার করে বললেন, "জুতোপেটা করব।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রাখালরা তাদের গোরুমোষ তো সরালই না, বরং ভাবল, রুপ্পনভাইয়ের মাথা আজ বেজায় গরম। রুপ্পন

তত্‌ক্ষণে আর-একবার চিৎকার করে তাঁর আগের কথাটাই বললেন, "শুনতে পাস নি? আমি বললাম, জুতোপেটা করব।"

এ কথা শুনে একজন রাখাল বলল, "আমার গোরুমোষ নয়, তবু সরিয়ে দিচ্ছি।"

জানোয়ারগুলোকে সে তাড়িয়ে আর-একটা নতুন ক্ষেতে তাদের চরার সুযোগ করে দিতে গেল।

রুপ্পনবাবু একটা গলি দিয়ে চলেছেন। গলিটার বিশেষত্ব এই যে, এটা কোনো বহুমুখী পরিকল্পনার আকারে তৈরি না হলেও আপনা থেকেই আমাদের বহুমুখী পরিকল্পনার অঙ্গ হয়ে গেছে। এটা গলি, সেইসঙ্গে সহস্র ধারায় প্রবহমান একটা নালা, নালার জঞ্জাল পচিয়ে সারের রূপ দেবার একটা ডিপো, এবং আশেপাশে গ্রাম-সভার কোনো আলো না থাকায় অন্ধকারের মধ্যে প্রেমাতুর যুগলদের সামুদায়িক মিলনকেন্দ্র। সংক্ষেপে, সরল হলেও গ্রামসংস্কারের এ একটা খাসা পরিকল্পনা।

রুপ্পনবাবু নাক না কুঁচকেই গলির অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপরেই একটা মাঠ, তারপর তহসিল আর থানার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। এ-সবের কিছু আগে দেখা যাচ্ছে ছঙ্গামল বিদ্যালয় ইণ্টার কলেজের কুড়েঘর। শান্তিনিকেতনের নাম শোনার পর থেকে বৈদ্যজী আর এই কুড়েঘর তুলে দিতে চাইছেন না।

গলির মোড়ে একটা লোক একজন বুড়ীর কাছ থেকে মুর্গি কিনছিল। বুড়ী বলছে, "আমি পাঠানবাবার কবরে মানত করে-ছিলাম, এই মুর্গি তো আমি তাঁর জন্যই পেলেছি।"

মুর্গির খরিদ্দার সত্যিই মুর্গিটার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে এবং

সেটা কেনার জন্য সমস্ত রকম অশান্তি সহ্য করতে প্রস্তুত আছে। বুড়ীকে সে বোঝাতে শুরু করল, পাঠানবাবার তো একটা মুর্গি দরকার, তা সে এই মুর্গি হোক কি অন্য মুর্গি। সে আরও বোঝাল, মুর্গি বিক্রি করার দুটো নিয়ম আছে— একটা সোজা নিয়ম, আর-একটা লাথি খাবার নিয়ম। বুড়ীকে সে ভালোমানুষের মতো যে-কোনো একটা নিয়ম বেছে নেবার অধিকার দিল। সে এ-ও বলল, "আমি মুর্গি কিনবই, তার জন্য কিছু দামও দেব।"

রুপ্পনবাবু চলতে চলতেই লোকটাকে বললেন, "কোনো হাকিম আসছে নাকি?"

লোকটা উত্তরে কাকে যেন দশ-বিশটা গালাগাল দিল। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিল যে, সে সকাল থেকেই মুর্গি খুঁজছে। কিন্তু শিবপালগঞ্জ একটা বাজে জায়গা; এখানে লোকে যখন কথা বলে তখন মনে হয়, চারদিকে কেবল মুর্গি আর মুর্গি, কিন্তু কিনতে গিয়ে দেখো সব খাঁচার মধ্যে ঢুকে গেছে।

রুপ্পনবাবু বুঝলেন, শহর থেকে হাকিম আসছে। হাঁটতে হাঁটতে তিনি আস্তে করে বললেন, "মুর্গি তো ঠিক হয়ে গেল, কিন্তু ওর কি হবে?"

"কার?"

রুপ্পনবাবু একটা ইশারা করলেন, কিন্তু লোকটার কাছে তা সম্পূর্ণ অমূর্ত কলা। সে বুঝতে পারল না। ঘাড় বেঁকিয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করল,

"কার?"

রুপ্পনবাবু বললেন, "রামচন্দরের মেয়েটা তো শশুরবাড়ি চলে গেছে। এখন কী করবে?"

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা রুপ্পনবাবুকে বাধা দিল "রাম রাম, এ আপনি কী বলছেন পণ্ডিতজী?"

থানার বাইরে কানে পৈতে চড়িয়ে, বেনিয়ান ও আণ্ডারওয়্যার পরে স্বাস্থ্যবান্ সেপাই। গাছের নিচে কুকুরের মতো পড়ে থাকা চৌকিদার। ভাঙা ভাঁড়, নোংরা পাতা, ধোঁয়া-বেরুনো কুপিওয়ালা মিঠাই আর চায়ের দোকান। কাদা লেগে থাকা টেবিল। রাস্তায় নেশাবাজ ড্রাইভারের হাতে চলমান হত্যাভিলাষী ট্রাক। সাইকেলের ক্যারিয়ারের ওপর ঘাসের মতো কাগজপত্র বোঝাই করে চলা উস্কুলি আমিন। তহসিলদারের কেউকেটা আরদালী। মদ খেয়ে নাপিতের দোকানে অকারণে কলহরত পণ্ডিত রামধরের বল্গাহীন ছেলে, তার চেয়েও বেশি মদ খেয়ে যাকে এখানকার পোস্টম্যান সপ্তাহে সাতবার জুতোপেটা করে। একে অপরের কোমরে হাত দিয়ে কোরাস গাইতে গাইতে কলেজের দিকে আসতে থাকা ছাত্রদল।···

পঁচিশ

বৈদ্যজীর বৈঠকখানা থেকে প্রায় এক শ গজ দূরে ছোটোখাটো একটা মাঠ আছে। এই মাঠে একটা নিমগাছ আছে। গাছের

ওপর শুয়ে শুয়ে তোতা টেঁ টেঁ করছে আর গাছের নিচে শুয়ে শুয়ে কুকুর দৌড়োদৌড়ি করে খেলছে।

কিছুদিন হ'ল প্রাইমারি স্কুলের একজন উৎসাহী অধ্যাপক এখানে কয়েকজন ছেলেকে একত্র করে ড্রিল করাতে আর কাবাডি খেলাতে আরম্ভ করেছেন। বৈদ্যজীর ধারণা, এর পেছনে রাজনীতি আছে। কিন্তু যেহেতু ঐ অধ্যাপক রামাধীন ভিখমখেড়বীর জোটের, তাই বৈদ্যজী তাঁর ধারণাটা তাঁর বৈঠকখানায় ব্যক্ত করে কথাটা ওখানেই শেষ করে দিয়েছেন।

এই মাঠেই সপ্তাহে একবার করে বাজার বসে। তাতে শাক-সবজি বিক্রি হয়, আর কখনও কখনও হঠাৎ গমের কোনো দুর্লভ বস্তাও বিক্রি হতে দেখা যায়।

প্রধান হবার পর শনিচর এই মাঠের এক কোণে কাঠের একটা কেবিন খাড়া করেছে আর সেখানে একটা মুদির দোকান খুলেছে। প্রধান হবার আগে এটা সে কেন করতে পারে নি তার কোনো উত্তর তার কাছে নেই।

হোলির পনেরো দিন আগে সে দোকানটা খুলেছে। বদ্রী-পালোয়ানকে খোশামোদ করে তাঁকে দিয়ে দোকানের উদ্‌বোধন করিয়েছে। উদ্‌বোধন-অনুষ্ঠান সাধারণ হলেও বেশ জাঁকাল হয়েছিল। দোকান খোলার সময় ছোটে পালোয়ান তাঁর দু-একজন সঙ্গীকে নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে কাঠের একটা ভাঙাচোরা বেঞ্চের ওপর বসে পড়েছিলেন। তারপর দোকান থেকে একটা গুড়ের ডেলা তুলে নিয়ে সঙ্গীদের মধ্যে ভাগ করে খেতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বদ্রী পালোয়ান তখন চুপচাপ জনতার আগমনের অপেক্ষা করছেন। জনতার নামে দশ-পাঁচজন নিষ্কর্মা

লোক যখন বেড়াতে বেড়াতে ওখানে এসে উপস্থিত হ'ল তখন বদ্রী পালোয়ান এক সংক্ষিপ্ত, অথচ সারগর্ভ ভাষণ দিলেন, শনিচরের এখন দিনরাত নিষ্কর্মার মতো বসে থাকা ঠিক নয়। দোকান খুলেছে, সোজা রাস্তায় চললে কিছুদিনের মধ্যেই সে মানুষ হয়ে যাবে।

শনিচর তার নিজের হিসাবমতো দোকানটা বেশ সাজিয়েগুছিয়ে নিয়েছে। কাঠের দেয়ালের একদিকে কোমরকষা লাড্ডুর এক বিজ্ঞাপন, অন্যদিকে একটা বিরাট পোস্টার: "অধিক ফসল ফলাও"। এই পোস্টারের কথা আগেই বলা হয়েছে। দেয়ালের বাকি জায়গাটাতে এক বুড়ীর আবিষ্কার করা কাজল আর দাদ, কাশি, হাঁপানি ইত্যাদির ওষুধ আর এক বিশেষ ধরনের ব্যাটারি আর বনস্পতি ঘি প্রভৃতির বিজ্ঞাপন। যে-সব জিনিসের বিজ্ঞাপন রয়েছে তার বেশির ভাগই দোকানে পাওয়া যায় না। দোকানে সেইসব জিনিসই বেশি আছে যে-সব জিনিসের বিজ্ঞাপন নেই।

দোকানে পানবিড়ি থেকে আরম্ভ করে আটা, চাল, ডাল, গরম মশলা ইত্যাদি সবকিছুই আছে, এবং এ-সবই প্রকাশ্যে কেনা ও খাওয়া যায়। এটা রাজনীতির সেই দিকটা, যা ম্যানিফেস্টোতে লেখা হয়ে থাকে। এর পরে আর-একটা দিক আসে, যেটা পার্টির বৈঠকে গুপ্ত মন্ত্রণারূপে প্রকাশ করা হয় এবং কেবল বিশ্বস্ত সূত্রই তা জানতে পারে। তার মধ্যে এমন-সব জিনিস আসে যা প্রকাশ্যে কেনা যায় না, কিন্তু খাওয়া যায়। এই শ্রেণীর জিনিসের মধ্যে অনেক ইংরেজী ওষুধ আছে, যার উদ্‌গম স্থানীয় হাসপাতালের স্টোরে। এরই মধ্যে অ্যামেরিকার গুঁড়ো দুধের কৌটোর উদ্‌গম স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে। এইসব জিনিসের সঙ্গে কিছু এমন

জিনিসও আসে, যা কেবল লুকিয়েই কিনতে হয় এবং লুকিয়েই খেতে হয়। এর মধ্যে আছে গাঁজা, ভাং আর চরস। আফিঙের ব্যাপারে শনিচর কোনো আগ্রহ দেখায় নি, কারণ গ্রামে আফিঙের চোরা কারবার করার একাধিকার রামাধীন ভিখমখেড়বীর।

হোলি আসতে আসতে শনিচরের দোকান সরকারী স্বীকৃতি পেয়ে গেল আর ওখানে চিনি বিক্রি হতে লাগল। লোকে জানে, ঐ চিনি পারমিটে পাওয়া যায়, কিন্তু পারমিট কোথায় পাওয়া যায় তা কেউ জানে না। হোলির দিন থেকে ওখানে কাঁচা মদও বিক্রি হতে লাগল। এই মদের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব এই যে, এতে জল মেশানো থাকে না। সরকারী লাইসেন্সওয়ালা দোকানের মদের কিন্তু এই বিশেষত্ব নেই।

দোকানটাকে সবাই নিজের নিজের ঢঙে আশীর্বাদ করে গেছেন বদ্রী, ছোটে, বৈদ্যজী, প্রিন্সিপালসাহেব সবাই। প্রিন্সিপাল তো একটা প্রস্তাবও দিয়ে গেছেন, কিছুটা জায়গা করতে পারলে খাতা বই, কাগজ-পেন্সিলও বিক্রি করতে শুরু করে দাও। কো-অপা-রেটিভের নতুন সুপারভাইজার বলে গেছেন, দোকানঘরটা ঠিকমতো বানাতে পারলে এটাকে কো-অপারেটিভ স্টোর হিসাবে চালানো যেতে পারবে। উত্তরে শনিচর বলেছে, "তুমি এখন থেকেই এটাকে কো-অপারেটিভ স্টোর মনে করছ না কেন ? লাখ টাকা খরচ করে কো-অপারেটিভের বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেখানেই কো-অপারেটিভ স্টোরের একটা বাড়িও বানিয়ে দিয়ো।"

সুপারভাইজার বলেছেন, "স্টোরের আবার বাড়ি কী ? চারটে দেয়াল তুলে ওপরে একটা খড়ের চাল দিয়ে দাও, হয়ে গেল বাড়ি। বলো তো কালই বানিয়ে দিই। কিন্তু বৈদ্যজী বল-

ছিলেন, তুমি পঞ্চায়েতঘর বানাচ্ছ। ওর মধ্যেই তো স্টোর হয়ে যাবে।”

শনিচর প্রধান-সুলভ গাম্ভীর্য এনে বলতে লাগল, “এই হচ্ছে বৈদ্যমহারাজের গোলমেলে কাজ। কাউকে তো ‘না’ বলতে পরেন না। আমাকে এই কথা বলছেন। আবার ওদিকে প্রিন্সিপালসাহেবকে বলে রেখেছেন যে, পঞ্চায়েতঘর কলেজের পাশে হবে, যাতে দরকার হলে দু-একটা ক্লাস ওখানেই বসতে পারে। বদ্রী পালোয়ানকে বলেছেন, ওখানেই শনিচরটার শোয়াবসার ব্যবস্থা যদি করে দিতে পারো তা হলে সে দিনরাত পঞ্চায়েতেরই কাজ দেখাশোনা করবে। এখন তুমিই বলো, পঞ্চায়েতঘরের বাড়ি হ’ল না, কার্তিক মাসের কুকুর হয়ে গেল। আগে থেকেই হাজার লোক তাকে ঘিরে বসে আছে। বাজার বসল না, অথচ আগে থেকেই ভিখারিরা এসে বসে গেছে।”

সুপারভাইজার বললেন, “তা হলে বৈদ্যজীর সঙ্গেই কথা বলে নিয়ো, নয়তো আমিই বলে নিচ্ছি।”

“কথা বললে কী হবে? তাঁর সব কথাই আমার কাছে আদেশ।”

চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি লাজুক যুবক প্রায় এক ঘণ্টা ধরে শনিচরের দোকানে বসে বক্তৃতা দিচ্ছে। চার-পাঁচজন লোক কৌতূহলভরে তার কথা শুনছে। তাদের মধ্যে রুপ্পনবাবুও আছেন। যুবকটির বক্তৃতা অত্যন্ত ভদ্র এবং যুক্তিসম্মত, কিন্তু যারা শুনছে তারা নিজেদের মতো করেই বুঝছে।

বোঝদার লোকেরা এ কথা স্বীকার করতে তেমন আপত্তি করে

না যে, ছেলেপেলে একটা ঝামেলার জিনিস। এই কথাটাকেই বোঝাবার জন্য যুবক একটা উদাহরণ দিল, বাড়িতে যদি একপোয়া ক্ষীর বানানো হয় আর কেবল স্বামী-স্ত্রী থাকে তা হলে তারা আধ পোয়া করে ভাগ পাবে। কিন্তু তাদের যদি একটা ছেলে থাকে তা হলে তিনজনের ভাগে এক ছটাকের একটু বেশি পড়বে। পাঁচটা ছেলে থাকলে ভাগের পরিমাণ ছটাক থেকে তোলায় নেমে আসবে। ক্ষীরের স্বাদ শেষ···।

রুপ্পনবাবু বললেন "ভাই, আমার কোনো ছেলে নেই, আর আমি জানিও না কী করে ছেলে হয়। কিন্তু একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে দাও, ছেলে পাঁচটা নয়, দু-তিনটেই যথেষ্ট ঠিক কথা, কিন্তু ক্ষীর মাত্র একপোয়া বানানো হবে কেন? কেন একসের বানানো হবে না?"

যুবকটি রুপ্পনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে ইতস্তত করছিল। তবু বলল, "একসের ক্ষীর বানানোর মতো ক্ষমতা ক'জনের আছে?"

"তা হলে ক্ষমতা বাড়ানের কথা বলো। ছেলেদের পেছনে লাঠি নিয়ে তাড়া করছ কেন?"

শনিচর হাত উঁচু করে প্রধানের ভঙ্গিতে বলতে আরম্ভ করল, "মানুষকে খোজা করলে কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমি বলি, কী করা উচিত। কয়েক বছর আগে আমাদের শিবপালগঞ্জ বাঁদরে ছেয়ে গিয়েছিল। সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সংখ্যায় অনেক বাঁদর ছিল, এইসব ছেলেদের চেয়েও বেশি। গ্রামের লোকেরা সকলে গোফনা নিয়ে বেরিয়ে যেত আর ক্ষেতে গিয়ে সারাদিন 'লেহো, লেহো, লেহো' বলে চিৎকার করতে করতে বাঁদরদের এক জায়গা থেকে তাড়িয়ে আরে-এক জায়গায় পাঠিয়ে দিত। কিন্তু তাতে ফসল রক্ষা পেত না। আমরা তখন কিছু পশ্চিম থেকে লোক

আনালাম। বাঁদর ধরার ওস্তাদ। কিছুদিনের মধ্যেই তারা সমস্ত বাঁদর ধরে ফেলল। তাদের অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তোমরাও তা-ই করো। যত ছেলে পাওয়া যায়, ধরে ধরে সবাইকে আটকে ফেলো। গুলী-টুলী করার দরকার নেই। শুনছি, ঐ বাঁদরগুলোকে বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ছেলেদেরও জাহাজে ভরে ওখানে পাঠিয়ে দাও। ওখানে গিয়েই থাক, বংশ রক্ষা করুক।"

রুপ্পনবাবু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, "বিলেত পাঠাতে কোনো খরচও নেই। শুনতে পাই, বাইরে থেকে গম বোঝাই করে জাহাজ আসে। ঐ-সব জাহাজ যখন ফিরে যাবে তখন ছেলেদের যেন ভরে নিয়ে যায়। সমস্ত কাজ ফোকটেই হয়ে যাবে।"

লাজুক যুবকটি কিছুক্ষণ এই প্রস্তাবগুলো নিয়ে চিন্তা করল। তারপর লজ্জা-রাঙা হয়ে বলল, "আরে না! আপনারা ঠাট্টা করছেন।"

সে উঠে দাঁড়িয়ে সাদরে জনতার উদ্দেশে নমস্কার করল— জনতা বলতে এখন শনিচর— এবং বলল, "আবার কাল এসে দেখা করব।"

শনিচর তার প্রধানসুলভ ভঙ্গিতে বলল, "কিছু মনে কোরো না ভাই, এরা একেবারে গেঁয়ো। কাল যদি আস তো বৈদ্যজীর বাড়িতেই মিটিং হবে। সকলের যদি মত থাকে তা হলে পুরুষদের অপারেশনও করিয়ে নেওয়া যাবে। আমি তো ব্রহ্মচারী মানুষ, জোরুজাঁতা নেই। তবু তোমরা যদি বলো তো আমিও অপারেশন করিয়ে নেব। নিশ্চিন্তে থাকা যাবে।"

সবাই যুবকটিকে সানন্দে বিদায় দিল। যুবকটি বিষণ্ণ মনে ফিরে গেল।

বেলা তখন প্রায় তিনটে। লোকের দরজা আর রাস্তাঘাট জনশূন্য। ফসল কাটা হচ্ছে, গ্রামের বেশির ভাগ লোক ক্ষেতে আর খামারে চলে গেছে। প্লেগে মরা কোনো নির্জন দেশে ভ্রমণরত ত্রাণকর্তার মতো যুবকটি সোজা দৃষ্টিতে, সোজা চালে এগিয়ে চলেছে। তার পরনে ঝকমকে টেরিলিনের বুশশার্ট আর অফিসারের চিহ্ন—প্যাণ্ট: কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ সে বুঝতে পারল, একটা কুকুর তার বুশশার্টের প্রেমে পড়েছে। কুকুরটা ডাকতে ডাকতে যুবকটির পায়ের দিকে এগুচ্ছে। যুবকটি দৌড়ে সামনের বাড়িটার দিকে পালাল। সেখানে চবুতরার ওপর, টিনের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছেই একটা অড়হরের ডাল পড়ে ছিল। সেটাকে সে তুলে নিয়ে অভিমন্যু যেমন রথের ভাঙা পায়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তেমনি সে-ও কুকুরের চক্রব্যূহ ভেদ করবার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

ঝাঁপিয়ে পড়া কুকুরটার ডাকে কে জানে কী জাদু ছিল, একপলকের মধ্যে চারদিকে কেবল কুকুর আর কুকুরে ভরে গেল। সবাই ডাকছে। যারা ডাকতে পারছে না, উত্তেজনায় তারা লেজ নাড়াচ্ছে আর কোমর দোলাচ্ছে। কতকগুলো বাচ্চা কুকুর ক্ষীণস্বরে কেঁউ কেঁউ করতে করতে লাফাচ্ছে।

হঠাৎ বাড়ির দরজাটা খুলে গেল। গয়াদীন বেরিয়ে এলেন। শান্তস্বরে তিনি বলে উঠলেন, "বড়ো চেঁচামেচি হচ্ছে।"

তারপর দরজার সামনে একজন শহুরে লোককে একটা পাতলা অড়হরের ছড়ি নাড়াতে দেখে কুকুরগুলোকে ধমকালেন। পাশের একটা বাড়ি থেকে একটা উৎসাহী ছেলে বেরিয়ে এসে দৌড়ে দৌড়ে কুকুরগুলোকে ঢিল মারতে লাগল। শত্রুপক্ষ ভয় পেয়ে গেল। কুকুরগুলো এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করল।

গয়াদীন লাজুক যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে ভাই?"

প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে এই প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর আছে, চট করে সে তার জাতের নাম বলে। যুবকটিও বলল, "আমি অগরওয়াল।"

দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা চারপাইটাকে নামাতে নামাতে গয়াদীন বললেন, "বোসো ভাই। কী কাজ করো তুমি?"

যুবকটি চারপাইয়ের ওপর বসে মুখের ঘাম মুছল। এই ঘাম কিন্তু গরমের ঘাম নয়, কুকুরে তাড়া করার ফল। ঘাম মুছে যুবকটি জবাব দিল, "চাকরি করি।"

গয়াদীন গভীরভাবে ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেন। মুখে লজ্জার ছাপ আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে বেশ সুন্দর। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কী করে এলে?"

উত্তরে ছেলেটি থেমে থেমে দেশে ভবিষ্যতে যে-সব শিশু জন্ম নেবে তাদের কথা বলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর গয়াদীন বুঝতে পারলেন, অন্যরা অবিরাম সন্তান জন্ম দিয়ে চলেছে আর এই ছেলেটির কাজ হচ্ছে তাদের ওতে বাধা দেওয়া। তিনি যুবকটির মাইনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর এইভেবে অবাক্ হয়ে চুপ করে বসে পড়লেন যে, জন্ম বন্ধের জন্য কেবল বক্তৃতা দিয়েই কেউ তার পেট চালাতে পারে।

হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ক'টি ছেলেমেয়ে?"

"একটাও না আমার বিয়ে হয় নি।"

গয়াদীন সাগ্রহে ছেলেটির নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি বৈশ্য অগরওয়াল?"

ছেলেটি মাথা নেড়ে এই সম্মান স্বীকার করে নিল। গয়াদীন

চারপাইয়ের ওপর আস্তে করে তার দিকে সরে এলেন। তিনি তার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন। তার বাড়ি কাছের শহরেই। তিনি তার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। দেখা গেল, তার বাবা গয়াদীনের জানাশোনা এক ব্যবসায়ী। তাঁর খবর নিয়ে জানলেন, অনেক ছোটো ব্যবসায়ীর মতো তিনিও একজন ছোটো-খাটো নেতা হয়ে গেছেন। তার প্রমাণ, ছেলেকে চাকরি করার জন্য বাড়ি থেকে অনেক দূরে না পাঠিয়ে পনেরো মাইল দূরত্বে পোস্টিং করাতে পেরেছেন। তারপর গয়াদীন তার ভাইবোনদের খবর নিলেন, শুনলেন এক ধনী শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বোনের বিয়ে হয়েছে, ছেলেটির ভগ্নীপতি কলকাতার এক রইস লোক আর তার ছোটো ভাই ভগ্নীপতির সঙ্গে ব্যবসা করছে। তারপর আরও জিজ্ঞাসাবাদের পর গয়াদীন জানতে পারলেন, ঐ ধনী শ্রেষ্ঠীর এটা তৃতীয় বিবাহ। তারপর তিনি ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে বিয়ে করবে কিনা, সে জবাব দিল যে, তার বাবার আদেশ এই বছরেই করতে হবে।

গয়াদীন শেষে ছেলেটিকে বললেন, "তুমি ভাই লেখাপড়া জানা লোক, তুমি তো বি. এ. - এম. এ. ছাড়া কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে না।"

এবার ছেলেটি দেশের অধিকাংশ ছেলের মতো, যারা সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রেম করে, কিন্তু বিয়ে করে বাবা যৌতুকের সিঁড়ি দিয়ে যে মেয়েকে নামিয়ে আনেন তাকে, বলল, "আমি কিছু জানি না। বাবা যেমন হুকুম দেবেন, করব।"

ছেলেটি চারপাই থেকে উঠে দাঁড়াবার আগে গয়াদীন বললে, "তুমি তো আমাদেরই সমাজের লোক, বাড়িতে এসেছ, শরবৎ খেয়ে যাও।

শরবৎ না খাও তো দুধ খাও। আচ্ছা, দুধ ভালো না লাগে তো চা খাও।”

গয়াদীন এ কথা বলে বেলাকে ডাকলেন।

শিবপালগঞ্জে খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে, বৈদ্যজীর অসন্তোষের জন্য দারোগাবাবু এখান থেকে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন, যোগনাথের কাছে মাপ চাইবার জন্য আজ তিনি এখানে এসেছেন এবং এখন বৈদ্যজীর বৈঠকখানায় আছেন। খবরটা অনেকখানিই সত্যি।

এখন তিনি বৈদ্যজীর বৈঠকখানাতেই আছেন। টেরিলিনের বুশশার্ট সোনালী চশমা, পাকানো গোঁফ— তাঁকে এখন দেখাচ্ছে যেন এক তালুকদার, অনেক যুবতী মেয়ের সহানুভূতির দরুন নিজের এলাকা ছেড়ে শহরে বাস করতে চলে এসেছেন। তাঁর চেহারা বেশ কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক এবং গৌরবমণ্ডিত, কিন্তু চোখে রসিকতা আছে। মনে হয়, একটু উৎসাহ পেলেই উর্দু প্রেমের কবিতার কোনো পদ আবৃত্তি করতে আরম্ভ করবেন।

রুপ্পনবাবু আজকাল প্রিন্সিপালের প্রকাশ্য বিরোধী হয়ে পড়েছেন। প্রায় সময়েই তিনি খান্না মাস্টারের বাড়িতে বসে থাকেন। রঙ্গনাথ দু দিন অন্তর শহরে ফিরে যাবার কথা বলতে শুরু করেছে। কখনও কখনও সে-ও খান্নামাস্টারের ওখানে যায়। বদ্রীপালোয়ান তিনদিন আগে আশপাশের জেলাগুলোয় চক্কর লাগাতে গেছেন, কারণ তাঁর দু-তিনজন চেলা তাদের নির্দোষিতার জন্য রাহাজানি আর ডাকাতির মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছে। এখন বৈদ্যজীর বৈঠক-খানায় বৈদ্যজী, দারোগাবাবু, যোগনাথ আর ছোটে পালোয়ান উপস্থিত আছেন।

এই থানা থেকে বদলি হয়ে যাবার পর দারোগাবাবু কয়েকটা মুশকিলে পড়েছেন। প্রথমত, তাঁর জায়গায় যে থানাদার এসেছেন তিনি "এতদিন তো সব সর্বনাশ হয়েছে; যাক গে, চিন্তার কিচ্ছু নেই; সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে" গোছের লোক। তাই পুরনো দারোগাবাবুর ওপর এই থানার কয়েকটা মামলা নিয়ে তদন্ত চলছে। তদন্ত চলা একটা কষ্টকর ব্যাপার, বিনা অ্যানিস্থিশিয়ার অপারেশনের মতো— তা তার সমাপ্তি কফিহাউসের তর্কের মতো কোনো উপসংহার ছাড়াই হোক-না কেন। দারোগাবাবু এখন তাঁর দপ্তরের ওপর থেকে ভালোরকম নাকানিচোবানি খাচ্ছেন।

অন্য মুশকিল গোরুটা নিয়ে। শহরে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন, তাঁর ভাই মিলিটারি ফার্মে কাজ করেন ঠিক, এবং সেখানে তিনি গোরুটাকে রেখে ফোকটে তার খড়বিচালির ব্যবস্থাও করতে পারেন সত্যি কথা, কিন্তু এখন তাঁর ওখানে দুর্নীতিদমন অভিযান চলছে এবং এখন তাঁর এমন সাহস নেই যে, গোমাতার সেবার দায়িত্ব নিতে পারেন। গলির মধ্যে একটা বাড়িতে থেকে দারোগাবাবুকে রোজ চিন্তা করতে হয়, গোরুটাকে নিয়ে তিনি কী করবেন।

তৃতীয় মুশকিল যোগনাথের মামলা নিয়ে। যোগনাথ সিভিল জজের আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে আট হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেছে। তার মামলার বক্তব্যের শেষ কয়েকটি কথা এইরকম: "প্রতিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে চুরির মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমা চালিয়েছে। তাকে প্রায় দু মাস হাজতে রাখা হয়েছে, এতে গোটা সমাজে তার বেইজ্জতি হয়েছে এবং তার ব্যবসার খুব ক্ষতি হয়েছে। এ-সবের ক্ষতিপূরণ কয়েক লক্ষ টাকা হয়, কিন্তু অত

টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার ক্ষমতা প্রতিবাদীর নেই। তাই তার বিরুদ্ধে মাত্র আট হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করা হচ্ছে।"

যোগনাথ দারোগাবাবুর ক্ষমতাটাকে নামিয়ে যেখানে ফিট করেছে তাতে দারোগাবাবু বিচলিত হন নি। তাঁর বিচলিত হবার কারণ, গোটা মামলাটায় জনতা কৌতূহলী হয়ে পড়েছে। ঐ শহরে প্রায় আধডজন হিন্দী আর উর্দু চোতা কাগজ বার হয়, এইসব চোতা কাগজকে ওখানে সাপ্তাহিক পত্রিকা বলা হয়। কিছু অর্ধশিক্ষিত লোক এইসব চোতা কাগজ বার করে। তারা নিজেদের সাংবাদিক বলে এবং সাংবাদিকরা তাদের ইতর বলে। এইসব চোতা কাগজে প্রায়ই আদালতের নোটিস আর রাস্তার দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত ছাপা হয়। সেইসঙ্গে নিশ্চিতভাবে প্রত্যেক চোতা কাগজে কোনো-না-কোনো অফিসারের জীবনের এমন ঘটনার বিবরণ ছাপা হয়, যাতে এক পক্ষে থাকে ঐ অফিসার স্বয়ং আর অন্য পক্ষে মদের বোতল, মেয়েমানুষ, নোটের তাড়া, জুয়া অথবা দালালের কথা। আদালত আর অফিসার মহলে এইসব চোতা কাগজ খুবই চলে এবং এ থেকে হিন্দী-উর্দু সাংবাদিকতার বিপদের দলিল পাওয়া যায়। কখনও কখনও অকস্মাৎ কোনো অফিসারের জীবনবৃত্তান্তের ভ্রম-সংশোধনও ছাপা হয়। তাতে বলা হয়, সম্পাদক স্বয়ং অমুক তারিখের কাগজে প্রকাশিত ঘটনার তদন্ত করেছেন এবং দেখেছেন যে, তার মধ্যে সত্যতা নেই। এই খবর ছাপার জন্য তিনি দুঃখিত। তিনি তাঁর বিশেষ সংবাদদাতার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সংবাদ-দাতাটিকে এখন চাকরি থেকে বরখাস্ত করে বাদাম বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছে।

যে অফিসারের পক্ষে এইরকম ভ্রমসংশোধন ছাপা হয়, সে

তার বন্ধুদের মুচকি হেসে বলে, "দেখলে ?" আর তার বন্ধুরা তার পেছনে বলাবলি করে, সম্পাদকমশায় একেও না ছুয়ে ছাড়লেন না। এইভাবে সাহিত্য আর শাসনের সম্পর্ক দিনের পর দিন গভীর হয়ে চলেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে এইসব চোতা কাগজের এই হচ্ছে উপযোগিতা।

এইভাবে এক চোতা কাগজ দারোগাবাবুর বিরুদ্ধে যোগনাথের মামলার খবরটা প্রথম পৃষ্ঠায় ঢেলে দিয়েছে। খবরটাকে যাতে কেউ বাসি বলতে না পারে তার জন্য অন্য কয়েকটা চোতা কাগজও তাতে চিত্তাকর্ষক কিছু অদলবদল করে কয়েকবার কয়েকভাবে খবরটা ছেপেছে। শহরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দারোগাবাবু একজন বিখ্যাত লোক হয়ে গেলেন।

এখনও মকদ্দমার প্রথম শুনানীর দিন পড়ে নি, অথচ তিনি দেখলেন, কাগজওয়ালাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিভাগের লোকদেরও তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল বেড়ে গেছে। ক্লাবে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে যা বোঝান তার মোদ্দা কথা হচ্ছে, দিনকাল খারাপ পড়েছে, পয়সাওয়ালা লোকেরা কেউকেটা হয়ে গেছে। চাকরি করার দিন চলে গেছে। তুমি তো খুব সমঝদার লোক ছিলে, এই ঝামেলায় পড়লে কী করে ? বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি এত সহানুভূতি পেতে আরম্ভ করলেন যে, তাঁর পথচলা মুশকিল হয়ে পড়ল, আর এখন সবাই কোরাসের সুরে বলতে আরম্ভ করেছে, "কিচ্ছু ঘাবড়িয়ো না, আমরা সবাই মিলে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়ব, আর দেখো, শাস্ত্রে লিখেছে সত্যেরই জয় হয়।" এইসব কথা শুনে দারোগাবাবুর মন খারাপ হতে লাগল।

একদিন তাঁর এক বয়স্ক শুভার্থী তাঁকে বললেন, "তুমি তো

আশ্চর্য লোক! মকদ্দমার লেজ লাগিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছ, একটা উপায় বার করে এটা মিটিয়ে ফেলছ না কেন?"

এরপরই তিনি বৈদ্যজীর শরণ নিলেন।

সবাই চুপ করে বসে আছেন। যে কথা হবার দরকার ছিল তা বোধ হয় হয়ে গেছে। সবাই বৈদ্যজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

হঠাৎ দারোগাবাবু বললেন, "বৈদ্যজী, আমার বাসের সময় হয়ে যাচ্ছে।"

বৈদ্যজী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথার জবাব দিলেন, "তা হলে যেমনটা বলবেন, তেমনটাই করব। আপনি প্রতিবাদী, যোগনাথ বাদী। এখন আপনারা সামনাসামনি আছেন। নিজেরাই কথা বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন। যুবকদের কথার মধ্যে আমি কী বলতে পারি!"

যোগনাথ বলল, "মহারাজ, এ তো আমার একার ব্যাপার নয়, শিবপালগঞ্জের মর্যাদার ব্যাপার। তাই গ্রামসভা তার নিজের তরফ থেকে মকদ্দমার খরচ চালাচ্ছে। নিষ্পত্তিও গ্রামসভার প্রস্তাব অনুসারে হবে। আমি তো তখনও দারোগাবাবুর চেয়ে ছোটো ছিলাম, এখনও ছোটো আছি। হাকিম হাকিমই থাকবে, আমার কিছু বলার নেই, আপনি যা বলবেন তা-ই হবে।"

দারোগাবাবুর মনে হচ্ছে, সন্ধ্যার পোর্চুলাকার মতো তাঁর গোঁফ-জোড়া শুকিয়ে নিচে ঝুলে পড়ছে। কিন্তু মোম লাগিয়ে গোঁফ পাকানোর সুবিধা এই যে, ভাবুকতার কারণে তা উঁচুনিচু হয় না। তিনি কিছুই বললেন না।

বৈদ্যজী যোগনাথকে বললেন, "তা হলে গ্রামসভার ওপরই ছেড়ে দাও। শনিচরের সঙ্গে কথা বলো। এত বড়ো একজন হাকিম শহর থেকে এখানে ছুটে এসেছেন, মামলা খতম করিয়ে দাও।"

দারোগাবাবু অবাক্ হলেন, "শনিচর! সে কে?"

বৈদ্যজী নম্রভাবে বললেন, "আপনি বোধ হয় জানেন না, ওঁর আসল নাম মঙ্গলপ্রসাদ। আমাদের গ্রামসভার প্রধান। ওদিকে ঐ যে ওঁর দোকান। আপনি ওখানে গিয়েই কথা বলে নিন।"

একজন বললেন, "শনিচরকে এখানেই ডাকা হোক না।"

বৈদ্যজী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "পদের মর্যাদা রাখা উচিত। নেহেরুজীকে প্রধানমন্ত্রী করার পর গান্ধীজী তাঁকে কত সম্মান করতেন। পারস্পরিক সম্পর্কের কথা আলাদা, কিন্তু লোক-ব্যবহারে পদের মর্যাদা রাখতে হয়।"

দারোগাবাবুকে সাহস দিয়ে তিনি আবার বললেন, "ওখানে দোকানেই যান, প্রধানজী এসে গেছেন হয়তো।"

শনিচর তার দোকানের কেবিনে বসে দারোগাবাবু আর যোগনাথের জন্য অপেক্ষা করছে। ক্ষেত থেকে ফিরেই সে তার গ্রাম্য পদ্ধতিতে জানতে পেরেছিল যে, যোগনাথের মামলায় দারোগাবাবু চুপসে গেছেন, সন্ধি করার জন্য ছুটে এসেছেন। তাঁকে শক্ত করে টানতে হবে, যাতে শিক্ষা পান যে, শিবপালগঞ্জে বড়ো বড়ো দারোগারা টুঁ শব্দটি করতে পারেন না। এটা সময়ে-অসময়ে কাজে লাগবে।

শনিচর দারোগাবাবুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে চার-পাঁচ পুরিয়া ভাং বিক্রি করে ফেলল। গ্রাম-পঞ্চায়েতের একজন মেম্বার রাস্তা

দিয়ে যাচ্ছিল, শেষে তাকে একটা পুরিয়া এমনিতেই দিয়ে দিল। সে জিজ্ঞাসা করল, "কী করব এ দিয়ে?"

"রেখে দাও। দারোগাবাবুর ভিত নড়বে বলে মনে হয়। যদি নড়ে তা হলে ভাং-ভোজ কোরো। ভাং আমার, বাদাম-পেস্তা-চিনি-দুধ সব তোমার।"

লোকটা পুরিয়াটা গাঁঠে গুঁজে রাখল, তারপর মুচকি হেসে বলল, "প্রধানজী, আমার ওপরই দাঁও মারছ! এক টাকার ভাঙে কী এসে যায়, আসল দাম তো বাদাম-পেস্তার।"

শনিচর মুখটা এমন করল যেন তার উদারতায় লোকটা আক্ষেপ করায় সে অসন্তুষ্ট হয়েছে। লোকটাকে সে বলল, "পুরিয়াটা রাখো তো, তোমার কোনো ক্ষতি করছে না তো। দারোগাবাবুর ভিত নড়তে দাও, তারপর আমার না হলে গ্রামসভার তরফ থেকেই ভাং-ভোজ করা যাবে।"

লোকটা বলল, "পঁচিশ টাকা বেরিয়ে যাবে।"

"বেরুতে দাও।"

"পঞ্চায়েত-মন্ত্রী এই খরচে আপত্তি করবে।"

শনিচর তাড়াতাড়ি রাগ করার চেষ্টা করে বলল, "এই কো-অপারেটিভ ইউনিয়নে দশ বছর ধরে রোজ সন্ধ্যায় ভাং-ভোজ চলছে। কোনো শালা আপত্তি করে নি। গ্রামসভার ভাং-ভোজে কেন কেউ আপত্তি করবে?"

দারোগাবাবু আর যোগনাথকে আসতে দেখা গেল। শনিচর জামাটা তুলে গায়ে দেবে ভাবল, নির্বাচনের পরেই সে জামাটা তৈরি করিয়েছে, এবং বৈদ্যজীর হুকুমে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে পরে।

শনিচর কী ভেবে জামাটা শেষ পর্যন্ত গায়ে দিল না, চালের ঝুড়ির ওপর রেখে দিল। তারপর খালি গায়ে হাতটা একবার বোলাল, টিকিটা মাথার ওপর ভালো করে ছড়িয়ে দিল, আর আণ্ডারওয়্যার-টাকে ওপরে টেনে তুলে উরুর একেবারে উদ্‌গমস্থল পর্যন্ত নিয়ে এল। তারপর অবধূতের ভঙ্গিতে দারোগাবাবুকে অভ্যর্থনা করার জন্য তৈরি হ'ল, অর্থাৎ কোনো কাল্পনিক গ্রাহকের জন্য দাঁড়িপাল্লায় একটা জিনিস মাপতে লাগল।

যোগনাথ এসেই বলল, "প্রধানজী, দারোগাবাবু এসেছেন।"

শনিচর দারোগাবাবুর মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় ?"

"এই যে, ইনি।"

শনিচর সামনের বেঞ্চটা দেখিয়ে রুক্ষভাবে বলল, "বোসো দারোগাবাবু। আপনি বিনা উর্দিতে এসেছেন, চিনতে একটু অসুবিধে হয়েছে।"

দারোগাবাবু বেঞ্চের ওপর বসলেন। ধুলো ঝেড়ে বসাটাকে তিনি নীতিবিরুদ্ধ মনে করলেন। তাঁর পাশে যোগনাথও বসল।

দারোগাবাবু বলতে আরম্ভ করলেন যে, শনিচরের মতো প্রধানের হাতে শিবপালগঞ্জ খুব উন্নতি করবে। তিনি এই বলে দুঃখপ্রকাশ করলেন যে, তিনি যখন এখনে ছিলেন তখন শনিচরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে পারেন নি। তিনি বললেন, যোগনাথ কিছু ভুল বুঝেছেন, তাই উনি একটা মামলা…।"

শনিচর বাধা দিয়ে বলল, "ভুল বোঝা ! সে আবার কী জিনিস ? আপনি ইংরেজী ছেড়ে দেশী ভাষায় বলুন। আমরা দেহাতী মানুষ, এমনভাবে বলুন যাতে আমরা বুঝতে পারি।"

দারোগাবাবুর গোঁফে জমা মোম তাঁর সম্মান রক্ষা করল। উঁচু গোঁফের ছত্রছায়ায় গলার স্বর মিষ্টি করে তিনি বললেন, "যোগনাথের ভ্রম হয়েছে যে,...।"

শনিচর বলল, "ভ্রম হয়েছে তো এই মকদ্দমায় তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। চারটে শুনানীর পর বোঝা যাবে, ভ্রমটা কার হয়েছে।"

দারোগাবাবু কোনো রকম বিতর্কে প্রবেশ করলেন না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখুন প্রধানজী, আপনি ধরে নিন, ভ্রম আমারই হয়েছিল। ভুল আমারই ছিল। পুরো সাক্ষীপ্রমাণ না নিয়ে এই মকদ্দমায় আমার হাত দেওয়া উচিত হয় নি। আমি এখন সন্ধি করার জন্য তৈরি। আপনি যা ভালো বুঝবেন তা-ই হবে।"

যোগনাথ মুচকি হাসি হাসল। কিন্তু শনিচর গম্ভীর হয়ে বলল, "কী বলছ যোগনাথ?"

"আমি আর কী বলব! আমি তো তখনও গুণ্ডা ছিলাম, এখনও গুণ্ডা আছি। বলা-কওয়া তো তোমার ব্যাপার। এমনিতে যদি আমার মত জানতে চাও তো বলি, দারোগাবাবু যা বলছেন তা লিখে দিন। মামলা খতম হয়ে যাক।"

দারোগাবাবু কিছু বললেন না। শনিচর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "আমি বলছি দারোগাবাবু, চলুন, বৈদ্যজীর সঙ্গে কথা বলা যাক।"

দারোগাবাবু বললেন, "ওঁর সঙ্গে তো আমি কথা বলেছি। উনি বলছেন, মামলা গ্রামসভার হাতে, যোগনাথের মকদ্দমা গ্রামসভাই চালাচ্ছে। ওঁর বক্তব্য, মকদ্দমা তুলে নেবার সিদ্ধান্ত আপনিই নেবেন। বৈদ্যজী তো গ্রাম-পঞ্চায়েতের মেম্বারও নন।"

"হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা।"— শনিচর বড়াই করে বলল। তারপর একটু থেমে যোগ করল, "তবু বৈদ্যজীর সঙ্গে কথা বলা যাক।"

"কিন্তু উনি তো বলছেন, উনি মেম্বার পর্যন্ত নন।"

শনিচর চালের ঝুড়ি থেকে জামাটা নিয়ে জোরে ঝাড়ল। ধুলো উড়ল, কিন্তু দারোগাবাবু নাক পর্যন্ত কুঁচকোলেন না। শনিচর জামাটা গায়ে দিতে দিতে বলল, "চলুন, ঐ দরবারেই তো যেতে হবে।"

সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামসভার তরফ থেকে ভাং-ভোজ হ'ল। গান্ধী চবুতরার ওপর কয়েকটা শিলনোড়া একসঙ্গে চলতে লাগল। ধুলো-ময়লার মধ্যেই ভাং পেষা হ'ল। পাছে শুধু ভাঙে নেশা না হয়, তাই তার মধ্যে কিছু ধুতরোর বীজও মেশানো হ'ল। বাদাম, পেস্তা, গোলমরিচ, এলাচ আর নাম-না-জানা দশ-বিশ রকমের জিনিসও বেঁটে তার মধ্যে মেশানো হ'ল। শেষে এই মিক্‌শ্‌চারটা দুধ আর জলে মেশানো হ'ল, আর দেখতে দেখতে কয়েক বালতি ভরে গেল। শনিচর বাঁদরের মতো লাফিয়ে কাছের একটা গাছের নিচে শিবলিঙ্গের ওপর এক গেলাস ভাং নিবেদন করল। তারপর ভাং সম্পর্কিত কয়েক শ সূক্তি আর প্রার্থনা-বাণী আওড়াতে লাগল। আগের দিনের অশিক্ষিত লোকও আজকের দিনের শিক্ষিত লোকের চেয়ে কত বেশি জানে— এই ভাবনায় লোকেরা মাথা নেড়ে তারিফ করতে শুরু করল। তারপর ভাং বিলি আরম্ভ হ'ল।

গান্ধী চবুতরার ধারে কত ছেলে জমা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের চোখে পিঁচুটি, মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। সবারই পেট মোটা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তাদের বাড়িতে খাবারের অভাব নেই। ছেলেরা কখনও ক্ষীণস্বরে, কখনও কর্কশ স্বরে চিৎকার করছে। তার

চেয়েও বেশি অস্বাভাবিক তাদের মুখের খুশি। প্রথমে এইসব ছেলেদেরই ভাং দেওয়া হ'ল। তারা দুধের স্বাদ না জানলেও ভাঙের স্বাদ পেয়ে "খুব ভালো", "ফাস্ট কেলাস" এমনি সব রায় দিয়ে চোখ বুজে খেতে লাগল।

ঐদিন রাত্রেই যোগনাথ শরাবখানায় বিশেষ বিশেষ কয়েকজনকে মদ-ভোজ দিল। তাতে প্রধান অতিথি করা হ'ল এমন একজনকে যে পাশের গ্রামে একজনকে হত্যা করার অভিযোগ থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছে। তার উপস্থিতিতে পরিবেশ আগে বেশ সম্মানজনক ও শান্ত ছিল, কিন্তু পরে একজন লোক যখন ফৌজী ভাষায় বলল, "ঘুমন্ত মানুষকে ছাগলের মতো কেটে ফেলাটা বাহাদুরি নয়, যুবক; এটা কসাইয়ের কাজ", তখন পরিবেশের শান্তি লেজ নেড়ে গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল।

প্রধান অতিথি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কখনও ছাগল কেটেছ?"

"আমি কসাই নই।"

"আমি সোজা কথা জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কখনও ছাগল কেটেছ?"

সে তার গেলাসের দিকে তাকিয়ে খুব ধীর স্বরে কথা বলছিল। এবার সে তার কথাটার পুনরাবৃত্তি করায় কয়েকজন লোক ঘাবড়ে গিয়ে তার কাছে এগিয়ে এল। একজন তার হাত ধরে বলল, "যেতে দাও।"

সে ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কখনও···।"

"যেতে দাও, যেতে দাও ভাই।"— সবাই তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে ফৌজী ভাষা-ব্যবহারকারী

লোকটা ওখানে পৌঁছে গেছে, যেখানে সমস্ত জিনিসকে তৃণ আর সমস্ত মানুষকে পতঙ্গ মনে হয়। সে জনসাধারণকে উদ্দেশ করে বলল, "এই যুবকের নেশা ধরেছে। একে ঐ কোণে শুইয়ে দাও আর মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালো।"

এটা সবে আরম্ভ। গেলাস আর বোতল ভাঙচুর শুরু হতে বেশি দেরি লাগল না। এরপর তারা শরাবঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় কিছুক্ষণ গালাগালের ভোজ করল। একটা বাজার পর লাথি-ঘুঁষি আর লাঠির ভোজ শুরু হ'ল।

আশপাশের বাড়ির লোকেরা জেগে গেছে আর থানার লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

রঙ্গনাথ ছাদের বারান্দায় শুয়ে ছিল। তার ঘুম ভেঙে গেল। কিছুক্ষণ সে চুপচাপ শুয়ে রইল, শুয়ে শুয়ে গ্রামের এক কোণ থেকে ভেসে আসা এইসব চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে থাকল। তারপর রুপ্পনকে বলল, "এখানে আমার আর ভালো লাগছে না। আমি কালই ফিরে যাব।"

রুপ্পনবাবু আজকের জলসায় শরিক হন নি, তবে তাঁর ভাগের ভাংটা তাঁর বাড়িতে পোঁছে দেওয়া হয়েছে। ঘুম জড়ানো স্বরে তিনি বললেন, "কোথায় যাবে দাদা? ওখানেও এই ধরনের হারামি দেখতে পাবে।"

রঙ্গনাথ জোর দিয়ে বলল, "ও জায়গাটাও আমার ভালো লাগে না।"

রুপ্পনবাবু পাশ ফিরে একটা হাই তুলতে তুলতে বললেন, "ভালো না লাগানোর তুমি কে? এর থেকে ছাড়া পেয়েছে কে?"

বলতে বলতে তিনি চারপাইয়ের ওপর উঠে বসলেন। তারপর বললেন, "কিছুদিন ধরে তুমি এইরকম সব কথা বলছ। তুমি

এমনভাবে বলছ, যেন তুমি বিলেত থেকে এসেছ আর বাকি সবাই কালা আদমী মাটিতে হাগনেওয়ালা। ঘুমোতে হয় তো চুপ করে ঘুমোও, নইলে রাতভ'র বসে বসে ভালো না লাগাতে থাকো।"

ছাব্বিশ

বাড়ি ফিরে এসে বদ্রীপালোয়ান দেখলেন, বৈদ্যজীর মন খারাপ। তাঁর মন যে খারাপ তার চিহ্ন তাঁর মাথার পাগড়ি কিছুটা ঢিলা, গোঁফ এলোমেলো, আর প্রত্যেক তিনটি কথার পর পরই তিনি বলছেন, "আমি কী বলব! যা ইচ্ছে হয়, করো।"

বদ্রীপালোয়ানের এক বন্ধু পাশের এক জেলায় বে-আইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্র রাখার অপরাধে শাস্তি পেয়েছে। তার বাড়িতে একটা স্টেনগান, কয়েকটা হ্যাণ্ডগ্রেনেড, একটা রাইফেল আর একটা বন্দুক পাওয়া গেছে, এবং প্রমাণ হয়ে গেছে যে, বন্ধুটি এই অস্ত্রাগারের মালিক। মকদ্দমায় সে বলেছিল, অস্ত্রাগারটা তার নয়, এমন-কি, বাড়িটাও না। বাড়িটা তার স্ত্রীর নামে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, বিচারক ঐসব অস্ত্রশস্ত্র দেখেই আঁতকে উঠেছিলেন এবং তিনি যে-ই সুযোগ পেয়েছেন, অমনি তাকে দু বছরের কয়েদ শুনিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঐসব অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি বদ্রীপালোয়ানের কোনো আগ্রহ নেই,

তবু তিনি বন্ধুর সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন মনে করলেন। বন্ধুটি হাইকোর্টে আপিল করেছে এবং এখন জামিনে খালাস আছে। অনেকবার সে বদ্রীকে বলেছে, হাইকোর্টে হেরে গেলে সুপ্রিমকোর্টে যেতে হবে। সবেতেই অনেক টাকা খরচ হবে; আর তা তাকেই দিতে হবে। কারণ, আজকাল কেউ কারও নয়।

বদ্রী এ কথার অর্থ করল, এই মকদ্দমাবাজির খরচ সূর্য ডোবার পর আশপাশের রাস্তা দিয়ে যেসব পথিক যাওয়া-আসা করবে তাদেরই দিতে হবে। বদ্রীপালোয়ান লুঠপাটের ব্যাপারটাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, তাই তিনি বন্ধুকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "টাকার চিন্তা কোরো না, সব ভগবান দেবেন।"

বন্ধুটি মুচকি হেসে জবাব দিল, "যা কিছু আছে, সবই ভগবানের দেওয়া।"

কথাটা বলেই সে চালের খড়ের মধ্যে গোঁজা একটা কাপড়ের পোঁটলা বার করল। পোঁটলার মধ্যে অনেক টাকার নোট। তার মধ্যে থেকে দু হাজার টাকার নোট সে বদ্রীর হাতে দিয়ে বলল, "তোমার কাছে রেখে দাও। আমার কী! আমার তো এক পা এখানে, আর এক পা জেলে। হাইকোর্টে আপিল খারিজ হয়ে গেলে জামিনও ঐখানে শেষ হয়ে যাবে। তখন এই টাকা দিয়েই সুপ্রিমকোর্টে যাবার ব্যবস্থা কোরো। এর মধ্যে ভগবান যদি আরও দু-চার হাজার টাকার হিসাব করে দেন তো তা-ও তোমার কাছে পৌঁছে দেব। আমার দিন খারাপ চলছে, এক ভগবান আর এক তোমরা আমার সহায়।"···

এইভাবে ভগবানের আলোচনা শেষ করে বদ্রীপালোয়ান যখন বাড়ি ফিরে এলেন তখন পরের গচ্ছিত টাকা হলেও তাঁর পকেটে

দু হাজার টাকা রয়েছে।···তিনি বৈদ্যজীকে তাঁর বন্ধুর বিপদের কথা শোনালেন। তারপর বললেন, "হয়তো সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাবার দরকার হবে, আর তখন আমাকেও কিছু দৌড়ঝাঁপ করতে হবে।"

বৈদ্যজী পড়ন্ত গলায় জবাব দিলেন, "আমি কী বলব! যা ইচ্ছে হয়,···।"

বদ্রী চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকালেন। তাঁর মাথার পাগড়ি নেই, তার গোঁফ এলোমেলো। বদ্রী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বুঝতে পারলেন, বৈদ্যজীর মনটা ভালো নেই।

তিনি ভেবে ভেবে বৈদ্যজীর মন খারাপ হবার কারণ খুঁজতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর খেয়াল হ'ল, এদিকে তিন-চারদিন হ'ল কয়েকজন লোক অনেক অন্যায় কাজ করেছে।

প্রিন্সিপাল শহরে গিয়ে ডেপুটি-ডাইরেক্টর অভ এডুকেশনের কাছে কলেজ সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট লিখিয়ে এসেছেন। রিপোর্ট অত্যন্ত সুন্দর অক্ষরে লেখা হয়েছে তার ভাষা প্রাঞ্জল এবং শৈলী অলংকারপূর্ণ। বৈদ্যজীর সৌন্দর্য নিরূপণ করে তাঁকে এই রিপোর্টে এখানকার নরকেশরী বলা হয়েছে। রিপোর্টে এ-ও ভালোভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, বৈদ্যজীকে সর্বসম্মতিক্রমে, "সানন্দে" ম্যানেজারের পদে পুনর্নির্বাচন করা হয়েছে। কিন্তু তাতে এ কথা লেখা হয় নি যে, কয়েকজন সদস্যকে কলেজের বাইরে পিস্তল দেখিয়ে ধমকানো হয়েছে, তাঁদের ভেতরে যেতে দেওয়া হয় নি।

এই লিখিত প্রমাণের পরেও ডেপুটি-ডাইরেক্টর রামাধীন ভিখমখেড়বীর এই অভিযোগের তদন্ত করতে চান যে, পিস্তলের জোরে

আতঙ্কপূর্ণ পরিবেশে ম্যানেজার নির্বাচন হয়েছে। তদন্তের অবকাশ না থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রিন্সিপালকে নোটিস দিলেন যে, তিনি নিজে এই অভিযোগের তদন্ত করবেন। তদন্তের একটা তারিখও ধার্য করে দিলেন।

খান্না মাস্টারও ডেপুটি-ডাইরেক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করেছেন। কতকগুলো অভিযোগের মধ্যে তিনি এই অভিযোগও করেছেন যে, এখানকার অধ্যাপকরা যা মাইনে পান তার দ্বিগুণ অঙ্কে তাঁদের দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হয়। শতকরা সত্তরটা কলেজেই এইরকম হয়ে থাকে এবং এইরকম সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়। কিন্তু ডেপুটি-ডাইরেক্টর প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি এই অভিযোগেরও তদন্ত করবেন। সারা পৃথিবীতে একটা অটল নিয়ম আছে যে, রসিদে যত টাকা লেখা থাকে, রসিদটা তত টাকারই মনে করা হয়। কিন্তু এই লিখিত প্রমাণ সত্ত্বেও ডেপুটি-ডাইরেক্টর তদন্ত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।

মালবীয় মাস্টারের দুশ্চরিত্রতার বিষয়ে কেউ একটা অনামা কাগজ ছাপিয়েছে। অভিযোগ সত্যি হোক কি মিথ্যে, অনামা অভিযোগ কাপুরুষতার কাজ। কোনো বালকের সঙ্গে ব্যভিচার করাও কাপুরুষতা আর মালবীয় যদি তা করে থাকেন তা হলে খোলাখুলি-ভাবে এর নিন্দা করা উচিত ছিল। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, খান্না মাস্টার কয়েকজন ছেলেকে দিয়ে সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করতে চলেছেন যে, এই কাগজটা প্রিন্সিপাল ছাপিয়েছেন। রুপ্পন কিছু বলছেন না, কিন্তু শোনা যাচ্ছে, তাঁর সাহায্যেই খান্না কাগজ ছাপানোর প্রমাণ পেয়েছেন। কয়েকজন ছাত্রকে ধমকে তাদের

দিয়ে অভিযোগ করানো হয়েছে যে, কলেজে সব কিছুই হয়, একমাত্র পড়াশোনা ছাড়া। বেচারা মাস্টার মোতিরামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, ক্লাসে তিনি বিজ্ঞান নয়, আটা চাকির কারবার শেখান। এসবের কোনো লিখিত প্রমাণ নেই, তবে এসবেরও তদন্ত হবে।

এদিকে রঙ্গনাথও এখন মাঝে মাঝে খান্নার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেছে। এখানে রঙ্গনাথের স্বাস্থ্যের উন্নতি অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু মস্তিষ্ক দূষিত হয়ে গেছে।

কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর যুধিষ্ঠিরের বাপ। সে এই বলে ওপরে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে যে, রামস্বরূপ সুপারভাইজার যে দু হাজার টাকারও বেশি চুরি করেছে, সে বৈদ্যজীর জ্ঞাতসারেই করেছে, এবং সেই টাকা সে বৈদ্যজীর কাছ থেকেই আদায় করার কথা বলেছিল। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসাবে বৈদ্যজী ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন সেই রিপোর্ট লিখিত হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রাহ্য হয় নি এবং অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ইন্সপেক্টরকে বদলি করা যাচ্ছে না। তা ছাড়া তিনি লিখে দিয়েছিলেন যে, ইন্সপেক্টর মদ খায়। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কো-অপারেটিভ বিভাগে অগ্ন্যুৎপাত তো দূরের কথা, সামান্য ভূমিকম্পও হয় নি।

বদ্রীপালোয়ান তাঁর বাবার কাছে তক্তপোষের ওপর একটা পা রেখে সেই পায়ের হাঁটুর ওপর একটা হাতের কনুই রেখে আর হাতের ওপর থুতনি রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। সব কথা শুনে তিনি বললেন, "ব্যস?"

বৈদ্যজী বললেন, "তুমি একে 'ব্যস' বলছ? আমার সেবার এই পুরস্কার?"

বদ্রীপালোয়ান পুরস্কারের অংশটা না-শোনা করে বললেন, "এই ঝগড়া তো দশমিনিটে শেষ করে দেওয়া যায়। কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টরকে দশ ঘা জুতো মারলেই ঠিক হয়ে যাবে। ডেপুটি ডাইরেক্টর যদি কথা না শোনেন আর তদন্ত করতে আসেন তো কাউকে দিয়ে তাঁকেও ভরত-মিলাপ করিয়ে দেব। খান্না মাস্টারের ব্যাপারে হুকুম দিয়ে দেব যে, তিনি আর তাঁর দলের লোকেরা কাল থেকে যেন কলেজের ভেতরে না যান, সবাইকে একেবারে গরহাজির বানিয়ে পনেরো দিন পরে বাইরে বার করে দেব।"···

বৈদ্যজী বাধা দিয়ে বললেন, "সে কেমন করে হতে পারে?"

"প্রিন্সিপাল করবে। ত্রিপাঠীজীকে গত বছর কীভাবে বার করে দিয়েছিল? তাঁকে একমাস গরহাজির রাখা হয়েছিল কি না?"

বৈদ্যজীর চোখেমুখে কিছুটা বিশ্বাসের ঝলক দেখে বদ্রী পালোয়ান বললেন, "তুমি এসব এমনিতে ছেড়ে দাও, প্রিন্সিপাল ঠিক করে নেবে। ছোটে এদিকে দু-তিনজন কুস্তিগীর তৈরি করেছে। কলেজের বাইরে ডিউটি লাগিয়ে দেব। খান্না কলেজের ভেতর ঢুকতে গেলেই জুতো খাবে। রঙ্গনাথ যতই খ্যাচম্যাচ করুক, তারজন্য কিসের ফিকির? শহুরে লোক, কোনো কাজের নয়। তুমি ওদিকে তাকিয়োই না। দেখো, ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে যাবে। বাকি থাকল রুপ্পন। তাকে দু-চার থাপ্পড় মারতে হবে। যবে বলবে, মেরে দেব।"

বৈদ্যজী বদ্রীর প্রতিরক্ষা-পরিকল্পনা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, "এখানে তো ঠিক হয়েই যাবে, কিন্তু ওপরের রাজনীতিতে গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে। এখন ছোটো ছোটো অফিসারদের সাহস বেড়ে গেছে। কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টরের

বদলি পর্যন্ত হচ্ছে না। এর পেছনে বড়ো বড়ো রাজনীতি আছে সেটাই চিন্তার বিষয়।"

বদ্রীপালোয়ান কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, "রাজনীতির কথা তুমি বোলো, আমি একটা কথা বলে দিয়েছি, ইন্সপেক্টরের ওপর দশ ঘা জুতো পড়বে। একটা কমও না, একটা বেশিও না।"

কিছুক্ষণ ভেবে একটা সংশোধন রাখলেন, "সে যদি ছুটি নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যায় তো জুতো মারার দরকার হবে না। ছেড়ে দেব।"

বদ্রী জামার পকেট থেকে কতকগুলো নোট বার করে বৈদ্যজীর হাতে দিতে দিতে বললেন, "এখানে তেরো শ টাকা আছে। শুনেছি, সন্ধির কিছু টাকা দারোগাবাবুও দিয়ে গেছেন। তার থেকে নিয়ে দু হাজার পুরো করে দাও। কো-অপারেটিভওয়ালারা চাপ দিলে আগেই জমা করে দেওয়া যাবে।"

বৈদ্যজী গম্ভীর হয়ে বললেন, "দারোগাবাবু যা দিয়েছিলেন তার মধ্যে থেকে তো কিছু যোগনাথকে দেওয়া হয়েছে। আর চার-পাঁচ শ মাত্র আছে। সে তো জনতার টাকা।"

"কো-অপারেটিভও জনতার।"

বৈদ্যজী বদ্রীর নোটগুলো ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, "এখন রেখে দাও, পরে দেখা যাবে।"

এরপরে আর বদ্রী তাঁর বন্ধুর কথা বলতে দাঁড়ালেন না। বাড়ির ভেতর যাবার আগে একবার বাবার দিকে ঘুরে তাকিয়ে এক আজব স্বরে ফিসফিস করে বললেন, "বাবু, গয়াদীনের সঙ্গেও কথা বলে নাও।"

বদ্রীপালোয়ান কয়েক বছর যাবৎ তাঁর বাবাকে কোনোরকম

সম্বোধন না করেই কথা বলেছেন। ছেলেবেলায় তিনি তাঁকে বাবু বলতেন, কিন্তু বড়ো হয়ে কুস্তি শুরু করার পর ঐ ছেলেমানুষি ডাক ছেড়ে দিয়েছেন।

বৈদ্যজী বদ্রীপালোয়ানের কথাটা শুনলেন, এবং কে জানে কেন, শোনার পর চোখ দুটো বন্ধ করলেন।

শিবপালগঞ্জের প্রতিটি বাচ্চার প্রাণিশাস্ত্রের এই নিয়মটা জানা আছে যে, হুঁশিয়ার কাক আবর্জনার ওপরই ঠোক্কর মারে। বৈদ্যজীর ওপরও তা-ই হ'ল।

এই কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। আগের ইন্সপেক্টর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করত, অর্থাৎ ইউনিয়নের বাড়িতে যখন ভাং বাটার আয়োজন হ'ত তখন শিলের ওপর নোড়ার চোট পড়তেই সে সবার আগে সেখানে গিয়ে হাজির হ'ত, এবং জনসাধারণের লোক হয়ে সেখানকার কাজে যোগ দিত। কিন্তু এই ইন্সপেক্টর ভাঙের শত্রু, তবে বৈদ্যজী যে খবর পেয়েছেন এবং সেই খবরের ভিত্তিতে ওপরে যে চিঠি লিখেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, সে মদের ভক্ত। মদের সঙ্গে সঙ্গে তার সততাও নষ্ট হয়ে গেছে, ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করার বদলে তাদের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছে। বৈদ্যজী ভেবেছিলেন, ইন্সপেক্টরটা বদলি হয়ে যাবে, কিন্তু কয়েকদিন পর্যন্ত যখন তাঁর চিঠির কোনো জবাব এল না তখন তাঁর চিন্তা হ'ল। খবর নিয়ে জানতে পারলেন, সমস্তটাই রাজনীতির খেলা, এবং যেভাবে রাজনীতির দ্বারা জন-সেবকদের বদলি হতে পারে, তেমনিভাবেই উচ্চতর রাজনীতির দ্বারা তা বন্ধ করাও যেতে পারে। তিনি বুঝতে পারলেন, ইন্সপেক্টরের

হাতে কেবল মদের বোতল আর কলমই নেই, রাজনীতির দড়িও পৌঁছে গেছে।

একদিন বৈদ্যজী একাই মৈত্রী সফরে বেরিয়ে পড়লেন। শহরে পৌঁছে সকাল থেকেই তিনি কয়েক ডজন বাংলোয় ঘুরলেন। কয়েকটা জায়গা ছাড়া যেখানে একঘণ্টা কি আধঘণ্টা বাইরে বসা অসম্মানজনক বলে মনে করা হয় না, সেখানে তিনি সাদর অভ্যর্থনা লাভ করলেন এবং তাঁর আহত আত্মবিশ্বাস তাঁর ভেতরে আর-একবার ফড়্‌ফড়্‌ করে উঠে দাঁড়াল। অনেক বাংলোয় লোকে তাঁর কাছ থেকে বীর্যপুষ্টির ওষুধ পেয়ে খুশি হ'ল। অনেককে ওষুধের সঙ্গে এ কথাও বলতে হ'ল যে, কিছুদিন আগে একজন বড়ো জ্যোতিষীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে, এখন শ্রীমান্ যদি তাঁর কোষ্ঠীটা একবার দেন তো তাঁকে দিয়ে বিচার করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিছু লোকের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য ওষুধ আর জ্যোতিষীই হ'ল না, তাদের বলতে হ'ল হৃষীকেশের অমুক মহাত্মা অমুক দিন এখানে আসবেন। হ্যাঁ, সেই মহাত্মা, যাঁর আশীর্বাদে অমুক পুলিস অফিসারের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাঁর তখন পদোন্নতিও হয়েছে। তিনি এখানে এলে তাঁর সঙ্গে দশটার পরে দেখা করাই ভালো এখন শ্রীমান্ যদি চান তো পরিচয় করানোর জন্য সেদিন আমিও আসব।

এইভাবে উচ্চ স্তরের কয়েকজন রাজনীতিক আর অফিসারকে পরাস্ত করার পর তিনি সেই বাংলোয় গিয়ে পৌঁছুলেন, যেখান থেকে কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টরের রক্ষাকবচের আদেশ বার হচ্ছে। সেখানে তিনি জানতে পারলেন, সমবায় আন্দোলনে এখন এক নতুন চিন্তা সঞ্চারিত হয়েছে, যাতে ভাই-ভাইপোবাদ, জাতিবাদ, সমাজবাদ

প্রভৃতি উচ্চবর্গের নীতিগুলোকে একসঙ্গে জড়িয়ে ভবিষ্যতের কর্ম-কর্তাদের প্রেরণার স্তোত্র হবে। চিন্তাটা অনেকটা এই রকম : যদি তোমার হাতে ক্ষমতা থাকে তো সেই ক্ষমতাটা আরও বাড়াবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে' তার প্রয়োগ কোরো না, বরং তার সাহায্যে কিছু নতুন আর বিরোধী শক্তি তৈরি করো আর তাদের এতখানি মজবুত করে তোলো, যাতে তারা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। এইভাবে তোমার ক্ষমতা সুরক্ষিত আর সবার চেয়ে বেশি থাকবে। যদি তুমি কেবল তোমার ক্ষমতার উন্নতির জন্যই চেষ্টা করো আর অন্যসব পরস্পর-বিরোধী শক্তির সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নিয়ন্ত্রণকর্তা হতে না পারো তা হলে কিছুদিন পরে কোনো কোনো শক্তি কোনো অজ্ঞাত, অপ্রত্যাশিত 'কোণ থেকে লাফিয়ে তোমার ওপরই হামলা করবে আর তোমার ক্ষমতাটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

এই নীতি কার্যকর করতে গিয়ে দেখা গেল, এই বাংলোয় এখন কেবল বৈদ্যজীর দলের লোকদেরই সুপারিশ শোনা হয় না, বিরোধী দলের লোকদেরও সুপারিশ শোনা হয়ে থাকে। এবং যেহেতু কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টরের বদলি আটকানোর সুপারিশটা এখন বিরোধী-দলের নায়কের তরফ থেকে এসেছে আর যেহেতু ঐ নায়কের ক্ষমতা আর-একটা বিরোধীদলের নায়ককে জব্দ করার জন্য প্রয়োগ করতে হবে, তাই বৈদ্যজী কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টরের বদলির জন্য আমরণ অনশন করলেও এখন তার বদলি হওয়া অসম্ভব।

এসব কথা বৈদ্যজীকে কেউ বলে নি। এই ধরনের বাংলোয় অনেক ব্যাপার শুধু দেখেশুনে আর শুঁকেই বোঝা যায়। তাই বৈদ্যজী ওখানে পৌঁছেই সব বুঝে ফেললেন। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। তিনি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু কথা

বাড়তেই থাকল। তিনি বললেন, আমাদের ইউনিয়নে চুরির মতো চুরি হয় নি। হলেও চোর বেপাত্তা হয়ে গেছে আর শাসনতন্ত্রের অকর্মণ্যতার দরুন এখনও পর্যন্ত সে ধরা পড়ে নি। এই ঝগড়া-বিবাদের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। যদি কোনো সম্পর্ক প্রমাণ হয় তা হলে তিনি যত টাকা বলা হবে, তত টাকা দান হিসাবে ইউনিয়নকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু তার আগে ইন্সপেক্টরের বদলি হওয়া চাই। তাঁকে যা কিছু করতে বলা হবে, তিনি তা করার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু শর্ত এই যে··· ।

বৈদ্যজীকে বলা হ'ল, জনসাধারণের সামনে আমাদের আদর্শ স্থাপন করা উচিত। তা না করলে জনসাধারণের আচরণ খারাপ হয়ে যাবে। তা খারাপ হলে সারা দেশ খারাপ হবে, বর্তমান খারাপ হবে, ভবিষ্যৎ খারাপ হবে। রামচন্দ্র কী করেছিলেন? সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন কিনা? আর তা-ই তো আজও আমরা রামরাজ্যের কথা বলি। ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করতে হয়, এই আমাদের আদর্শ। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"— এ কথাও বলা হয়েছে। আজও সকল যশস্বী নেতা এই করে থাকেন। ভোগ করেন, তারপর ত্যাগ করেন, তারপর আবার ত্যাগের দ্বারা ভোগ করেন। অমুক অর্থমন্ত্রী কী করেছেন? পদত্যাগ করেছেন কি না? অমুক রেলমন্ত্রীও তা-ই করেছেন আর অমুক তথ্যমন্ত্রীও তা-ই করেছেন। এখন এই দেশে, এই রাজ্যে, এই জেলায়, এই কো-অপারেটিভ ইউনিয়নে এই রকম ত্যাগের দরকার। অভিযোগ-গুলোর প্রকাশ্য তদন্ত হবে, তার জায়গায় এ-ই অনেক ভালো যে, বৈদ্যজী জনসাধারণের সামনে আদর্শ স্থাপন করুন। আদর্শের ইমারত খাড়া করতেই তার ভিত্তির নিচে সমস্ত অভিযোগ চাপা পড়ে যাবে।

সুতরাং বৈদ্যজীর উচিত ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পদে ইস্তফা দেওয়া। তাঁর বিরুদ্ধে যে রিপোর্ট এসেছে, এইটেই তার উপযুক্ত জবাব। তিনি ইচ্ছে করলে এই পদত্যাগপত্র কোনো অবস্থার বিরুদ্ধে দিতে পারেন, কোনো সহকর্মীর নীচতার বিরুদ্ধে দিতে পারেন, আবার কোনো নীতি রক্ষা করার জন্যও দিতে পারেন। যদি তিনি পদত্যাগপত্র দেন তাহলে তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু পদত্যাগপত্রের সঙ্গে যদি-টদি থাকা চলবে না। হলে কেবল পদত্যাগপত্রই হবে, নয়তো কিছু না। কিন্তু যদি কিছু হয় তো অনেক কিছুই হবে, যা কখনও বৈদ্যজীর ভালো লাগবে না!

বৈদ্যজী মনস্থির করে ফেললেন। তিনি বললেন, "আমি পদ-ত্যাগপত্র দেব। সম্ভবত এটাকে আমার দুর্বলতা বলে মনে করা হবে, তবু এই নিরর্থক প্রচারের বিরুদ্ধে, আপনার প্রস্তাবমতো আমি পদত্যাগপত্র পেশ করব। কিন্তু প্রাদেশিক ফেডারেশনের প্রার্থী মনোনয়নের প্রশ্ন যখন আসবে··· ।"

তাঁকে বোঝানো হ'ল, সুযোগ এলে সব মহাপুরুষই যেমন জনসাধারণের কাছে আদর্শ স্থাপন করার পদত্যাগপত্র পেশ করে থাকেন তেমনি ঐ একই উদ্দেশ্যে তিনিও নিশ্চিন্তে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারেন। যোগ্য লোকের অভাব রয়েছে। তাই যোগ্য মানুষের কোনো জিনিসের অভাব থাকে না। তাঁরা একদিক থেকে বেরুলে আর-এক দিকে ধরা পড়ে যান।

আজ মৈত্রী সফরে বেরিয়ে বৈদ্যজী বীর্যপুষ্টির ওষুধ, জ্যোতিষীর খবর আর সাধুদের সঙ্গে মধ্যস্থতা— এই তিনটি বিষয় ছাড়াও আর-একটা কথা বলে চলেছেন। তাই এই বাংলো থেকে বেরুবার আগে

এখানেও তিনি ঐ কথাটা বললেন, "আপনি শুনে খুশি হবেন, আমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের অসবর্ণ বিবাহ দেবার কথা ভাবছি। এখনও কথা পাকা হয় নি, তবু আশা করছি, শিগ্‌গিরই নিমন্ত্রণপত্র পাঠাতে পারব। আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয় হবে। হয়তো তখন ব্যক্তিগত-ভাবে নিমন্ত্রণ করতে আসতে পারব না, তাই এখনই বলে যাচ্ছি। এইরকম আদর্শ বিবাহে আপনাদের সহযোগিতা এবং আশীর্বাদ পাওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। আপনি এ কথা শুনেও খুশি হবেন যে,··· ।"

এ কথা শুনে তিনি খুশি হয়েছেন। তিনি অবশ্যই উপস্থিত হবেন।

কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের বার্ষিক জলসা খুবই সফল হয়েছে, কারণ এ বছর শহর থেকে মিষ্টি আনানো হয়েছিল। ইউনিয়নের বাড়িতে অনেক ঝাণ্ডা লাগানো হয়েছিল, আর ফুলের মালাও ছিল রাশি রাশি। কিছুদিন আগে যে অফিসারটি কো-অপারেটিভ ফার্মের উদ্‌বোধন করেছিল তাকেও এই জলসায় ডাকা হয়েছিল। পাবলিকের মাঝে বক্তৃতা দেবার আর মালা পরার রক্ত অনেক আগেই তার মুখে লেগেছিল। এবার এই জলসার কথা শুনতেই সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পাতলুন পরে আর-একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তার মোটর চেয়ে নিয়ে পোঁ পোঁ করতে করতে জলসায় এসে পৌঁছে গেল।

ইউনিয়নের বার্ষিক রিপোর্ট না পড়েই পড়া হয়েছে বলে স্বীকার করে নেওয়া হ'ল। ব্যবসায় লাভ হয়েছিল, মেম্বারদের তার ভাগ পাবার কথা ছিল। তারা তা না পেয়েই পেয়ে গেল। অনেক

কিছুই না হয়েই হয়ে গেল। শেষে যা হওয়া জরুরি ছিল তা-ই হতে লাগল : বক্তৃতা শুরু হ'ল।

বক্তৃতার মাহাত্ম্য দেবার মধ্যে, নেবার মধ্যে নয়। তাই একদিকে লোকে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে আর অন্যদিকে বাকি সবাই অন্যসব সমস্যা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছে। যেমন, শহর থেকে আগত অফিসারটি যখন বলল, বৈদ্যজী কো-অপারেটিভের প্রতিমা, তখন লোকে প্রতিমার অর্থ জিজ্ঞাসা না করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে, বদ্রী পালোয়ান গয়াদীনের মেয়েটার সঙ্গে ফেঁসে গেছে। তারপর অফিসারটি বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিটি গ্রামে এইরকম প্রতিমা সৃষ্টি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কো-অপারেটিভ আন্দোলনের উন্নতি হওয়া কঠিন। এতেও লোকে না কো-অপারেটিভের অর্থ জানতে চাইল, না আন্দোলনের। তারা এইটুকু বলে থেমে গেল যে, কথা চাপা দিলেও চাপা থাকছে না, তাই বিয়ে করতে যাচ্ছেন। এইসব কানাঘুষো সত্ত্বেও কেউ খোলাখুলিভাবে কোনো দুঃখদায়ক কথা বলল না, কারণ এখনও যদি কোথাও চক্রবর্তী রাজ্য থেকে থাকে তো আছে ইউনিয়নে আর সে রাজ্য যদি কারও থেকে থাকে তো আছে বৈদ্যজীর।

তবু রামরাজ্যে যেমন দুঃখজনক কথা বলার জন্য একজন ধোপা ছিল, এখানেও তেমনি একজন উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল উত্তেজনাভরে বলল, "আমিও বক্তৃতা দেব।"

লোকটার ধারেকাছে যারা বসে ছিল তারা তার ধুতি ধরে টানতে লাগল, যাতে সে ধুতির টানে অন্তত বসে পড়ে। লোকটা রামাধীন ভিখমখেড়বীর দলের এবং সে সমস্ত কাজ নির্দেশমতো করার জন্য তৈরি হয়ে এসেছে। তাই সে ধুতির পরোয়া করল না,

বরং ধুতি ধরে টানায় তার উৎসাহ আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল আর সব বক্তৃতা ছাপিয়ে সে সজোরে বক্তৃতা দিল, "আমিও বক্তৃতা দেব।"

জোরে বলার সেই ফল হ'ল, যা সাধারণত হয়ে থাকে। বিপক্ষ ধীরে ধীরে বলতে লাগল। শহর থেকে আসা অফিসারটি বলল, "দেবে, নিশ্চয় দেবে। কে মানা করছে!"

লোকটা তার উৎসাহ বজায় রাখার জন্য "মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ" পর্যন্ত বলল না। একবারেই সে তার কথায় চলে গেল, "এই রিপোর্টে, কী নাম ওর, চুরির কথা বলা হয় নি। এখানে এক লুচ্চা সুপারভাইজার ছিল, কী নাম ওর, তার নাম রামস্বরূপ। শালা চুরি করল, কী নাম ওর, দু গাড়ি গম বোঝাই করে শহরে পালিয়ে গেল। মদ খেত, কী নাম ওর, বেশ্যাবাড়িও যেত। বৈদ্যজী পর্যন্ত তার মুখে মুখ লাগিয়ে, কী নাম ওর, কথা বলতেন। একদিন রাত্রে দুটো গাড়ি এল, কী নাম ওর, রাতভর বোঝাই হ'ল, কেউ জানতেও পারল না। কী নাম ওর, শালা বড়ো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত। আমাকে দেখলেই দূর থেকে, কী নাম ওর, নমস্কার করত। বৈদ্যজীর সঙ্গে, কী নাম ওর, কেউ কিছু মনে করবেন না, আমি বলি আর না-ই বলি, সারা দুনিয়া বলছে, খুব মাখামাখি ছিল। দু হাজার টাকা বেমালুম হাওয়া করে দিল শালা, কী নাম ওর, দা-দা-দা-দা-দায়ী হবে কে? কো-অপারেটিভ খুব ভালো প্রতিমা, কী নাম ওর, প্রতিমা মাথায় করে এখন ঘোরো। বৈদ্যজীকে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না, কে কোথায় যাচ্ছে। মিষ্টি খাও, তারপর কী নাম ওর, জল খেয়ে বাড়ি যাও। এতে করে, কী নাম ওর, দেশ উদ্ধার হবে না। দেশে দেশের চলন চলতে হবে, কী করে চুরি হ'ল তার তদন্ত

করতে হবে। আমি লেখাপড়া জানি না, তাই কিছু মনে করবেন না— হোলি হ্যায়, হোলি হ্যায়··· ।”

জোর বক্তৃতা চলছে। লোকে পিছু তাড়া করলেও থামছে না। তখন বৈদ্যজী উঠে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই বক্তা একটুখানি লাফাল-ঝাঁপাল। তারপর লেজ নেড়ে মাটিতে বসে পড়ল।

বৈদ্যজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মুচকি হাসলেন। প্রমাণ হয়ে গেল যে, চুরির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। তারপর তিনি ঋষি-সুলভ ভাষায় বলতে আরম্ভ করলেন, “চুরি কী করে হয়, চিন্তা করা দরকার। ধরুন, আপনার কাছে আপনারই এক হাজার মুদ্রা আছে। আপনি তা চুরি করতে পারেন না। ঐ মুদ্রা আপনার, সুতরাং চুরি আপনি করতে পারেন না। আপনি তা অপব্যয় করতে পারেন, কিন্তু চুরি নয়। চুরি সে-ই করতে পারে, যার নিজের মুদ্রা নয়। সমবায়ে কারও নিজের সম্পত্তি থাকে না। তা সকলের সম্পত্তি হয়ে যায়। কয়েকজন লোকের সম্পত্তি এক স্থানে একত্র করা হয়। সে-ই তা সুরক্ষা করে, যার সম্পত্তি নয়। সম্পত্তি তার নয়, কিন্তু তার সুরক্ষার জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়। যদি সে তা অপব্যয় করে তা হলে তা চুরি হয়। লক্ষ্য করুন সজ্জনবৃন্দ, আপনার সম্পত্তি যদি আপনি অপব্যয় করেন তো তা চুরি নয়, অন্যে করলে চুরি। সমবায়ের সম্পত্তি কোনো ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নয়, সুতরাং তার অপব্যয় বা অপব্যবহার এমন কেউ করে, যার সম্পত্তি নয়। এইভাবে প্রমাণ হ’ল যে, সমবায় সম্পত্তির অপব্যয় হয় না। যদি কিছু হয় তো সবসময় তা চুরিই হয়। সমবায় সম্পত্তির এ-ই পরিণতি। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সমবায় সম্পত্তির সঙ্গে চুরি শব্দ যোগ করতে দেখে

ঘাবড়ানোও উচিত নয়। কোথাও কোথাও চুরি হলে তা লুকোনো হয়। দোষ লুকোনো উচিত নয়, তাতে শেকড়ে ঘুণ ধরে। আমরা এই নীতিই মেনে থাকি। যে সমবায় ইউনিয়নে চুরি ধরা না পড়ে তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। প্রায়শই ওখানে হিসাবের কারচুপি করে চুরি গোপন করা হয়। এখানে কিছুই গোপন করা হয় নি। এখানকার ব্যবস্থা ভালো। এখানে চুরি হয়েছে। কিন্তু হয়েও হয় নি, কারণ পরিণাম ভালো হয়েছে। বছরের শেষে ইউনিয়নের লোকসান হয় নি, লাভ হয়েছে। লাভ এক পয়সারই হোক, কি এক কোটি টাকার— লাভ লাভই আর লোকসান লোকসানই। এখানে লোকসানের প্রসঙ্গ ওঠে না। ওঠে লাভের প্রসঙ্গ। এই রকম পরিস্থিতিতে চুরির কথা নিরর্থক। এখানে ও প্রশ্ন তোলা ইউনিয়নের অপমান করা। এটা সমবায়ের অপমান। আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযোগ করা অনুচিত। ব্যক্তিগত অভিযোগ করা আরও অনুচিত। এই পরিবেশের মধ্যে কেউই কাজ করতে পারে না। ভদ্রলোকেরা তো মোটেই পারে না। আমি এই ধরনের অভিযোগের প্রতিবাদ করছি। কিন্তু লক্ষ্য করুন, অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি, অভিযোগ-কারীর বিরুদ্ধে নয়। অভিযোগকারী হচ্ছেন শ্রীরামচরণ। আমি তাঁকে সম্মান করি। তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। তবু আমি তাঁর অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রবলভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আর প্রতিবাদস্বরূপ আমি এখানকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পদে ইস্তফা দিচ্ছি।”

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে বৈদ্যজী চুপ করে তাঁর জায়গায় বসে পড়লেন।

এরপর সবকিছুই তাড়াতাড়ি হতে লাগল। খুব চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল, যেন কোনো মেম্বারকে বিধানসভা থেকে টেনে বার করে দেওয়া হচ্ছে। তারপর চেঁচামেচি কমলে শহরের অফিসারটি গম্ভীর স্বরে বলল, "বৈদ্যজী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তাই আমার পরামর্শ হচ্ছে, তাঁর ইস্তফা মঞ্জুর করা হোক। এমনিতেই আজ সামনের বছরের নির্বাচন হবার কথা আছে। এই ইস্তফার অর্থ হচ্ছে, বৈদ্যজী আর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হতে চান না... ।"

বৈদ্যজী বসে বসেই বললেন, "আমি সদস্যও থাকতে চাই না। আমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে। এখন তরুণদের আসা উচিত। তাদেরই এই আন্দোলন চালানো উচিত।"

শহরের অফিসারটি বোঝাল, "আমি বলি, আপনি এতটা দূরে সরে যাবেন না, নইলে এই ইউনিয়ন উঠে যাবে। আপনি তরুণদের কথা বলছেন, এ যুগে তারা আছে কোথায় ?"

কিন্তু বৈদ্যজী কথা শুনলেন না। তিনি এ কথায় অটল রইলেন যে, এ যুগেও তরুণদের থাকা উচিত আর তাদেরই আন্দোলন চালানো উচিত।

শেষে শহরের অফিসারটি বলল, "তা হলে নতুন ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নির্বাচন হোক।"

এ কথা বলেই তিনি আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "ভাইয়েরা, এই ইউনিয়নের একটা রীতি যে, এখানে সব নির্বাচনই সর্বসম্মতিক্রমে হয়ে থাকে। আমার শুধু আশাই নয়, পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, আজও সেই রীতি অনুসারে কাজ হবে। আপনারা কোনো নাম... ।"

হঠাৎ ছোটে পালোয়ান তাঁর লুঙ্গিসুদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। বাধা

দিয়ে বললেন, "নির্বাচন-টির্বাচনে কী হবে সাহেব! ব্যাঙ্কের মতোই তো এই ইউনিয়ন। এতেও তুমি নির্বাচন করাতে চলেছ!"

ছোটে পালোয়ান এর পরে একটা প্রবাদবাক্য শোনালেন, যেটা শুনে আশপাশের সবাই হাসতে লাগল। অফিসারটি মনে করল, ছোটে পালোয়ান তার সম্বন্ধে কোন অশ্লীল কথা বলেছেন। অফিসারটি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "পালোয়ানজী, আপনি ভুল বুঝেছেন···।"

ছোটে পালোয়ান কঠিন হয়ে বললেন, "আমি তো ভুল বুঝবই। তুমি পাতলুন পরেছ, সাহেব! ঠিক কথা তো তুমিই বুঝবে।"

অফিসারটি খোশামোদের সুরে জবাব দিল, "একটু শুনুন পালোয়ানজী! আমি নির্বাচনের বিরুদ্ধে বলছিলাম যে, এখানে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার রীতি নেই। এখানে সব কিছুই সর্বসম্মতিক্রমে হয়ে থাকে। নির্বাচন···।"

ছোটে পালোয়ান বুকটা ফুলিয়ে সজোরে বলে উঠলেন, "তুমি আবার ঐ নির্বাচন-নির্বাচন করছ সাহেব। নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ! আমি বলে দিয়েছি, নির্বাচন-টির্বাচন হবে না। তার দরকার নেই। বৈদ্যজী না থাকতে চান, থাকবেন না। যে দেশে মুর্গি নেই সে দেশে কি ভোর হয় না?"

এখন বোধহয় বিকেল চারটে। ধুলো উড়িয়ে জোরে বাতাস বইছে। ছোটে পালোয়ান ধুলো থেকে বাঁচার জন্য চোখ পিটপিট করছেন আর নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে হেলছেন দুলছেন, আর উৎসাহের প্রাবল্যে চিৎকার করছেন। উৎসাহ আর চিৎকারের কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না, তবু তাঁর উৎসাহ বেড়ে চলেছে আর গলার স্বর জোর হচ্ছে। সেই অনুপাতে জনতাও উৎসাহিত

হয়ে চলেছে আর অফিসারটি বেশি করে ঘাবড়ে যাচ্ছে। ছোটে যেন কোনো কাল্পনিক সৈন্যদলকে রণক্ষেত্রে দৌড়ে এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন এমনিভাবে বললেন, "বৈদ্যজী সরে গেছেন, কোনো চিন্তা নেই। তাঁর জায়গায় চট করে অন্য লোক বসে পড়ছে। কিসের নির্বাচন ? হুঁঃ ! বড়ো নির্বাচন করতে এসেছেন ! এইরকম তিড়িবাজি শহরেই চলে, এখানে চলবে না। এখানে তো যাকে ইচ্ছে বৈদ্যজীর জায়গায় বসিয়ে দেওয়া যায়। ওঠো বদ্রী ওস্তাদ। তুমিই বসে পড়ো। ওঠো, ওঠো, ওস্তাদ। ধরো চট করে।"

হৈ-হট্টগোলের মধ্যে অত্যন্ত জোরে জোরে স্লোগান উঠল, "বলো ভারত মাতা কী জয়।" তারপর সেই পুরনো প্রথা, "বলো মহাত্মা গান্ধী কী···", "পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কী···", "বৈদ মহারাজ কী···", "পালোয়ান কী···", "ইদরিস সাহেব কী··· ।"

ইদরিসসাহেব, অর্থাৎ শহর থেকে আসা অফিসারটি থ' বনে গেছে। তার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। যখন তার হুঁশ হ'ল, দেখল, বৈদ্যজী কোথায় চলে গেছেন, তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ রামচরণকে কে একজন হাত ধরে ফটকের বাইরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বদ্রী পালোয়ান মালা পরে মঞ্চের ওপর তার পাশে বসে আছেন, তাঁর চোখেমুখে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পদের আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

সাতাশ

এ বছর রবি ফসল খুব ভালো হয়েছে।

শীতের সময় থেকেই বৃষ্টি হয়েছে। খালের বড়ো সাহেব, যে জনসাধারণকে ঘাসকুটো আর গণতন্ত্রকে প্লেগ মনে করত, তার বদলি হয়ে গেছে। তার জায়গায় এখন এমন একজন অফিসার এসেছে, যে খালের জলকে জলের মতোই খরচ করেছে আর তা সব জায়গায় পেঁৗছে দেবার চেষ্টা করেছে। বসন্তকালে পশ্চিম বাতাস জোরে বয় নি। পঙ্গপাল আর ইঁতুরের প্রকোপ হয় নি। যে তুজন বিখ্যাত গুণ্ডা লাঠির জোরে তাদের গোরু-মোষ দিয়ে ক্ষেতের সবুজ ফসল চরিয়ে দিত তাদের একজন একটা ট্রাকের নিচে পিষ্ট হয়ে মারা গেছে, আর-একজন হাজতে চলে গেছে। এমন কোনো ফৌজদারী হয় নি, যাতে গ্রামের অর্ধেক লোককে ক্ষেতের কাজ ছেড়ে জেলে বন্ধ থাকতে হয়েছে। পারস্পরিক শক্রতায় কেউ কারও খামারে আগুন লাগায় নি।

গ্রামের ধারে এক জঙ্গলের মধ্যে কিছু ভবঘুরে এসে আস্তানা গেড়েছিল। তাদের মেয়েরা বেশ যুবতী, দেখতে-শুনতেও ভালো। তারা কাঁচা মদ তৈরি করত আর শস্তা দামে তা বিক্রি করত। ওদিক দিয়ে যে সব ছেলে যাওয়া-আসা করত তাদের তারা ভেড়া

বানিয়ে ঘরে বেঁধে রাখত। ফসল মাড়াই করার জন্য যখন তাদের ক্ষেতে যাওয়া জরুরি হ'ত তখন তারা ঐ সব ঘরের মধ্যে বাঁধা অবস্থায় চিঁ চিঁ করত।

এ বছর পুলিস প্রথমে ঐ সব মেয়েদের ওপর হস্তক্ষেপ করল, তারপর কাঁচা মদের ওপর, এবং শেষে ভবঘুরেদের পুরো জীবনযাত্রার ওপর হস্তক্ষেপ করে তাদের এই অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দিল। এইভাবে কেবল আমবাগানের নিরন্তর জুয়া ছাড়া ছেলের দল ও ক্ষেতের মধ্যে আর কোনো বাধা থাকল না। তাই ছেলেরা মন দিয়ে ক্ষেতের কাজ করল।

তাই ফসল এবার ভালো হয়েছে। লোকে যে মনে করছে, হঠাৎ এবার ফসল ভালো হয়েছে, তা হয় নি। ভালো ফলনের পেছনে এইসব ঘটনা অথবা ঘটনার অভাব কাজ করেছে।

ভালো ফলন নিয়ে চাষীরা বেশি মাথা ঘামাল না, কারণ খারাপ ফলন নিয়েও তারা কখনও মাথা ঘামায় না। তবে অন্য শ্রেণীর লোকেরা তালি বাজিয়ে নাচতে লাগল। নেতা বললেন, "এ আমার বক্তৃতার ফল।" উন্নয়ন অধিকারী পরিসংখ্যান দিয়ে বলতে লাগলেন, "সব আমার চেষ্টাতেই হয়েছে।" সরকারী মহলের লোকেরা একে অপরকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

ভালো ফলনের আরও একটা ফল হ'ল যে, গয়াদীন মকদ্দমা থেকে কিছুটা রেহাই পেলেন। ধারের টাকা আদায়ের জন্য তিনি কয়েকটা মামলা দায়ের করে রেখেছিলেন, এখন প্রতিবাদীরা টাকা দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে নিল। অনেক চাষী টাকা নিয়ে তাঁর কাছে আসতে লাগল, আর সামনে বিয়ের মরশুম থাকা সত্ত্বেও টাকা আদায় বেড়ে গেল, বেরুল কম।

একদিন গয়াদীন যখন সাত-আটজন চাষীর মাঝে বসে হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত তখন তিনি দেখতে পেলেন, বৈদ্যজী তাঁর বাড়ির দিকে আসছেন।

একজন মহাপুরুষ যেমন আর-একজন মহাপুরুষের সঙ্গে ব্যবহার করেন, গয়াদীনও তেমনিভাবে বৈদ্যজীকে অভ্যর্থনা জানালেন। বৈদ্যজী বললেন, "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে কথা বলার জন্য আপনার কাছে এসেছি।"

গয়াদীন কিছু বললেন না। তিনি জানতেন, যে কথা বলতে এসেছে, তিনি চুপ করে থাকলেও সে তার কথা বলবে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বৈদ্যজী বললেন, "জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে আপনার কী মত?"

গয়াদীনের চোখেমুখে চিন্তার একটা জাল ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন, "ভগবানের দেওয়া। তিনি আপনাকে ব্রাহ্মণ করে সৃষ্টি করেছেন, আর আমি বেনিয়া।"

বৈদ্যজী মৃদু হেসে বললেন, "আমি মানি না। জাতিভেদের দরুনই আজ আমাদের দেশের এই দুর্দশা। তাই আমি আমার ছেলেদের অসবর্ণ বিয়ে দিতে চাই। কাউকে-না-কাউকে তো এদিক আগে পা বাড়াতেই হবে। মহাত্মাজী বলতেন...।"

গয়াদীন হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ছেলেদের যদি নিজের জাতের বাইরে বিয়ে দিতে চাও তো দাও মহারাজ, কিন্তু এত সমঝদার লোক হয়ে মহাত্মাজীকে এইসব ছেলেমেয়েদের মধ্যে টেনো না।"

বৈদ্যজী ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বললেন, "আমি তো একটা কথা বলছিলাম।"

"আমিও।"

গয়াদীন চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বৈদ্যজী আবার বললেন, "তা হলে অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে আপনার মত কী?"

গয়াদীন মাথা নিচু করে বসে ছিলেন, বৈদ্যজীর কথা শুনে আস্তে করে ঘাড়টা উঁচু করে বললেন, "মহারাজ, এটা ব্রাহ্মণ-ঠাকুরদের ঘরের কথা। এতে আমি বেনিয়া-ব্যবসায়ী কী পরামর্শ দিতে পারি?"

বৈদ্যজী মুচকি হেসে বললেন, "আপনি কী ধরনের কথা বলছেন, গয়াদীনজী! এটা আমাদের দুজনের পরিবারের প্রশ্ন। এতে আপনি কিছু না বললে কে বলবে?"

গয়াদীন এবার ধীরে ধীরে বৈদ্যজীর দিকে ঘুরে তাকালেন। বৈদ্যজীর মুখটা যখন নজরে এল তখন তিনি শূন্য এবং উদাসীন দৃষ্টিতে, যার মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার কিছু নেই, অমনিভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার পরিবারের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক, মহারাজ?"

বৈদ্যজী বিস্মিত হয়ে ভুরু ওপর দিকে তুললেন। তারপর বললেন, "তা হলে আপনি কিছুই জানেন না?"

গয়াদীন আগের মতোই বসে রইলেন। তাঁর নীরবতাই জানিয়ে দিল যে, তিনি কিছুই জানেন না।

বৈদ্যজী এবার সবেগে বলতে আরম্ভ করলেন, "বদ্রীর এটাই পছন্দ। ষোলো বছর বয়সের পর ছেলের সঙ্গেও বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে হয়। তাই আমি কোনো আপত্তি প্রকাশ করি নি। সম্ভবত সে মেয়ের মতও জেনে নিয়েছে। এখন আপনারও কোনো আপত্তি হওয়া উচিত নয়।"

এবার মোষ এমন জোরে লাফাল, যেন খুঁটিসুদ্ধ উড়ে আকাশে

পৌঁছে যাবে। পুরো ব্যাপারটার প্রতি আপত্তি জানিয়ে গয়াদীন ভুরু কুঁচকোলেন। কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ না করেই তিনি বললেন, "আমার আপত্তি কেন হবে? আপনার ছেলে যেখানে ইচ্ছে বিয়ে করুক, মাঝখানে আমাকে টানছ কেন মহারাজ?"

বৈদ্যজী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন, "আমি আপনাকে টানছি না। মেয়ে তো আপনারই। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু আপনি জেনেশুনে না জানার ভান করছেন। যে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগানো যায়, কিন্তু যে জেগে ঘুমিয়ে থাকার ভান করে শুয়ে থাকে তাকে জাগাব কী করে?"

গয়াদীন আপত্তি জানিয়ে হাত তুলে তাঁকে থামাতে চাইলেন, কিন্তু বৈদ্যজী বলেই চললেন, "বদ্রী যখন স্থির করেই ফেলেছে এবং গোটা সমাজে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে তখন আমাদের কর্তব্য শান্তভাবে এটাকে স্বীকার করে নেওয়া। এটা আদর্শ বিবাহ বলে স্বীকৃত হবে। দুজনেই সুখে থাকবে। বদ্রীকে আমি রাজনীতিতে আনছি। তাকে ইউনিয়নের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করা হয়েছে। মেয়েকেও কিছুদিন পরে সমাজসংস্কারের কাজে লাগিয়ে দেব। মহিলাদের একটা বোর্ড আছে, সেখানে তাকে কোনো পদে বসিয়ে দেব। মোটর পাওয়া যায়। সঙ্গে চাপরাসী থাকে। কিছুদিন পরে এম. এল. এ.'র টিকিটও দেওয়ানো যেতে পারে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে সুখে শান্তিতে দেশের সেবা করবে। আর আমাদের কী চাই?"

বৈদ্যজী তাঁর উৎসাহের প্রাবল্যে দেখতে পান নি যে, তাঁর কথা শুনতে শুনতে গয়াদীনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। গয়াদীন হাতজোড় করে অনুনয়ের সুরে বললেন, "মহারাজ, আমার পাকা

কথা নষ্ট করে দিয়ো না। আমার মেয়ের ওপর দিয়ে এমনিতেই অনেক বিপদ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় মা মারা গেছে। কোনো রকমে বড়ো করেছি। শহরে অগরওয়াল বৈশ্যদের একটা পরিবার আছে। তাঁরা একে উদ্ধার করতে রাজী হয়েছেন। ছেলে লেখাপড়া জানে, চাকরি করে। পনেরো দিন পরেই বিয়ের তারিখ। এখন তোমাদের মতো বড়ো বড়ো লোকেরা যদি মিথ্যে করে ওর বদনাম করতে আরম্ভ করে তা হ'লে ওর কী হবে, মহারাজ? তুমি নিজেই একটু চিন্তা করো। আমার মেয়ের গায়ে যদি কলঙ্ক ছিটোও তা হ'লে তুমি যত বড়ো নেতাই হও-না-কেন, নরকে গিয়ে পোকামাকড়ের মতো রগড়াবে।"

বৈদ্যজী হতবাক্ হয়ে গেলেন। গয়াদীন আবার বললেন, "তোমার ঐ ষাঁড়গুলো, কী নাম ওদের— ছোটে, রুপ্পন, শনিচর, না জানি কীসব কথা আমার মেয়ের নামে ছড়াচ্ছে। তুমিও এতবড়ো জ্ঞানী হয়ে ঐসব বদ ছেলেদের মতো কথা বলতে আরম্ভ করেছ! এখন মহারাজ, তোমার কাছে আমার মিনতি, তুমি নিজে তোমার মুখ বন্ধ করো আর তোমার ষাঁড়গুলোকে সংযত করো। যতদিন-না কোনো রকমে মেয়ের বিয়েটা হয়ে যায় ততদিন চুপ করে থাকো। আজ তোমার যুগ, সবাই তোমার পায়ে লুটোচ্ছে, কিন্তু নিজেকে এতখানি ভুলো না। ভালো লোকদেরও শিবপালগঞ্জে থাকতে দাও।"

বৈদ্যজী চুপ করে বসে কথাগুলো শুনলেন। তারপর উঠতে উঠতে বললেন, "আপনি আপনার সিদ্ধান্ত-মতো মেয়ের বিয়ে দিন আর আমার যদি কিছু করার থাকে তো বলুন। আমার কথা আপনি ভুলে যান। আমাকে ভুল খবর দেওয়া হয়েছিল। তার জন্য আমি দুঃখিত।"

কিন্তু গয়াদীনের কাছ থেকে বেলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যা শুনলেন তার জন্য তাঁর দুঃখ নেই। তিনি খুব হাল্‌কা আর খুশি মনেই ফিরলেন।

বৈদ্যজীর কাছে গয়াদীন একটা অসম্পূর্ণ কথা সম্পূর্ণ করে বলেছেন। বেলার বিয়ে এখনও স্থির হয় নি। যে ছেলেটি কিছুদিন থেকে "সন্তান উৎপাদন না করার লাভের" কথা বোঝানোর জন্য শিবপালগঞ্জে আসতে শুরু করছে, গয়াদীন তাকে জামাই হিসাবে কেনার কথা ভেবেছিলেন। পরের দিনই তিনি শহরে গিয়ে তার বাবার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। শহরে ছেলেটির বাবার একটা কাপড়ের দোকান আছে। দোকানটা আগে ভালো চলত, কিন্তু দু'বছর হ'ল কাছেই একজন পাঞ্জাবী দোকানদার আসার ফলে সব বিগড়ে গেছে। ছেলেটির বাবার দোকান একটা রাস্তার ধারে। দোকান থেকে কিছুটা দূরে মেয়েদের একটা কলেজ আছে, আরও কিছুটা দূরে আছে ইউনিভার্সিটি। কয়েক বৎসর যাবৎ ঐ কলেজ আর ইউনিভার্সিটির মেয়েরা অল্প-স্বল্প কাপড় কেনার জন্য এই দোকানে আসত। এইসব মেয়েরা ফ্যাশনেব্‌ল্‌ আর বোকা। কে জানে কেন, রোজ কাপড় কেনা সত্ত্বেও তাদের সবসময় কাপড়ের অভাব লেগে থাকত। তাই দোকানটা খুব ভালো চলত আর তার আয় থেকেই ছেলেটি এম. এ. পাস করে সন্তানজন্ম বন্ধ করার চাকরিটা হাসিল করতে পেরেছে আর তার বোন বি. এ. পাস করে একজন বিত্তশালী স্বামী পেয়েছে।

কিন্তু পাঞ্জাবীটা একেবারে কাছেই তার দোকান খোলায় পুরো নক্‌শাটাই বদলে গেল। কারণ ঐ দোকানে বাইশ বছরের এক

সুন্দর, স্বাস্থ্যবান যুবক সকাল থেকেই দাড়িগোঁফ কামিয়ে, চোঙা প্যাণ্ট আর চোস্ত টি-শার্ট পরে বসে থাকে। মেয়েরা এখন তার দোকানে এসেই কাপড় কেনে। ছেলেটা তাদের 'দিদি' বলে সম্বোধন করে, সিনেমার কায়দায় নাম রাখা ডিজাইনের কাপড় দেখায়, আর নতুন ধরনের চোলি আর পায়জামার ব্যাপারে কখনও কখনও অযাচিত পরামর্শও দেয়। মেয়েরা এখন যেমনভাবে কাপড় কিনতে শুরু করেছে তাতে মনে হয়, আগের চেয়েও তাদের এখন কাপড়ের অভাব বেশি। তারা বোধহয় দিনের বেলায় নতুন কাপড় পড়ে আর রাত্রে তা খুলে কাউকে দিয়ে দেয়। সংক্ষেপে, আগের ঐ ছেলেটির বাবার অবস্থা দিনদিন খারাপ হতে চলেছে।

ছেলেটির বাবা গয়াদীনকে এই অবস্থাটা বেশ বিশদভাবে বোঝাল। তার মূল বক্তব্য, "ছেলে আপনারই। যখন ইচ্ছে, বিয়ে দিন। কিন্তু এখন আমার দিন খারাপ পড়েছে, তাই ছেলেকে আমি শস্তা দামে বিক্রি করতে রাজী নই।"

গয়াদীন ভাবলেন, মেয়েদের ফুসলিয়ে আর তাদের চোলি বিক্রি করে যে তার রুজি কামায়, একদিন-না-একদিন তাকে দুঃখ পেতেই হবে। ছেলেটির বাবার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে গয়াদীন বললেন, তিনি যখন জামাই কিনতে বেরিয়েছেন তখন ভালো দাম দেবার জন্যও তৈরি আছেন। তাঁর এই কথায় অনায়াসে বিয়ে স্থির হয়ে গেল, কেবল ছেলের দামের ব্যাপারটা পাকা হ'ল না। ছেলেটির বাবা পাশের পাঞ্জাবী ছেলেটা আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত তার যত লোকসান হয়েছে তা হিসাব করে গয়াদীনের কাছে পনেরো হাজার টাকা দাবি করল। গয়াদীন তাঁদের জাতের প্রশংসা করে বললেন, দাবিটা ন্যায্য, কারণ হাতির নাদও এক কুইণ্টল হয় আর

একজন দোকানদার দেউলিয়া হয়েও তার ছেলের দাম পনেরো হাজার টাকা হাঁকতে পারে। এরপর তিনি শেষ কথা বললেন, "আমার ক্ষমতা আপনার চেয়ে অনেক কম, তাই আপনার ছেলের দাম আমি সাত হাজারের বেশি দিতে পারব না।"

এরপর তা-ই হ'ল, এই রকম অবস্থায় যা ইতিপূর্বে কয়েক কোটিবার হয়েছে। ছেলেটির বাবা বলল, সাত হাজার অনেক কম হয়ে যায়, কারণ এর আগেই চোদ্দ হাজার দাম উঠেছে। গয়াদীন বললেন, "দাম দেবার উপযুক্ত আমি নই, আমি আমার ক্ষমতার কথা বললাম।"

ছেলেটির বাবা তখন জবাব দিল, "ঠিক আছে, আমি এখন ছেলের কাকার সঙ্গে কথা বলব, যিনি অমুক জায়গায় অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেল্স্ ট্যাক্স অফিসার, আর ছেলের মামার খুড়তুত ভাইয়ের ভায়রা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলব, যিনি অমুক জায়গায় ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসন্স জজ, ছেলেকে তিনি একেবারে নিজের ছেলের মতো দেখেন, আর আমার মাসতুত ভাইয়ের শালার সঙ্গে কথা বলব, যিনি কলকাতায় লোহার ব্যবসা করেন, আর ছেলের মা-কাকি-পিসি-মাসি-ঠাকুমা-দিদিমার সঙ্গে কথা বলব।"

গয়াদীনকে সে আশ্বাস দিল, "এঁদের সবার মত নিয়ে দশদিনের মধ্যে আমি চূড়ান্তভাবে ছেলের দাম বলে দেব।' আর ভগবান যদি চান তা হলে আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হবে।"

বেলার বিষয়ে সে কিছুই জানতে চাইল না। বলল, "মেয়ে লেখাপড়া জানলে ভালো, না জানলে আরও ভালো, কারণ মেয়েকে দিয়ে আমি মাস্টারি করাব না; আর মেয়ে সুন্দরী হ'লে ভালো, না হলে আরও ভালো, কারণ আমি তাকে ঘরে তুলে রাখব না।"

সুতরাং বৈদ্যজী যখন গয়াদীনকে অসবর্ণ বিবাহের যথার্থতার কথা বোঝাচ্ছিলেন তখন গয়াদীনের মনে হচ্ছিল, তিনি উঠে পালিয়ে যান এবং শহরে গিয়ে ছেলেটির বাবার হাতে পনেরো হাজার টাকা গুঁজে দেন। বৈদ্যজী চলে যেতেই তিনি শহরে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। কিন্তু একটু পরে যখন তিনি বাড়ির বাইরে এলেন তখন দেখতে পেলেন, খান্না মাস্টার, মালবীয় আর রঙ্গনাথ আসছে। গয়াদীন ভাবলেন, এরা এক ঘণ্টার আগে উঠবে না। তারপর ভাবলেন, শহরে যাবার জন্য তিনি ছু'ঘণ্টা সময়ও পাবেন না।

খান্না মাস্টার কয়েকটা স্থানীয় খবর দিয়ে বললেন, "দেশটা রসাতলে যাচ্ছে।"

গয়াদীন নিজে নীরস আর নিরাশাবাদী হলেও এই মাস্টারকে তাঁর ভালো লাগে, তাঁর সব কথায় মূর্খতার বিত্যুৎ ঝলসাতে দেখেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "রসাতলটা কোথায়?"

খান্না মাস্টার ইতিহাস পড়ান, ভূগোলের খবর তিনি রাখেন না। এই প্রশ্নে তিনি বিচলিত হলেন। উত্তরে বয়স্কদের কাছে শোনা একটা কথা বললেন, "কোথায় বলব? স্বর্গ, নরক, পাতাল, রসাতল— সবই আমাদের মনের মধ্যে আছে।"

গয়াদীন কিছুক্ষণ এই দর্শনটা নিয়ে চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "মনের মধ্যেই যখন আছে, তখন ভাবনা কিসের? যেতে দাও দেশকে রসাতলে। কার ক্ষতি তাতে?"

খান্না মাস্টারের উৎসাহ নিভে গেল। তিনি বললেন, "ক্ষতি নিয়ে তো তর্ক নয়। আমি একটা কথা বলছিলাম।"

গয়াদীন সস্নেহে তাঁকে বললেন, "কেউ যখন কিছু বলে তখন কোনো-না-কোনো কথাই বলে।"

খান্না মাস্টার চুপ করে গেলেন। একটু থেমে তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "বেলার শরীর এখন কেমন আছে? শুনেছিলাম, জ্বর হয়েছিল।"

মালবীয় ঘুরে তাকালেন। রঙ্গনাথও ভাবল, মাস্টাররা এমনই হয়। ক্লাসের বাইরে বেরিয়েই একটা-না-একটা বোকা কথা বলে।

গয়াদীনের ওপর খান্না মাস্টারের প্রশ্নের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তিনি কেবল খান্না মাস্টারের দিকে চুপচাপ একমিনিট সিধেসাদা, ভালোমানুষি দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। খান্না মাস্টার বুঝতে পারলেন না, এই এক মিনিটের যুগটায় তিনি কোন্‌দিকে তাকাবেন। গয়াদীন জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নিজের শরীরের কথা বলো মাস্টারমশায়, তোমার 107 নম্বরের মামলায় কী হচ্ছে?"

"তা-ই তো আপনাকে বলতে এসেছি।"

গয়াদীন মনে করিয়ে দিলেন, "কিন্তু আপনি তো রসাতলের কথা বলছিলেন।"

খান্না মাস্টার হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত দীন মনে করলেন। বললেন, "এখন আপনিই আমাদের বাঁচান। দুদিক থেকে বিপদ এসেছে। প্রিন্সিপাল এখানে আমাদের পেটানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, আর ওখানে এজলাসে ডেপুটিসাহেব পুরো মকদ্দমাটা শোনার আগেই অসন্তুষ্ট হয়েছেন।"

গয়াদীন একবার রঙ্গনাথের দিকে তাকালেন। কিছু বললেন না। মালবীয় বললেন, "রঙ্গনাথজী এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে আছেন। তাঁর সামনে সব কথা হতে পারে।"

জোটবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী তার জোটবদ্ধতার কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে যেমন বিচলিত হয়, তেমনি রঙ্গনাথও বিচলিত হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "আমি কারও পক্ষে নই। এঁদের ওপর অনেক অত্যাচার হচ্ছে, তাই এঁদের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে।"

গয়াদীন বললেন, "তা হলে কেন বলছ, তুমি এঁদের পক্ষে নেই?"

মালবীর তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন, "এখানে প্রিন্সিপালসাহেব ছোটে পালোয়ানকে উস্কে দিয়েছেন। পরশু রাস্তায় ছোটে আমাকে বলল, মাস্টারমশায়, এখনও কিছু হয় নি, চুপচাপ শিবপালগঞ্জ ছেড়ে চলে যাও; নইলে কিছু উল্‌টো-সোজা হয়ে গেলে পরিবারের দুঃখের শেষ থাকবে না। আরও অনেকে এই রকম কথা বলেছে। প্রিন্সিপাল বোধ হয় আমাদের মার খাওয়াতে চান। বুঝতে পারছি না, কী করব।"

গয়াদীন মাটির দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বললেন, "কী আর করবে! চুপচাপ মার খাও। মাস্টার হয়ে মার খাবার ভয় পেলে চলবে কেন?"

খান্না মাস্টার উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আমরা চুপচাপ মার খাবার লোক নই। ইঁটের জবাব পাটকেল দিয়ে দেব।"

গয়াদীন কিছু বললেন না। খান্না মাস্টারই আবার বললেন, "নবাবির দিন আর নেই যে, যাকে ইচ্ছে মেরে বসবে।"

গয়াদীন বললেন, "তার থেকেও খারাপ দিন। আমি তো চার-পাঁচ বছর ধরে এ-ই দেখছি। ওখানে, রঙ্গাপুরে হেডমাস্টার খুন হয়েছিলেন, মনে নেই? কী হ'ল? খুনী আজও হাতে বল্লম নিয়ে, গোঁফে তা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

গয়াদীন মাথা নেড়ে সান্ত্বনা দেবার মতো করে বোঝালেন, "না মাস্টারমশায়, তুমি কখনও ইঁটের জবাব পাটকেল দিয়ে দিয়ো না। প্রিন্সিপালসাহেব আর বৈদ্যমহারাজের অনেক শক্তি। শেষ হয়ে যাবে। পরীক্ষার সময় প্রত্যেক বছর কত মাস্টারই না ছেলেদের হাতে মার খায়। কী করে তারা ? মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আস্তে আস্তে বাড়ি চলে যায়, গিয়ে স্ত্রীর কাছে এক গেলাস জল চেয়ে খায়। কেউ কেউ থানায় রিপোর্ট লেখায় এবং তার জন্য আবার মার খায়।"

সান্ত্বনা দিয়ে আবার তিনি বললেন, "এখন তো এইসবই হচ্ছে। মাস্টার হয়ে এখন মার খাওয়ার জন্য ঘাবড়ানো উচিত নয়।"

খান্না মাস্টার ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। বললেন, "তা হলে কী করব ?"

"তাদের কথাই মেনে নাও। নইলে 107 নম্বর মকদ্দমা মিটিয়ে ফেলো অথবা শিবপালগঞ্জ ছেড়ে পালিয়ে যাও।"

"এ তো কান্নাকাটি করার মতো।"— খান্না মাস্টার কাঁদার চেষ্টা করে বললেন, "প্রিন্সিপালের কাছে মিটমাটের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি বলছেন, মিটমাটও এই শর্তে হবে যে, শিবপালগঞ্জ ছেড়ে চলে যাবে। সব অবস্থাতেই এখন চলে যেতে বলছেন। বলুন, এরপর কী করব ?"

গয়াদীন চিন্তা করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে মাথার উড়ো চুলগুলোকে ঠিক করে তিনি প্রমাণ করলেন যে, তাঁর চিন্তা করার কাজ শেষ হয়েছে। গয়াদীন বললেন, "এরপর কী আর করবে মাস্টারমশায় ? দেশের মানচিত্র খুলে দেখতে আরম্ভ করে দাও। হয়তো শিবপালগঞ্জের পরেও কোনো জায়গা পাবে।"

কিছুক্ষণ সবাই গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর নরম মাটিতে

কেঁচো যেমন তার শরীরটাকে বাঁকিয়ে আঁকাবাঁকা দাগ কেটে চলে, তেমনি খান্না মাস্টার তাঁর মকদ্দমার আগের বারের শুনানীর বিবরণ সবিস্তারে শোনাতে আরম্ভ করলেন :

107 নম্বর ধারার মকদ্দমায় প্রথম পক্ষ, অর্থাৎ যাঁদের ঝগড়াটে স্বভাবের বিষয়ে পুলিস আগেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিল, সেই খান্না মাস্টার, মালবীয় আর তাঁদের সঙ্গের তিনজন শিক্ষানবিস মাস্টার প্রিন্সিপালের দলে না থাকার জন্য তাঁদের তাঁর বিরুদ্ধবাদী বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পক্ষে আছে তারা, যাদের সম্বন্ধে খান্না মাস্টার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে, তাদের দ্বারা তাঁর ধনপ্রাণ বিপন্ন হবার আশঙ্কা আছে। একজন উকিল ঠাট্টা করে বলেছিলেন, মাস্টারদের আবার ধন থাকে কোথায় ? আর মাস্টারদের প্রাণের মূল্যই-বা কী ? কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সে কথায় কান না দিয়ে দ্বিতীয় বিবাদীদলের বিরুদ্ধেও সমন জারি করেছিলেন।

এই দ্বিতীয় পক্ষে প্রিন্সিপাল ছাড়াও তাঁর দুই ভাইপো আর দুই ভাগ্নে আছেন। তাঁরা গত তিন বছর ধরে কলেজে মাস্টারি করছেন। কিন্তু লোকে তাঁদের মাস্টারের বদলে প্রিন্সিপালের ভাইপো-ভাগ্নে হিসাবেই দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

মকদ্দমায় খান্না মাস্টারকে খুব বড়ো একটা সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথম পক্ষের তরফ থেকে পুলিস বিভাগের সব অন্বেষক, ঐতিহাসিক আর সৃজনশিল্পী মোটামুটি প্রমাণ করে ফেলেছেন যে, খান্না মাস্টার আর সঙ্গীরাই ঝগড়া-বিবাদ করেন। ওদিকে তাঁরা শিবপালগঞ্জে উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়ার দরুন স্বয়ং প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে কোনো ভালো ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারছেন না। সুতরাং

একদিন যখন খান্না মাস্টারের উকিল তথ্যের অভাব আর তর্কের প্রাচুর্যের সাহায্যে প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে এক জোরদার বক্তৃতা করছিলেন তখন বিচারক মাথা ঘুরিয়ে খান্না মাস্টারের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা অধ্যাপক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

অধ্যাপক হবার দরুন সব সময়েই তাঁদের লজ্জা ঘিরে থাকে, কিন্তু সে কথা স্বীকার করতে মালবীয়জী এখন ইতস্তত করলেন। তিনি বললেন, "অধ্যাপক হবার জন্য লজ্জা করবে কেন, হুজুর?"

"অধ্যাপক হয়েও আপনারা লোফারদের মতো ঝগড়া-বিবাদ করছেন, 107 নম্বর ধারার মকদ্দমা চালানোর মতো অবস্থা সৃষ্টি হ'ল। এতে আপনাদের লজ্জা হচ্ছে না?"

খান্নার উকিল বিচারককে বললেন, "এই কথাটা অন্য পক্ষকেও বলুন হুজুর।"

বিচারক রেগে ছিলেন। তিনি চিৎকার করে ইংরেজীতে বললেন, "নিশ্চয় বলব। কিন্তু এঁদের কাছে আমার প্রশ্ন: অধ্যাপক হয়েও এই ধরনের মকদ্দমা লড়তে এঁদের লজ্জা হয় না? আমি তো এই মকদ্দমা শুনতেই লজ্জা পাচ্ছি। আমি ভাবছি, ছাত্রদের ওপর এর কী প্রভাব পড়বে।"

প্রিন্সিপালসাহেবের উকিল বললেন, "হুজুর, যদি বিরোধীপক্ষের মাস্টারদের কড়া শাস্তি দেওয়া হয় তা হলে ছাত্রদের ওপর তার ভালো প্রভাবই পড়বে, কারণ তারা দেখতে পাবে, গুণ্ডাবাজির পরিণাম খারাপ হয়।"

বিচারক দেখলেন, তিনি তাঁর তর্কজালে জড়িয়ে পড়ছেন। হঠাৎ

তাঁর লজ্জা হ'ল। তাই সবকিছু বাদ দিয়ে সমস্ত তর্কটা লজ্জা নিয়ে শুরু হ'ল, আর অধ্যাপকরা কত সম্মানিত জীব সে কথা বলা হ'ল। তারপর যেমন এক কথা থেকে অন্য কথা আসে, তেমনি বলা হ'ল, অধ্যাপকদের নিষ্ঠা কম, তাঁদের মধ্যে সংযম নেই। দেশের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সেই নিরাশাবাদী স্থিতিতে চলে গেল, যার উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়ে থাকে যে, অধ্যাপকদের ত্যাগ করা উচিত, এবং সবার কাজ আদর্শ নষ্ট করা আর অধ্যাপকদের কাজ সেই আদর্শকে তোলা। এ কথা বুঝে তাঁদের উচিত অল্প মাইনেয়, সম্মানের সঙ্গে গান্ধী আর নেহরুর মতো লোক সৃষ্টি করা।

খান্না মাস্টারকে নয়, তাঁর উকিলকে শেষ পর্যন্ত বলতে হ'ল, "আমি নীতিগতভাবে স্বীকার করছি যে, আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। কিন্তু দুপক্ষেরই সমান সমান লজ্জা হওয়া উচিত।"

বিচারক এবার প্রিন্সিপালকে টানতে শুরু করলেন। তাঁর বক্তব্য, প্রিন্সিপালেরও লজ্জা হওয়া উচিত, কারণ তিনি এইভাবে প্রিন্সিপালগিরি করছেন। বিচারক বললেন, "যদি আমি প্রিন্সিপাল হতাম তা হলে এই ধরনের মাস্টারদের একদিনের জন্যও কলেজে বরদাস্ত করতাম না। মাস্টারদের মধ্যে যদি ঝগড়াবিবাদ হয়ও, তবু তা থানা-কাছারিতে যাবে কেন? বুদ্ধিমান প্রিন্সিপাল হলে এই ধরনের লোকদের আগেই কলেজে আসতে দিতেন না, আর এসে গেলেও তাদের বার করে দিতে এক মিনিটও দেরি করতেন না। এটা ছাত্রদের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। এর মধ্যে আপস কোথায়? কিন্তু আজকালকার প্রিন্সিপালরা কী হয়ে গেছেন। আমাদের সময়ে···।"

এবার প্রিন্সিপালসাহেবের উকিলকেও বলতে হ'ল, "নীতিগতভাবে

আমি স্বীকার করছি যে, মাস্টারদের প্রতি প্রিন্সিপালসাহেব দুর্বলতা দেখিয়েছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। আর তা না করার জন্য প্রিন্সিপালের লজ্জা হওয়া উচিত।"

কথাটা এখানে এসে পৌঁছনোর পর বিচারক খান্না মাস্টারকে বললেন, "তামাশা অনেক হয়েছে, এবার এই ঝগড়া শেষ হওয়া দরকার। হয় আপসে মিটিয়ে ফেলো, নয়তো কলেজ ছেড়ে চলে যাও। নইলে এই মকদ্দমায় আমাকে রায় লিখতে হবে।"

বিচারকের এই কথার পরে দারোগাবাবু তাঁর দয়ালুতা সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে বললেন, "হুজুর, রায় লিখবেন না, তা হলে বিপদ হয়ে যাবে। যা-ই হোক, এই বেচারারা মাস্টার মানুষ। এঁদের প্ররোচনা দিয়ে এই কাজ করানো হয়েছে। আপনি রায় লিখলে এঁরা গোলমালের মধ্যে পড়ে যাবেন। আপনি সাবধান করে দিয়েছেন, এই যথেষ্ট। এঁদের অনেক বোঝানো হয়েছে। হয়তো বুঝেছেন। এখন আমার বিশ্বাস, মিটমাট হয়ে যাবে। এঁদের আর-একটা শুনানীর সুযোগ দেওয়া হোক। ততদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। হুজুরকে রায় লিখতে হবে না।"

রঙ্গনাথ বলল, "তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াল··· ।" খান্না মাস্টার বললেন, "ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, শুনানীর পরে এখানে ফিরতেই প্রিন্সিপালসাহেব মাস্টার মোতিরামকে আমাদের পেছনে লাগিয়ে দিলেন। মোতিরাম এতদিন চুপচাপ সায়েন্স পড়াতেন আর তাঁর আটা-চাকির কাজ দেখতেন, পরশু থেকে তিনি আমাদের বোঝাতে

শুরু করেছেন যে, মাস্টারি করার চেয়ে আটা-চাকি খোলায় বেশি মুনাফা। মুনাফার কথা বলতে তিনি কাঠচেরার করাত-মেশিনের কথাও বলছেন। কাল বিকেলে তিনি মালবীয়জীকে পানের দোকান খোলার কথা বলেছেন। এখন বলুন, এর জবাব কী?”

গয়াদীন একটা হাই তুলে বললেন, “মিটমাট করে নাও।”

“কিন্তু তার অর্থ··· ।”

“সে তো তুমি বলেইছ মাস্টারমশায়। শিবপালগঞ্জ ছেড়ে দিলে যদি মিটমাট হয়ে যায় তা হলে তা-ই দাও। দিনরাত খিচখিচ করে কী লাভ? বেকারই তো হবে। বেকারি তত খারাপ জিনিস নয়। কোটি কোটি লোক তো বেকার আছে। আসল জিনিস খিচখিচ। এর থেকে দূরে থাকা উচিত।”

রঙ্গনাথ শিবপালগঞ্জে এসেছে ছ মাস হয়ে গেছে। তার শরীর ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু তার জিভটা খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক জায়গায় চুপ করে থাকার আর ভুল জায়গায় উৎসাহ দেখাবার অভ্যাস হয়ে গেছে। মাস্টারদের এই ঝগড়া-বিবাদে তার স্থান নেই, এই কথাটা তার মনে একটা হীনতা সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে। পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তার মনে স্বাভাবিকভাবে রোষও সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রত্যেক ভারতবাসীর রোষের মতো তার রোষও তর্কবিতর্কের পথ দিয়ে বেরিয়ে যায় আর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা ভালো খাওয়াদাওয়ার দরুন চাপা পড়ে যায়। কিন্তু আজ এই হীনতার অনুভূতি আর রোষের ভাব, এই দুইয়ের সংমিশ্রণ তাকে না জানি কী করে দিল, সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। উত্তেজিত হয়েই সে কথা শুরু করল আর উত্তেজিত হয়েই তা শেষ করল। যা-ই হোক, তার কথার অর্থ হচ্ছে, “দৃঢ়ভাবে এই পরিস্থিতির বিরোধিতা

করতে হবে। খান্না মাস্টারের পিছু হটা উচিত হবে না। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা চলবে না।”

খান্না মাস্টার বললেন, “আমরা কিছুই করতে পারি না।”

রঙ্গনাথ বলল, “আর আপনি গয়াদীনজী?”

উত্তরে গয়াদীন থেমে থেমে একটা গল্প শোনালেন, “আমাদের এখানে অনেকদিন আগে মাতাপ্রসাদ বলে একজন লোক ছিলেন। এই অঞ্চলের তিনি প্রথম নেতা। লোকে তাঁর কথা খুব মানত। দরকার হলে তিনি জেলেও যেতেন। তখন লোকে তাঁকে আরও বেশি করে মনে করত। তিনি যখন জেল থেকে ফিরে আসতেন তখন লোকে তাঁর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলত, যাতে তিনি উৎসাহিত হয়ে আবার জেলে যান। একবার তিনি বেশ কয়েক বছর জেলে না গিয়ে এমনিই রইলেন। এর ফল হ'ল এই যে, তাঁর বক্তৃতায় লোকের বিরক্তি ধরতে আরম্ভ করল। জমিদারিপ্রথার লোপ, স্ত্রীশিক্ষা, বিদেশী জিনিস আর মদের দোকান বর্জন— এইসব বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা লোকের এমন মুখস্থ হয়ে গেল যে, যখন তিনি বক্তৃতা দেবার জন্য উঠে দাঁড়াতেন, তিনি কিছু বলার আগেই স্কুলের ছেলেরা তাঁর বক্তৃতা ভাগ ভাগ করে শুনিয়ে দিত। তাঁর বলার আর কিছুই থাকত না। যখন তিনি চাঁদা চাইতে যেতেন, লোকে মনে করত, তিনি ভিক্ষা চাইছেন। যখন তিনি “ভারতমাতা কী জয়” বলতেন তখন লোকে ভাবত, তিনি তাঁর বংশের প্রচার করছেন। আর যখন তিনি জমিদারিপ্রথার বিলোপসাধনের কথা বলতেন তখন লোকের ধারণা হ'ত, তিনি খাজনা না দিয়েই বছর কাবার করতে চাইছেন। মাতাপ্রসাদের লীডারি এই অঞ্চলে পাঁচ বছর তো চলল, কিন্তু তার পরে তাঁর মনে হতে লাগল, তেমন জমছে না। তখন

আমাকেই বোঝাতে হ'ল, 'ভাই মাতাপ্রসাদ, লীডারদের যে গুণ থাকা দরকার তা তোমার নেই। লীডাররা জনসাধারণের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখবে, কিন্তু জনসাধারণ লীডারদের সম্বন্ধে কিছুই জানবে না। এখানে ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেছে। তুমি নিজে জনসাধারণের খবর জানো না, কিন্তু জনসাধারণ তোমার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানে। তাই এই এলাকা তোমার লীডারির উপযুক্ত নয়। এখন হয় তুমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাও, নয়তো আবার কিছুদিনের জন্য জেলে যাও।' মাতাপ্রসাদ আমার কথা শুনে জেলে চলে গেলেন। আর তার এক বছর পরে অন্য এক জেলা থেকে তোমার মামা বৈদ্যজী এখানে এলেন। তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না। লোকে শুধু এইটুকু জানত যে, তাঁর কালো কালো গোঁফ আছে, মজবুত শরীর আছে আর তাঁর বীর্যপুষ্টির ওযুধের গুণ আছে। তিনি এখানে কো-অপারেটিভ সোসাইটি তৈরি করলেন, একটা মিড্‌ল্ স্কুল খোলালেন, নিজের আয়ুর্বেদিক ঔষধালয় খুললেন, আর তিনি কার কে এ কথাটা লোকে জানার আগেই তিনি এখানকার নেতা হয়ে বসলেন। একটা গ্রামের জমিদারিও তিনি বন্ধক হিসেবে রাখলেন, কো-অপারেটিভ থেকে দেরিতে ঋণ পাওয়া যায় বলে যাতে কারও অসুবিধা না হয় তার জন্য কো-অপারেটিভের সাথে সাথে তিনিও টাকা ধার দেওয়া শুরু করলেন। ওদিকে মাতাপ্রসাদ জেলে পড়ে রইলেন, আর এদিকে বৈদ্যজী যুদ্ধে সেপাই ভর্তি করাতে লাগলেন। শহরের জনসভায় যেতে শুরু করলেন। স্বাধীনতা পাবার পর তিনি জমিদারিপ্রথার বিরোধিতা করার জন্য বন্ধকী গ্রামটা বিক্রি করে দিলেন আর টাকা নিয়েও ভূতপূর্ব জমিদার বলে আখ্যাত হওয়া থেকে বেঁচে

গেলেন। ওদিকে মাতাপ্রসাদ জেল থেকে বেরিয়ে সরকারী পেন্সন নিয়ে শহরে কোনোরকমে তাঁর পেট চালাতে লাগলেন। এদিকে, বাবু রঙ্গনাথ, তোমার মামা পুরো এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করলেন। বাবু রঙ্গনাথ, লীডারি এমন জিনিস, যা নিজের বাড়ি থেকে দূরেই জমজমা হয়। তাই আমি এখানে লীডারি করতে পারি না। লোকে আমাকে অনেক বেশি জানে। তাদের মধ্যে আমার লীডারি চলবে না। কিছু বললে তারা বলবে, দেখো, গয়াদীন লীডারি করছে। আর এই খান্না মাস্টারের জন্য তো আমি এমনিতেই লীডারি করব না। যিনি কিছুই বোঝেন না তাঁর জন্য কতখানি ওকালতি করা যায়।"

রঙ্গনাথ শান্তভাবে তাঁর কথাগুলো শুনল। তারপর বলল, "কিন্তু গয়াদীনজী, মামাকে তো আপনিই ভালো করে জানেন। আপনিই তাঁর ওপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। খান্নাকে আপনার কিছু সাহায্য করতেই হবে।"

গয়াদীন বললেন, "খান্না মাস্টারকে তো আমি সাহায্য করতে পারব না, পারলে তুমিই পারবে। তোমার মামার বিরুদ্ধে তুমি এখন কথা বলতে আরম্ভ করেছ। সংকোচ কেটে গেছে। তুমি বাইরের লোক। এখানকার লোকেরা তোমার আসল কথা কিছু জানে না। এখানে যেমন খান্না মাস্টার, তেমন তুমি। এখন তুমিই লীডারি করে দেখাও।"

রঙ্গনাথ উত্তেজিত হয়ে বলল, "তা হলে এ-ই হবে? আপনি কী বলছেন?"

গয়াদীন বললেন, "ছেলেছোকরাদের বন্ধুত্ব, বিপদের আপদ।"

বলেই তিনি থেমে গেলেন। নিরাসক্তভাবে তিনি চেয়ে চেয়ে

দেখলেন, সবাই সবেগে উঠে চলে যাচ্ছে। তাঁর মনে পড়ল, শহরে যাবার বাসের সময় হয়ে গেছে। পনেরো হাজার টাকা অনেক টাকা, কিন্তু বেলার জন্য এখন ঐ টাকার কোনো মূল্য নেই।

আঠাশ

ডেপুটি ডাইরেক্টর অভ এডুকেশন কলেজের ব্যাপার নিয়ে তদন্ত করতে আসছেন। তাঁর আসার আর মাত্র চারদিন বাকি আছে। রুপ্পনবাবু আর রঙ্গনাথ ভাবল, খান্না মাস্টার কতদূর তৈরি হয়েছেন, তাঁর বাড়িতে গিয়ে তার খবর নিয়ে আসা যাক। যখন তারা মন্দির আর বাসের আড্ডার মাঝখানকার রাস্তায় এসে পৌঁছুল তখন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল।

বাসের আড্ডার চারদেয়ালের অন্যদিকে একটা মাথা বেরিয়ে আছে, ধড়টা দেখা যাচ্ছে না। চিবুকটা দেয়ালের ওপর রাখা। মাথাটা এদিক-ওদিক না হেলেদুলে সোজা মন্দিরের দিকে ঘুরে যাচ্ছে। মুখে বেশ বড়ো অথচ অস্বাভাবিক একটা হাসি লেগে আছে। দূর থেকে দেখেই মনে হচ্ছে, লোকটা যখন হাসছিল তখনই কেউ যেন হঠাৎ তার মাথাটা কেটে নিয়ে দেয়ালের ওপর রেখে দিয়েছে।

রুপ্পনবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ইশারায় রঙ্গনাথকে দৃশ্যটা

দেখালেন। কিছুক্ষণ তিনি একদৃষ্টে ওদিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ চিনতে পারলেন, ওটা ল্যাংড়ার মাথা।

রুপ্পনবাবু ল্যাংড়ার নাম ধরে ডাক দিলে তার গলাটাও দেয়ালের ওপর ওঠে এল। রুপ্পনবাবু আর রঙ্গনাথ কাছে গিয়ে দেয়ালের এ পার থেকে কথা বলতে লাগলেন। রুপ্পনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "বাসের আড্ডায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছ?"

ল্যাংড়ার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তাকে এখন স্বাভাবিক দেখাতে লাগল। ল্যাংড়া বলল, "এখানে লোকে কী করে বাবু? যাত্রীরাই তো এখানে আসে।"

"ফিরে যাচ্ছ? তার মানে নকল পেয়ে গেছ। কবে পেলে?"

"নকল তো আমি পেয়েই গিয়েছিলাম বাবু, কিন্তু···।"

বাঁ হাত মুঠ করে ল্যাংড়া তার মাথায় গোটা কয়েক কিল মারল, যেন কেউ হাতুড়ি পিটল। এ দিকে এঁরা দুজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন।

ল্যাংড়া বলল, "আগের বারে যখন তোমার সঙ্গে দোকানে দেখা হয়েছিল, তুমি আমার কত খাতির করেছিলে। দুধ কিনে খাইয়েছিলে। তার পরের দিনই আমাকে গ্রামে চলে যেতে হয়েছিল। খবর এসেছিল যে, আমার এক আত্মীয় মারা গেছে। গ্রামে পেঁছুতেই আবার আমি জ্বরে পড়লাম। পুরো সতেরোটা দিন খাটিয়ার ওপর পড়ে থাকতে হ'ল। কাল ফিরেছি বাবু। তহসিলে গিয়ে খবর নিয়ে জানতে পারলাম, পাখি পালিয়ে গেছে। সেখানে তারা বলল, 'তোমার নকল কয়েকদিন আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। নোটিস বোর্ডে তার এত্তেলা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পনেরো দিন পর্যন্ত কেউ তা নিতে না আসায় ছিঁড়ে ফেলে

দেওয়া হয়েছে।'— নকল তৈরি করে পনেরো দিন রাখা হয় এটা আমি জানতাম না।"

কথাটা বলে ল্যাংড়া হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু তাঁরা দেখলেন, সে কাঁদছে।

রঙ্গনাথ বোঝাতে শুরু করল, "দেখো ল্যাংড়া, তুমি কায়দাকানুন জানলেও কিছু হ'ত না। জানার কথা শুধু একটা— তুমি একজন সাধারণ মানুষ, আর সাধারণ মানুষ কখনও এত সহজে জেতে না।"

ল্যাংড়া কান্না বন্ধ করে আবার আগের মতো দেয়ালের ওপর তার চিবুকটা রাখল, তারপর নিষ্পলক চোখে তাদের দুজনকে দেখতে লাগল।

"হেরে গেছ তো কী হয়েছে? গ্রামে গিয়ে চাষ-আবাদ করো। কিছুদিন পরে ঘা আপনা-আপনি শুকিয়ে যাবে।"

"চাষ-আবাদ কী করে করব বাবু? ক্ষেত নিয়েই তো মকদ্দমা।"

রুপ্পনবাবু হঠাৎ কঠিনস্বরে বলে উঠলেন, "তা হলে চুরি করো, ডাকাতি করো।"

ল্যাংড়া কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেন কিছু চিন্তা করে বলল. "তা হলে নকলের জন্য আর নতুন করে দরখাস্ত দেব না?"

রঙ্গনাথ জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "দাও। তবে এবার একজন উকিল নিয়ে নাও। ঘুষ দেওয়া থেকে বেঁচে গেলেও মকদ্দমা করতে গেলে উকিলের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।"

রঙ্গনাথ আর রুপ্পনবাবু রাস্তায় ফিরে এলেন। রুপ্পনবাবু রাস্তার ওপর পড়ে থাকা একটা কুকুরকে একটা গুঁতো মারলেন। কিন্তু

কুকুরটা একবার চোখ খুলে তাকানো ছাড়া আর কিছু করল না। রুপ্পনবাবু বললেন, "ল্যাংড়াটা শিবপালগঞ্জের বাইরে থাকলেই ভালো। এখানে এলে গা ঘিন ঘিন করতে থাকে। ওকে দেখলেই আমার চড় লাগাতে ইচ্ছে করে।"

রঙ্গনাথ রুক্ষস্বরে বলল, "তা হলে লাগাও না কেন?" তারপর ভাবল, এখানে এই প্রথম সে রুক্ষ হ'ল।

উনতিরিশ

খান্না মাস্টারের বাড়ি। বাড়ি, অর্থাৎ একটা পুরনো ইমারতের একটা ঘর। তার পেছনে একটা উঠোন, তারপর একটা বারান্দা, তারপর আর-একটা ছোটো কামরা। বারান্দায় রান্না হয়, উঠোনের এক নালায় প্রস্রাব করা হয়, তার পাশে বসেই স্নানের ব্যবস্থা। বাড়িটাতে পায়খানা আর স্নানঘর নেই, শিবপালগঞ্জের শতকরা পঁচানব্বইটা বাড়িতে নেই।

ঘরে একটা তক্তপোশ আছে। তার ওপর একটা ছেঁড়া শতরঞ্চি। তার এক কোণে ওয়াড়-ছাড়া একটা বালিশ। বালিশটা দেখেই মনে হবে, এখানে প্রচুর সরষের তেল পাওয়া যায়। দেয়ালে তক্তপোশের মতোই একটা আলমারি। তার মধ্যে দাড়ি ভেজানোর একটা ব্রাশ রয়েছে, তাতে সাবান শুকিয়ে কড়া হয়ে গেছে।

ব্রাশটার পাশে একটা সেফ্‌টি রেজরও রয়েছে, তাতে সাবান আর দাড়ি শুকিয়ে লেগে আছে। আলমারির ঐ একই তাকে রয়েছে জুতোর কালির একটা কৌটো, অবসরপ্রাপ্ত একটা ব্রাশ, একটা নোংরা ন্যাকড়া আর সাধনা নামে একজন ফিল্ম অ্যাক্‌ট্রেসের একটা বাঁধানো ছবি। তার পরনের কাপড় খুবই কম, উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে যেন ঘোষণা করছে, "বিলিতি অভিনেত্রীদের কাছে যা আছে, আমার কাছেও তা আছে।"

আলমারির ওপরের তাকে রয়েছে সাহিত্য। অর্থাৎ ডক্টর ঈশ্বরীপ্রসাদ রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইতিহাসের গ্র্যাজুয়েট কর্তৃক রচিত কয়েকটা পরীক্ষোপযোগী নোট, পকেট সিরিজের কয়েকটা গোয়েন্দা উপন্যাস, কল্যাণ নামক ধর্মবিষয়ক পত্রিকার মোটা মোটা কয়েকটা বিশেষ সংখ্যা, আর গুলশন নন্দার উপন্যাসের একটা সেট। খান্না মাস্টার ইতিহাস পড়ান আর এইসব সাহিত্য পড়েন।

ঘরে বসে আছেন খান্না মাস্টার, মালবীয়জী, তাঁদের দলের অন্য দুজন মাস্টার আর রঙ্গনাথ। তাঁদের ছাড়া দুজন ছেলেও আছে, কথাবার্তার আগেই মারপিট করে বসার জন্য সারা অঞ্চলে তারা প্রসিদ্ধ। ইচ্ছে হলে কখনও কখনও তারা কলেজে পড়তে যায়।

বৈঠকে আলোচ্য বিষয় দুটো: প্রথম, মালবীয়জীর বিরুদ্ধে ছাপানো অশ্লীল কাগজ আর গত সপ্তাহে খান্না মাস্টারের সঙ্গে প্রিন্সিপালের দুর্ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি; আর দ্বিতীয়, ডেপুটি ডাইরেক্টর অভ এডুকেশন যে তদন্ত করবেন তার প্রস্তুতি।

একটা তৃতীয় বিষয়ও আছে: প্রিন্সিপালের নাকটাও কেটে নেওয়া হবে, না তাঁকে কেবল জুতো মেরেই ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু রঙ্গনাথ উপস্থিত থাকায় এই বিষয়টা এজেণ্ডায় রাখা হয় নি।

প্রথম বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।

এখন ছেলেদের বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে। পরীক্ষায় নকল করার জন্য খান্না মাস্টার একটা ছেলেকে ধরেছিলেন। ছেলেটা এই বলে প্রতিবাদ জানিয়েছিল যে, প্রিন্সিপাল তাকে ভালোবাসেন বলেই খান্না মাস্টার তাকে ধরেছেন, অথচ খান্না মাস্টার তাঁর পেয়ারের কয়েকটা ছেলেকে ঢালাও নকল করতে দিয়েছেন। হঠাৎ মালবীয়জী ঘটনাস্থলে পৌঁছে খান্নার পক্ষ হয়ে কিছু বলার চেষ্টা করার আগেই ছেলেটা বলে উঠল, "এই মাস্টারমশায়, তুমি কেন কথা বলতে এসেছ? যে ছেলেটা তোমার সঙ্গে শহরে গিয়ে সিনেমা দেখে এসেছে তাকে তো তুমি পুরো বই নকল করতে দিচ্ছ, আর আমি এদিক-ওদিক থেকে এক লাইন ঝেড়ে লিখছি তো তোমার খুব খারাপ লাগছে!"

মালবীয়জী লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন, কিন্তু খান্না মাস্টার ছেলেটাকে ধমকাতে শুরু করলেন। ছেলেটা খুব গম্ভীরভাবে বলল, "আমি তোমাকে বেইজ্জতি করতে চাই না। তাই চুপচাপ অন্য ঘরে চলে যাও। এই রকম করলে আমি তোমাকে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব, আর তখন হাত-পা ভেঙে গেলে আমি দায়ী হব না।"

খান্না মাস্টার প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে রিপোর্ট দিলেন। প্রিন্সিপাল বললেন, "এই খান্না যেখানেই যাবে সেখানেই একটা-না-একটা গণ্ডগোল বাধবে।" তিনি রিপোর্ট নিতে অস্বীকার করলেন।

এতে মহাযুদ্ধের রণভেরী বেজে উঠল। খান্নার দলের চার-পাঁচজন মাস্টার প্রিন্সিপালের ঘরে চলে এলেন। তাঁরা যেসব ঘর ছেড়ে এলেন সেসব ঘরের ছেলেরা মহা-আনন্দে নকল করতে লাগল। এদিকে প্রিন্সিপালের ঘরে গালাগালের ঝড় উঠল। প্রিন্সিপাল

সমস্ত গালাগাল ছাপিয়ে চিৎকার করে খান্নাকে বললেন, "কলেজ থেকে বেরিয়ে যাও। পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত যেন তোমাকে কলেজের ধারে কাছে না দেখা যায়। যদি দেখা যায় তা হলে কথা মুখ দিয়ে হবে না, জুতো দিয়ে হবে।"

খান্না মাস্টার এর প্রতিবাদ করলেন। তাতে প্রিন্সিপাল তাঁর কথাগুলোকে জুতোর মতো করে খান্নামাস্টারকে মারতে আরম্ভ করলেন। খান্না আরও কড়া প্রতিবাদ করলেন। এরপর খান্নার দলেরই একজন মাস্টার পুলিস ডাকলেন। পুলিস ডাকার জন্য কোথাও যেতে হ'ল না, শান্তি আর শৃঙ্খলার সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের গভীর সম্পর্ক থাকায় ফটকের কাছে পুলিস মোতায়েন ছিল। ডাকতেই এসে পড়ল। খুনও হচ্ছিল না, ডাকাতও পড়ে নি— তাই পুলিসকে স্মরণ করা মাত্র ঘটনা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই তারা চলে এল। এসে রায় দিল, প্রিন্সিপালের হুকুম-মতো খান্নার এক্ষুণি বাইরে চলে যাওয়া উচিত।

এই ঘটনায় ছেলেরা বেশি বিচলিত হ'ল না। তারা চুপচাপ পরীক্ষা দিতে লাগল আর নিয়মমাফিক নকল করতে থাকল।

এই ব্যাপারটাকেই খান্না মাস্টারের সঙ্গে "দুর্ব্যবহার" বলা হয়েছে, আর এই নিয়েই এখানে এই বৈঠকে আলোচনা হচ্ছে।

খান্না মাস্টার রঙ্গনাথকে বললেন, "গত বছর ত্রিপাঠীজীকে নিয়েও এই হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, ব্যস, কাল থেকে কলেজে এস না। পরের দিন তিনি কলেজে গেলে ফটকের সামনে বদ্রী-পালোয়ানের তিন-চারজন চেলা তাঁকে ঘিরে ফেলল। বেচারা ত্রিপাঠীজী ইজ্জত বাঁচিয়ে পালিয়ে এলেন। যতদিন তিনি এ নিয়ে অভিযোগ করেছেন ততদিন তাঁকে গরহাজির দেখিয়ে সাসপেণ্ড করে

রাখা হয়েছে। তারপর তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষে তিনি মামলা দায়ের করেছেন। সেই মামলা আজও চলছে। মামলায় তাঁর টাকা খরচ হচ্ছে, প্রিন্সিপালের খরচ কলেজ দিচ্ছে। মামলায় প্রিন্সিপালের ভয় নেই।"

রঙ্গনাথ বলল, "তা হলে তো আপনাকে তাড়াতাড়ি কিছু করতে হবে।"

"সেই কিছু কী, তা-ই তো ভাবছি।"

সবাই অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলেন। আর ওপাশে ছেলে দুজন গুলশন নন্দার দুটো উপন্যাসের পাতা ওলটাতে থাকল। তারা জানে, এই নাটকে ভাবার ভূমিকা তাদের নয়।

মালবীয় বললেন, "পুলিসে রিপোর্ট করা হোক যে, কলেজ যাবার সময় আমার রাস্তা আটকানো হচ্ছে।"

খান্না মাস্টার অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, যেন বললেন, এইরকম বুদ্ধি নিয়ে পার্টিবাজি করবে? তিনি বললেন, "কী প্রমাণ, আমার রাস্তা আটকানো হবে? কে জানে, তারা কলেজে যেতে দিয়ে তারপর বেইজ্জতি করবে না? রিপোর্ট তো পরে হবে, আগে ওখানে ইন্‌সাল্ট হয়ে যাবে।"

মালবীয় মন দিয়ে কথাটা শুনলেন। তারপর বললেন, "তার মানে আপনি ওখানে যেতে ভয় পাচ্ছেন।"

খান্না মাস্টার এতক্ষণ পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে ছিলেন, হঠাৎ তিনি হাঁটু মুড়ে, বুক টান করে, শরীরের চড়াই-উতরাই দেখিয়ে স্বর্গীয় মেরিলিন মনরোর এক বিখ্যাত ভঙ্গিতে বসলেন। তারপর উদ্দণ্ডভাবে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছি। আপনার আপত্তি আছে?"

মালবীয় বোঝানোর মতো করে বললেন, "আপত্তির কথা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি ওখানে যাচ্ছেন আর আপনাকে কাজ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কী করে অভিযোগ করা যেতে পারে?"

রঙ্গনাথ বলল, "কষে ইংরেজীতে ভালো করে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখুন। তারপর ডেপুটি ডাইরেক্টর তদন্তের জন্য এখানে এলে তাঁর সামনে পেশ করুন। আমাদের প্রিন্সিপালের মুখ কালি হয়ে যাবে।"

খান্না মাস্টার একটা ফিকে হাসি হেসে বললেন, "আপনিও রঙ্গনাথবাবু— কী বলব! এই ডেপুটি ডাইরেক্টরের কাছে আমার কোনো আশা নেই। যারই লেজ তুলে দেখুন, মাদী দেখতে পাবেন।"

কথাটা শুনে একজন মাস্টার হাসতে লাগলেন। ওদিকে 'মাদী' কথাটা শুনে ছেলে দুজন গুলশন নন্দার উপন্যাস পড়া বন্ধ করে দিল। তারা মলাটের নারীমূর্তির ছবি দেখতে লাগল আর সাগ্রহে মাস্টারের কথা শুনতে লাগল।

মালবীয়জী বললেন, "যা-ই হোক, এই ডেপুটি ডাইরেক্টর তো নতুন লোক। এঁর কাছে কিছু আশা করা যেতে পারে। শুনছি, খুব শক্ত লোক। বড়ো বড়ো নেতাদের পর্যন্ত বসতে বলেন না! অকাজের কথা শুনলেই ঘর থেকে বার করে দেবার হুমকি দেন।"

খান্না নিরাশা দেখিয়ে বললেন, "তুমি শুনতে থাকো মালবীয়জী, আমি সব জানি। তিনি সেইসব নেতাদের কাছে শক্ত, যাঁরা বিরোধী দলের। বড়ো চালাক অফিসার। অর্ধেক নেতা, অর্ধেক অফিসার। মনোমতো দু-চারজন নেতা পটিয়ে নিয়েছেন। রাত্রে তাঁদের কাছে

গিয়ে লেজ নাড়েন আর দিনে তাঁদের বুদ্ধিমতো অন্যদের কাছে শক্ত হন।”

মালবীয়জী বললেন, “যেমনই হোন, আগের ডেপুটি ডাইরেক্টরের চেয়ে লক্ষগুণ ভালো।”

তারপর রঙ্গনাথকে উদ্দেশ করে বললেন, “আগের ডেপুটি ডাইরেক্টর একটা আস্ত গোরু ছিলেন। এটাই তাঁর খ্যাতি ছিল। একবার আমরা দু-তিনজন মাস্টার ডেপুটেশন নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বললাম। তিনি মন দিয়ে সব শুনলেন। কিন্তু যখন বলতে আরম্ভ করলেন তখন মনে হ'ল, এই গ্রামের গয়াদীনজী বলছেন। তিনি বলতে লাগলেন, ‘তোমাদের কলেজ তো খুবই ভালো। তোমরা বলছ, ওখানে কেবল দলবাজি হয়, ছেলেদের ঠিকমতো পড়াশোনা হয় না, হিসেবে গোলমাল আছে, পরীক্ষায় নকল হয়, প্রিন্সিপাল তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। তো ভাই, এটা কি একটা কথা হ'ল? এসব তো সব কলেজেই হয়। ছেলেদের ঠিকমতো পড়াশোনা হয় না তো কে কী করতে পারে? ছেলেরা নিজেরাই যখন পড়াশোনা করতে চায় না তখন তাদের কে পড়াবে? আমাদের সময়ে ভালো ভালো বংশের ছেলেরা পড়তে আসত, তারা মন দিয়ে পড়াশোনা করত। আর এখন ভাঙ্গী-চামারদের ছেলেরা পড়তে আসে। তা হলে কী করে পড়াশোনা হবে? তোমরা নিজেরাই বলো ভাই। সত্যি কথা জিজ্ঞাসা করো তো বলি, তোমাদের কলেজের খুব নাম আছে। বৈদ্যজী ম্যানেজার, বড়ো সাত্ত্বিক লোক। মাছমাংস তো দূরের কথা, পেঁয়াজ পর্যন্ত খান না। আর দেখো, তোমাদের কলেজ লোকসানে চলে না, মাসে মাসে তোমরা মাইনে পাও। ওখানে কখনও তছরূপ

হয় না, হরতাল হয় না, কখনও আগুন লাগানো হয় নি, কখনও চুরি হয় নি, কখনও কেউ খুন হয় নি। সব শান্তিতে চলছে। তোমাদের কলেজ তো একটা আদর্শ কলেজ।'— রঙ্গনাথবাবু, ডেপুটি ডাইরেক্টর আমাদের এইরকম সুখশান্তির কথা শোনালেন, যেন তিনি শিক্ষাবিভাগের কোনো অফিসার নন, কোনো থানার দারোগা। তারপর চলতে চলতে আমাদের বললেন, 'এইসব অভিযোগ-টভিযোগ ঠিক নয়। যদি তোমাদের কোনো অসুবিধে থাকে, সোজা বৈদ্যজীর কাছে গিয়ে বলো। তিনি সব ঠিক করে দেবেন।'— রঙ্গনাথবাবু আমরাও ভাবলাম, 'তুমি শালা সত্যিই যখন একটা আস্ত গোরু তখন কোনো গোয়ালে চলে যাও। সেখানে গিয়ে ভুষি খাও আর দুধ দাও। এখানে বসে কী করছ?' "

সবাই হাসতে লাগলেন। ছেলে দুজন বেশি করে হাসল, তারপর উপন্যাসের মলাটের নারীমূর্তি দেখায় মগ্ন হয়ে গেল। মালবীয়জী তাঁর কথাটা শেষ করলেন, "তবে এই ডেপুটি ডাইরেক্টরের ওপর আমার আস্থা আছে। আমরা এবার অভিযোগ করতে গেলে উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আপনারা ফিরে গিয়ে চুপচাপ আপনাদের কাজ করে যান, আমি নিজে ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা তদন্ত করব।' "

খান্না মাস্টার নিরাশায় মাথা নেড়ে বললেন, "উহুঁ, আমার আস্থা নেই। এটা নির্বাচনের বছর। আমি তো শুনেছি, উনি এবার কলেজে আগের চেয়ে দ্বিগুণ টাকা দেওয়াচ্ছেন। এ বছর সবারই পূর্ণ স্বাধীনতা। তদন্ত তো পরশুই হয়ে যাবে, কিন্তু ফল কিছু হবে না। কী করা যাবে?"

ছেলে দুজন এতক্ষণ কিছু বলে নি। তাদের মধ্যে একজন এবার কিছু বলার জন্য মুখ খুলল। তার পরনে শিবপালগঞ্জের বিখ্যাত

পোশাক, অর্থাৎ ডোরাকাটা পায়জামা আর বেনিয়ান-ছাড়াই মলমলের জামা। তার মাথা কামানো। চেহারা দেখেই মনে হয়, একটা গুণ্ডা। যখন সে কথা বলল তখন মনে হ'ল সে দেখতেও যেমন, আসলে তা-ই। সে বলল, "মাস্টারমশায়, তদন্তে-ফদন্তে কিছু হবে না। সোজা রাস্তা একটাই আছে। আপনি হুকুম দিন, একদিন অন্ধকারে কি আলোয় প্রিন্সিপালসাহেবকে ভরত-মিলাপ করিয়ে দিই।"

অন্য ছেলেটি কথাটার মানে বুঝিয়ে দিল, "শুধু নাকটাই কেটে নেওয়া হোক, প্রাণ নেবার দরকার নেই।"

রঙ্গনাথের অবস্থা খারাপ হয়ে চলেছে। কিছুদিন ধরে সে খান্না মাস্টারের বিপদ নিয়ে চিন্তা করছে। মাস্টারদের এই দলটার ওপর তার একটা সহানুভূতি জাগছে, বিশেষ করে এই কারণে যে, লিখিতভাবে কিছু না করে কেবল মারপিটের জোরে প্রিন্সিপাল তাঁকে কলেজে যেতে দিচ্ছেন না। এতে সে খুবই উত্তেজিত হয়েছে। এদিকে যখন থেকে সে দু-চারবার এঁদের সঙ্গে বেরিয়েছে, তখন থেকে বৈদ্যজী আর প্রিন্সিপালসাহেব তাকে দেখে মুচকি হাসতে আরম্ভ করেছেন। রঙ্গনাথ একবার তাঁদের বোঝাতে চেয়েছিল যে সে খান্না-ওঁদের মনোভাব জেনে নিয়ে মিটমাট করার চেষ্টা করছে। বৈদ্যজী কথাটা শুধুই শুনেছিলেন, কিছু বলেন নি।

ছেলে দুজন যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রিন্সিপালের নাক কাটার কথা বলল আর এই ব্যাপারটাকে ভরত-মিলাপ আখ্যা দিল তাতে রঙ্গনাথ বিরক্ত হ'ল। তার রামায়ণের কথা মনে ছিল, তাই তার মনে হ'ল, ভরত-মিলাপের পর প্রিন্সিপালের যদি রাজ্যাভিষেকের অবস্থা আসে তো হতে পারে, দু-চারদিন পরে এই ছেলে দুজন আর মাস্টারদের সঙ্গে তাঁকেও খুনের দায়ে হাজতে দেখা যাবে। আর স্বাস্থ্য ঠিক

থাকার জন্য শিবপালগঞ্জের আবহাওয়া ভালো হলেও এখানকার হাজতের আবহাওয়ার সে খ্যাতি নেই।

রঙ্গনাথ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু পা বাড়াবার আগেই বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ হ'ল। দরজা খুলে রুপ্পনবাবু ভেতরে এলেন।

রুপ্পনবাবু আজ বীরবেশে এসেছেন। ধুতির কোঁচা কাঁধের ওপর কায়দা করে রাখা, গলায় রেশমী রুমাল জড়ানো, চুলের একটা গোছা কপালে ঝুলছে, মুখ তেলে আর জলে চকচক করছে, ঠোঁটের কোণ দিয়ে পানের রস গড়িয়ে পড়ছে।

রুপ্পনবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, "বসুন, আপনারা বসুন। আমার এখন অনেক কাজ, থাকব না।"

সিংহের মতো তিনি চারদিকে একবার তাকালেন। কিন্তু অন্যেরা তাঁকে সিংহ বলে মনে করল না। তাঁদের চোখে তিনি একজন সাধাসিধে রোগাপাতলা সুন্দর যুবক। তাঁর চোখদুটো কিছুটা ভিজে, ঠোঁট অন্যদিনের চেয়ে বেশি মোলায়েম।

রঙ্গনাথ বলল, "বোসো রুপ্পন, আমিও যাব।"

"না দাদা, আমি একমিনিটও থাকতে পারব না। আমি শুধু বলতে এসেছিলাম যে, আমি আশপাশের গ্রামে সব ঠিক করে এসেছি। এই কলেজের ব্যাপারে সারা অঞ্চলের লোক জোর দিয়ে সত্যি কথা বলবে। সমস্ত লোক আমাদের পক্ষে।"

রুপ্পনবাবু উত্তেজিত হয়ে আছেন। তিনি বলে গেলেন, "বাবা যখন এ-ই চাইছেন তখন এ-ই হোক। তিনিও দেখে নিন, মিথ্যে দিয়ে সত্যি ঢাকা যায় না।"

খান্না মাস্টার তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "বোসো না রুপ্পনবাবু। বলো কী কী করে এসেছ!"

রুপ্পনবাবু বললেন, "একটু তাড়াতাড়ি বোঝার চেষ্টা করুন। কাল পুরো ব্যাপারটা দেখতে পাবেন। এই শিবপালগঞ্জে পাঁচ শ লোকের সামনে ডেপুটি ডাইরেক্টর প্রিন্সিপালকে এক'শ ঘা জুতো লাগাবে। যদি না লাগায় তাহলে আপনারা আমাকে এক শ ঘা জুতো লাগাবেন।"

রুপ্পনবাবু গলা চড়িয়ে বললেন, "আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোন। কালকের ব্যাপার কাল হবে।" তারপর চেঁচিয়ে বললেন, "চলো রঙ্গনাথ দাদা, যাওয়া যাক। মাস্টারমশায়কে বিশ্রাম করতে দাও।"

সোৎসাহে তিনি হাত তুলে ছেলে দু'জনকে যেন আশীর্বাদ করলেন। পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে একদল সৈন্যকে উৎসাহ দিয়ে তাদের অন্য দিক থেকে আক্রমণ করতে বলার মতো করে বললেন, "চালিয়ে যাও, বীর।"

রুপ্পনবাবু ঘরের বাইরে এলেন। তাঁর পেছন পেছন রঙ্গনাথ এল। দু'জনে চুপচাপ কিছুক্ষণ হাঁটলেন। রাস্তায় এসে রঙ্গনাথ রুপ্পনবাবুর কাঁধে একটা হাত রাখল। রুপ্পনবাবু চমকে রঙ্গনাথের দিকে তাকালেন, তারপর অন্যদিকে দেখতে লাগলেন।

রঙ্গনাথ তাঁর কাঁধের ওপর হাতটা রেখে মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "রুপ্পন, তুমি মদ খেয়েছ?"

রুপ্পনবাবু মত্ত হয়ে চলছিলেন, কিন্তু পা টলছিল না। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, "বলো তো হ্যাঁ বলি, আর না বলো তো না বলি।"

"যা সত্যি তা-ই বলো।"

"সত্যি কোন্ চিড়িয়ার নাম? কোন্ বাসায় থাকে? কোন্

জঙ্গলে পাওয়া যায়?" —রুপ্পনবাবু গমকে গমকে হাসলেন, "দাদা, এটা শিবপালগঞ্জ। এখানে কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যে, বলা কঠিন।"

রঙ্গনাথ বাড়ির দিককার রাস্তা বদলে রুপ্পনের একটা কনুই ধরে অন্যদিকে চলল। রুপ্পনবাবু বললেন, "চলো, এ-ও ঠিক আছে। আগে কোনো কালভার্টের ওপর বসে একটু হাওয়া খাওয়া যাক।"

আস্তে আস্তে তাঁরা একটা নির্জন দিকে এগুতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে রুপ্পনবাবু নিজেই বললেন, "কখনও-না-কখনও শুরু করতেই হ'ত। শিবপালগঞ্জে যদি থাকতে হয় তবে এইভাবেই থাকব।"

কিছুটা থেমে অকারণে রেগে উঠে আবার তিনি বললেন, "এখানে মহাত্মাগান্ধী বনলে চলবে না।"

রুপ্পনবাবু রাস্তার ধারে একটা কালভার্টের ওপর বসে পড়লেন। রঙ্গনাথের গা ঘেঁষে বসলেন, তার কাঁধের ওপর সস্নেহে একটা হাতও রাখলেন। তাঁর আচার-ব্যবহারে নতুন কিছু কিংবা মদের প্রভাব দেখা গেল না। রঙ্গনাথ তাঁর কথা খণ্ডন করে বড়োর মতো বলল, "তুমি কী বকছ রুপ্পন? শিবপালগঞ্জের ছুতো করে তোমার আচার-আচরণ খারাপ করা কোনো ভালো কথা নয়। পৃথিবীতে এই একটাই শিবপালগঞ্জ নেই, তোমার-আমার জন্য আরও অনেক জায়গা পড়ে আছে।"

রুপ্পন মাথা নিচু করে বসে ছিলেন, আস্তে করে বললেন, "আমার তো মনে হচ্ছে দাদা, সারা দেশে এই শিবপালগঞ্জই ছড়িয়ে আছে।"

প্রিন্সিপালসাহেবের সামনে অনেক বিপদ। পরশু ডেপুটি ডাইরেক্টর অভ্‌ এডুকেশন তদন্ত করতে আসবেন, ডাকবাংলোয়

সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি কলেজের ক্লার্ককে কয়েকটা নির্দেশ দিলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি নির্দেশ দিতে লাগলেন আর ক্লার্ক চেয়ারে বসে বসে কাঁচা আমের ঠাণ্ডা শরবত খেতে লাগল। সব কথা শুনে ক্লার্ক বলল, "এ রকম চিড়িমার তো রোজই আসছে, আমি আর কত তাদের পেছনে ঘুরব?"

প্রিন্সিপালসাহেব ক্লার্ককে বন্ধুর মতো বললেন, "ডেপুটি ডাইরেক্টর খুশি হয়ে আমাদের কিছু ভালো করুন আর না-ই করুন, অসন্তুষ্ট হয়ে অনেক ক্ষতি করতে পারেন।" কিন্তু এ কথায় ক্লার্ক বিচলিত হ'ল না। সে চুপচাপ শরবতের গেলাসটা খালি করে ফেলল, তারপর তৃপ্তির সঙ্গে একটা ঢেকুর তুলে বলল, "চাচা থাকতে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

চাচা, অর্থাৎ বৈদ্যজী। প্রিন্সিপাল বুঝে নিলেন, ক্লার্ক আজ কাজ করতে চাইছে না। তাকে কাজ করতে বাধ্য করলে বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়বে আর পেটের সেই পুরনো ব্যথাটার কথা বলবে। সেই অবস্থায় সে কখনও কাজ করবে না। "ওঁরই ভরসা" বলে অকারণে বৈদ্যজীর স্তাবকতা করে তিনি বেরিয়ে এলেন। তাঁর বিশ্বস্ত একজন মাস্টারকে ডেকে তাঁকে ঐ নির্দেশগুলো দিতে চাইলেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, সেই মাস্টার একটা ছেলেকে নিয়ে শহরে সিনেমা দেখতে গেছেন। প্রিন্সিপাল বেশ জোরেই বলে উঠলেন, "এতদিন এক মালবীয় ছিলেন, এখন ইনিও ঐ লাইন ধরে নিয়েছেন।"

কালকের ব্যবস্থার ভার কার ওপর অর্পণ করবেন ভাবতে ভাবতে তিনি কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি আর কোনো কাল্পনিক পরিস্থিতিকে অবধী ভাষায় মন খুলে গালাগাল দিতে শুরু করলেন। তাঁর

চাপরাসীটা তখন খড়ম পায়ে, কপালে চন্দন মেখে খট্‌খট্‌ করতে করতে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল; তাঁর গালাগাল শুনে তাঁর দিকে একবার ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল।

প্রিন্সিপালসাহেব বৈদ্যজীর বাড়ির দিকে চলেছেন, কিন্তু মৌসুমের আগের ঝড়জল তাঁর পথ আটকাল। তাঁর চোখ ধুলোয় ভরে গেল। রাস্তার ধারের পানের দোকানের চালটা উড়ে তাঁর কাঁধের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ল। ধুলোর ঝড়ে তিনিও এক গোবরের গাদায় গিয়ে পড়লেন। চপ্পলসুদ্ধ তাঁর পা গোবরে ডুবে গেল। প্রিন্সিপাল খান্নামাস্টারকে গালাগাল দিলেন। ততক্ষণে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমকের সঙ্গে শিল পড়তে আরম্ভ করেছে। তিনি আবার খান্নামাস্টারকে গালাগাল দিলেন। তারপর দু-তিনজন লোককে ধাক্কা দিয়ে, পথে শুয়ে থাকা একটা কুকুরের লেজ মাড়িয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লেন।

ঝড়জল আর শিলার তামাশা শেষ হয়ে গেলে তিনি আবার ধীরে ধীরে বৈদ্যজীর বাড়ির দিকে এগুলেন। রাস্তায় চাষীরা বলতে বলতে চলেছে, খামার থেকে যেসব ফসল এখনও ঘরে তোলা হয় নি তা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এসব কথায় তিনি কান দিলেন না। তাঁর পায়ে গোবর লেগে আছে, পৃথিবীতে এটাই এখন তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা। রাস্তা দিয়ে যেসব চাষী যাচ্ছে তাদের দেখে তিনি ভাবছেন, তারা তাঁর পায়ের অবস্থা দেখে হাসবে। কিন্তু কেউই হাসল না। প্রিন্সিপালসাহেব বৈদ্যজীর বাড়ি পৌঁছে গেলেন।

বৈঠকখানার দরজা বন্ধ ছিল। তিনি কড়া খট্‌খট্‌ করলেন। ধুলোর জন্যই বোধহয় দরজা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দরজা খুলতেই দেখা গেল, তক্তপোশের ওপর বৈদ্যজী, বদ্রী পালোয়ান,

শনিচর আর ছোটে বসে আছেন। তাঁদের সকলের মুখ গম্ভীর। বৈদ্যজী ইশারায় প্রিন্সিপালসাহেবকে ভেতরে আসতে বললেন। প্রিন্সিপালসাহেব উত্তরে তাঁর চিরপরিচিত, উৎসাহপূর্ণ ভাষায় বললেন, "এক ঘটি জল আনতে বলুন, পা ধুয়ে ভেতরে যাই, কারণ আমার পা দুটো গোমাতার বিষ্ঠায় পড়েছিল।"

কিন্তু তাঁর এই পরিহাসে কেউ হাসল না। শনিচর উঠে চুপ-চাপ এক ঘটি জল এগিয়ে দিল। প্রিন্সিপালসাহেব লজ্জায় দাঁত বার করে ভেতরে এলেন। তারপর বৈদ্যজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তাঁর পাশেই বসে পড়লেন।

বদ্রী পালোয়ান জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ব্যাপার প্রিন্সিপাল-সাহেব?"

প্রিন্সিপালসাহেব সাহস করে আর-একবার পরিহাস করার চেষ্টা করলেন, "আমার ব্যাপার তো সব সময়েই চোখা। আপনার ব্যাপার বলুন। কবে বরযাত্রী যেতে হবে?"

উত্তরে বদ্রী পালোয়ান তাঁর দিকে একটা প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, যেন বরযাত্রীর মানে তিনি জানেন না।

বৈদ্যজী বললেন, "কার বরযাত্রী, প্রিন্সিপালসাহেব?"

"আমাদের নতুন ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের। গ্রামের ভেতরেই যেতে হবে তো কী হয়েছে! বরযাত্রী বরযাত্রী। আমিও একটা সিল্কের জামা তৈরি করিয়েছি। দামটা তোমার পকেট থেকেই উশুল করে নেব, কী বলো ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সাহেব?"—প্রিন্সিপালসাহেব হাসতে হাসতে বদ্রী পালোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন। এতক্ষণ খেঁচাখেঁচি আর বিরক্তির মধ্যে থেকে এখন তিনি হালকা হতে চেষ্টা করছেন।

বদ্রী পালোয়ান ততক্ষণে ছোটের সঙ্গে অন্য বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। প্রিন্সিপালের কথা শোনা তিনি জরুরি মনে করলেন না। বৈদ্যজী বললেন, "এ বছর তো বদ্রীর বিবাহ হচ্ছে না। আপনি কার বিবাহের কথা বলছেন?"

"কেন, গয়াদীনজীর···।"

বৈদ্যজী হাত তুলে তাঁকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না। বললেন, "আপনিও শত্রুর প্ররোচনায় পড়েছেন? বড়োই দুঃখের কথা।"

প্রিন্সিপালসাহেব অবাক্ হলেন। গোটা গ্রামে বদ্রী আর বেলার বিয়ে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আর···।

"শত্রুরা গয়াদীনজীর মেয়ের বদনাম করার জন্য এই গুজব রটিয়েছে। আপনি স্বয়ং জানেন, বেলা সাক্ষাৎ দেবী, আর বদ্রী সমস্ত দিক দিয়ে নিষ্কলঙ্ক। সেদিন শহর থেকে ফিরে খোঁজখবর নিয়ে আমি জানতে পারলাম যে, এর পেছনে শত্রুদের চক্রান্ত আছে। আমি বললাম, মেয়ের মঙ্গলের জন্য এখন এই প্রসঙ্গ ভুলে যাওয়াই ভালো। বেচারা গয়াদীনজী তো এই অপবাদে ভয় পেয়ে শহরে পালিয়ে গেছেন। ওখানেই কার সঙ্গে যেন মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন।···ধন্য! এই গ্রামটাও অদ্ভুত।"

বদ্রী পালোয়ান উঠে বাইরে চলে গেলেন। ছোটে অন্যদিকে তাকিয়ে তাঁর খোলা উরুর ওপর ডান হাতটা বোলাতে লাগলেন। তাঁর গেঁয়োপনা দেখাবার এইটেই তাঁর সবচেয়ে ভালো উপায়। শনিচর প্রধান হিসাবে তার দায়িত্ব উপলব্ধি করে বলল, "এই গ্রামকে আমিই ঠিক করব। ক'দিনই-বা হয়েছে আমি প্রধান হয়েছি!"

ব্যাঙেরও জ্বর হতে আরম্ভ করেছে ভেবে ছোটে শতরঞ্চির ওপর

পিচ্ করে থুতু ফেললেন। সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। বৈদ্যজী আবার বলতে শুরু করলেন, "কারও মেয়ে সম্বন্ধে অনেক ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়। কে জানে, কোন্ শত্রু গুজব রটিয়ে দিয়েছিল যে, বদ্রী স্বয়ং গয়াদীনের বাড়িতে সম্বন্ধ করতে চায়।"

ছোটে তাঁর উরুতে হাত বোলানো বন্ধ করে বললেন, "আমি কিছু বললে তো তোমার খারাপ লাগবে, মহারাজ্!"

"তুমি মূর্খ। ততক্ষণই তোমার শোভা, যতক্ষণ না তুমি কিছু বলো।" বৈদ্যজী কড়া স্বরে আরও বললেন, "তোমরাই ছেলেমানুষি করে খুশিমতো কথা ছড়িয়েছ আর গয়াদীনজীকে অপমান করেছ। এখন শান্ত হও। তাঁর মেয়ের বিয়ে নির্বিঘ্নে হয়ে যেতে দাও ব্যস, এখন কথা শেষ হয়েছে। এ প্রসঙ্গ যেন আর না ওঠে।"

কথাটা শেষ করে বৈদ্যজী তাকিয়ায় ভর করে গড়িয়ে পড়লেন, যেন কোনো মুঘল বাদশা কোনো গোলামকে নির্বাসন দিয়েছেন এবং এখন আর কোনো কথা শুনতে তিনি রাজী নন।

তিরিশ

ভারতবর্ষে যখন সাদাচামড়ার রাজত্ব ছিল (ভবিষ্যতে যে ইতিহাস লেখা হবে তাতে যদি অবশ্য আমাদের এ কথা স্বীকার করতে দেওয়া হয়), তখন নদীর কিনারায় অথবা ঘাটে, বনে এবং আম-

বাগানে, অর্থাৎ যেখানেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ কিংবা স্থমিত্রা-নন্দন পন্তের কবিতা আপনা থেকে কণ্ঠে এসে যায়, সেখানেই ডাকবাংলো বানানো হয়েছিল। সেখানে ধুলো-বালি, কলেরা-বসন্ত-প্লেগ, অনশন-দারিদ্র্য, কুরূপতা-অসভ্যতা-অপ্রীতিকরতা প্রভৃতি জিনিস পৌঁছুনো কঠিন ছিল। তু জাতের সাহেবই— সাদা কিংবা কালা— যখন গ্রামে সফরে আসতেন, সেখানেই থাকতেন।

তখন ডাকবাংলোয় থেকে অনায়াসেই তাঁদের সফরকে পিকনিকের রূপ দেওয়া যেত যেমন আজ অনায়াসেই পিকনিককে সফরের রূপ দেওয়া যায়। এই ডাকবাংলোয় বসে সাহেবরা শাসনের সাহায্যে সমস্যা আর সমস্যার সাহায্যে শাসন মজবুত করতেন, গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার, পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে রিসার্চ করতেন, কখনও ছাগল-চরানো নেটিভ মেয়েদের দেখে আশ্চর্য হতেন, কখনও সেই অঞ্চলের নষ্ট মেয়েদের বোঝাতেন কাপড়-চোপড় আর দর্জিদের চক্রান্তসত্ত্বেও প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্যের মানুষের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, কখনও ভেট পাওয়া স্কচ হুইস্কির বোতল খুলতেন, কখনও হাসতেন, কখনও রেগে উঠতেন, কখনও চুপ করে থাকতেন, আবার কখনও জনসাধারণ আর শাসনতন্ত্রের মাঝে পাহাড়ের, মরুভূমির, গোবরের গাদার, নদীর কিংবা পুলের কাজ দিতেন।

এ সব প্রাচীনকালের কথা। এখন গ্রামে শহরেরই বোলবোলা। এখন গ্রামে প্রাইমারি স্কুল আর পঞ্চায়েতঘর হয়েছে আর প্লেগ— যদি না কোনো মানুষই প্লেগ হয়ে যায়— শেষ হয়ে গেছে। এখন কোনো লেখাপড়া জানা, অর্থাৎ ইংরেজী জানা, লোক শহর থেকে গ্রামে গেলে তাকে হারাকিরি বলা হয় না। এমন শয়ে শয়ে দেখা গেছে যে, কালাসাহেব শহর থেকে গ্রামে গেছে এবং তু-একদিন

বস্তিতে থেকে সেখানকার জল খেয়ে কোনোরকম সংক্রামক ব্যাধি বা অসুখ না বাধিয়ে আবার হাসতে হাসতে জ্যান্ত ফিরে এসেছে। এইসব দেখেশুনে গ্রামসম্বন্ধে এখন লোকের মত বদলেছে, যদিও সেখানকার জল সম্বন্ধে এখনও শেষ কথা বলা মুশকিল। তবু দিনরাত ধুলোর ঝড় তোলা জিপের সাহায্যে এটা তো প্রমাণ হয়ে গেছে যে, এতদিন যে ভারতবর্ষ শহরে ছিল তা এখন গ্রামেও ছড়াতে শুরু করেছে।

কিন্তু কালা সাহেবদের এখনও এমন কিছু নমুনা আছে, যারা ডাকবাংলোর প্রেমপাশে আবদ্ধ— যদিও ভেট পাওয়া স্কচের বোতল অনেক আগেই খালি হয়ে গেছে, কম্পাউণ্ডে যেসব ছাগল চরত তা খেয়ে ফেলা হয়েছে এবং সেই ছাগল-চরানো মেয়ে বুড়ী হয়ে গেছে।

ছঙ্গামল বিদ্যালয় ইণ্টার কলেজের তদন্তের জন্য যে ডেপুটি-ডাইরেক্টর অভ এডুকেশনের আসার কথা আছে, তিনি এইরকম এক নমুনা, যদিও একদিক দিয়ে তিনি দুর্লভের মধ্যেও দুর্লভ। যখন তিনি সাব-ডেপুটি ইন্সপেক্টর অভ স্কুল্‌স্ ছিলেন তখনই তাঁর মনে ইচ্ছা ছিল— যেমন শেরশাহের মনে দিল্লীর সিংহাসনে বসার ইচ্ছা ছিল— প্রোমোশন পেয়ে এই ডাকবাংলোয় থাকবেন আর পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে তাঁর ভক্তিমতী স্ত্রীকে গঙ্গাস্নান করাবেন আর ঐ ডাকবাংলোয় থেকে মহারাণা প্রতাপ সম্বন্ধে একটা খণ্ডকাব্য লিখবেন যেটা ইণ্টারমিডিয়েটে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে চলবে আর অমুক ডাকবাংলোয় থেকে ফিটকরিহা সাধুর কুটিরে যাবেন আর তমুক ডাকবাংলোয় থেকে গীতা পাঠ করতে করতে এ যাবৎ বোকামির জন্য যেসব সুযোগ হারিয়েছেন তা স্মরণ করে অস্থির হৃদয়কে সান্ত্বনা দেবেন, আর…।

আর এখন ডেপুটি ডাইরেক্টর হবার পর তিনি ভেবেছিলেন, শহরের, "তুমুল কোলাহল কলহ" থেকে বাঁচার জন্য শিবপালগঞ্জের ডাকবাংলোর দিকে আসবেন। এখানে এসে তিনি আখ চুষবেন, সিঙাড়া খাবেন, ভুট্টা চিবোবেন আর রোজ পাঁচ শ করে ফাইল পটবেন।

ছোটে পালোয়ান ডাকবাংলোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গর্জন করছেন, "জ্ঞানেওয়ালা বিলেত চলে গেছে, কিন্তু তাদের পুত্তুরগুলোকে এখানে রেখে গেছে। সোজা গ্রামে এলে ফটাফট সেখানেই কথা হয়ে যেত, কিন্তু তাঁর ঘোড়া তো সোজা ডাকবাংলোয় এসে থামে। সারা গ্রামের লোক মাইলখানেক হেঁটে এখান পর্যন্ত এসেছে, আর টুটরুঁ-টুঁ বসে আছে। সকাল ন'টার সময় এসেছে, আর এখন বেলা একটা বাজে। এক-দেড় শ লোক হাতের ওপর হাত রেখে ছটফট করছে। এখন সন্ধেবেলায় পোঁ পোঁ করতে করতে মোটরে চড়ে তিনি আসবেন, আর এসেই বলবেন, 'হেঁ হেঁ ভাই, দেরি হয়ে গেছে।' আর তোমরাও হচ্ছ নির্লজ্জ, দাঁত বার করে জবাব দেবে, 'হেঁ হেঁ হেঁ।' কথাটা ভেবেই আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠছে।"

ডাকবাংলোর সামনে একটা সবুজ লন আছে। পাশের গমের ক্ষেতে জল-বিনা গাছ শুকিয়ে যাক তাতে ক্ষতি নেই, লনটা কিন্তু সবসময় সবুজ থাকে। চারদিকে দেয়ালের ধারে ধারে আমগাছ। গাছের আম বেশিরভাগই খায় এখানকার মালী আর চৌকিদার, আশপাশের তিন-চারটে গুণ্ডা, আর শহরের এক এঞ্জিনীয়ার। তবে এখানকার বাতাসের ওপর যেমন জনসাধারণের অধিকার আছে

তেমনি এইসব গাছের ছায়ার ওপরও আছে। এখন গ্রামের দুটো দলই সেই ছায়া কষে উপভোগ করছে।

ডাকবাংলোর দু ধারে গাছের ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে ছোটো ছোটো দুটো শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। ফরাসের ওপর শতরঞ্চি আর গালিচা বিছানো হয়েছে। এই দুই শামিয়ানার একটাতে প্রিন্সিপাল-সাহেব আর তাঁর সমর্থকরা আছেন, অন্যটাতে আছেন খান্না মাস্টারের দল। প্রিন্সিপালসাহেবের শামিয়ানায় এই সময়ে তিনি আর বদ্রী পালোয়ান ছাড়া জন-ষাটেক লোক আছেন। তাঁদের মধ্যে ছোটে পালোয়ানও আছেন। তিনি একটা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে ললিত ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে ডেপুটি-ডাইরেক্টরের আচরণ সম্বন্ধে তাঁর রায় দিচ্ছেন। অন্যদিকের শামিয়ানায় খান্না মাস্টার আর রুপ্পনবাবু আর তাঁদের সমর্থক কয়েকজন মাস্টার আর রামাধীন ভিখমখেড়বীর কয়েকজন চেলা-চামুণ্ডা রয়েছে। রামাধীন ভিখমখেড়বী প্রত্যাশিতভাবেই আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আসেন নি।

ছোটে পালোয়ানের চিৎকার, অন্যসব লোকদের বেহিসাবী কথাবার্তা, খাওয়াদাওয়া, শোবার চেষ্টা, হাই তোলা, খৈনী-তামাক, ছিলিম-বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদির উৎসবে সংগীতধারাও বইছে।

আরম্ভ হয়েছিল ট্রানজিস্টর দিয়ে। দুই শিবিরে এমন কিছু শৌখিন লোক আছে, যাদের কাঁধে গামছা, কানে চুনের দলা, পিঠে বন্দুক, এক হাতে তিতিরের খাঁচা আর অন্য হাতে ট্রানজিস্টর। দেখতে দেখতে দুই শিবিরেই ট্রানজিস্টরে বিবিধভারতীর "বালমা, ছলিয়া, বেইমান, দাগাবাজ" ইত্যাদি গুঞ্জরিত হতে লাগল। বেলা যখন এগারোটা তখন খান্না মাস্টারের শিবিরে কে জানে কোথা থেকে রেকর্ড আর অ্যাম্প্লিফায়ার-সুদ্ধ একটা গ্র্যামোফোন এসে গেল,

আর সওয়া এগারোটা পর্যন্ত হাউ হাউ করে "বেইমান-দাগাবাজ"-ওয়ালা গানগুলোকে ভুলিয়ে দিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর বিশ্বপ্রেমের সংগীত শুরু করল—"মুঝকো অপনে গল্লে লগা লো, এ মেরে হমরাহী।"

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এই গানের অক্ষরে অক্ষরে শ্বেতপায়রা উড়ছে আর জলপাইয়ের পাতা দুলছে। কিন্তু প্রিন্সিপালসাহেবের শিবিরে এটাকে যুদ্ধ-ঘোষণা বলে মনে করা হ'ল, আর দেখতে দেখতে সেখানেও রেকর্ড আর অ্যাম্প্লিফায়ার-সহ একটা গ্র্যামোফোন আত্মপ্রকাশ করল আর চিৎকার করে গাইতে লাগল— "আ, গলে লগ জা।"

দেহাতী বরযাত্রীতে এইরকম অবস্থায় যেমন হয়, এখানেও তা-ই হ'ল— এই ঘোষণার পর দুদিক থেকে ফিল্মী গানের সংঘর্ষ বেধে গেল।

এইরকম পরিবেশে কে অসন্তুষ্ট হতে পারে? কেউ না, কেবল ছোটে পালোয়ান ছাড়া। কিন্তু একদিক দিয়ে ছোটেপালোয়ানের অসন্তোষটা ন্যায্য। সত্যিই কিছু লোক সকাল আটটার সময় এখানে এসেছে, কারণ ডেপুটি ডাইরেক্টরের ন'টার সময় আসার কথা ছিল। দু-তিন ঘণ্টা দেরি তো একেবারে গোরু অফিসারদেরও মানিয়ে যায় (গোরুরা তো পাঁচটার সময় ঘরে ফেরার সময় কারও ক্ষেতে গিয়ে ফসল খেতে শুরু করে আর দু-চার ঘা লাঠির বাড়ি খেয়ে সাতটা-আটটার সময় ফিরে আসে), কিন্তু পাঁচ ঘণ্টা কেটে যাওয়ায় ছোটে পালোয়ানের বিরক্ত হওয়া খুবই সংগত।

ভালোমানুষের মতো প্রিন্সিপালসাহেব বললেন, "কী করবেন? দিনরাত তাঁর মিটিং থাকে। যখনই কোথাও যাবার জন্য তৈরি হয়েছেন, অমনি একটা-না-একটা মিটিং এসে যায়।"

তুটো বাজছে। দিন বেশ গরম হয়ে উঠেছে। লোকে বুঝতে পারছে, গ্র্যামোফোনে একই রেকর্ড সমানে বাজানো হচ্ছে। লোকে বার বার উঠে উঠে ঝোপের পেছনে যেতে আরম্ভ করেছে আর তুই পার্টির লিডারদের মনে ভয় ধরেছে, এমন না হয় "শালারা মুততে গিয়ে মুততেই থাকে।" ছোটে পালোয়ান এখন গাছের তলা থেকে সরে শামিয়ানার ভেতরে এসেছেন। রুপ্পনবাবু সম্বন্ধে বলছেন, "রুপ্পন শত্রুদের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। আর কাউকে না পেয়ে বাপের ওপরই ফলিন্ হয়ে গেছে। আমিও আমার বাপ মহারাজ কুশহরপ্রসাদের সঙ্গে অনেক মারপিট করেছি, কিন্তু বাইরের কার সাধ্য ছিল তাঁকে তুই-তোকারি করে! এখানে এই শালা খান্না-মান্না তাঁর বাপকে ধরে জুতোচ্ছে আর তিনি হেলতে-তুলতে তাদের পেছন পেছন ঘুরছেন।"

বদ্রীপালোয়ান শামিয়ানার এক কোণে শুয়ে ছিলেন, পুরো কথাটা না শুনেই তিনি বুঝে নিলেন, ছোটে পালোয়ান রুপ্পনকে নিজের চেয়েও ছোটো করে পেশ করতে চাইছেন। বদ্রীপালোয়ান একজন সিনিয়র ওস্তাদের ভঙ্গিতে বললেন, "ব্যস, ব্যস, ব্যস, জিভে লাগাম লাগাও।"

বেলা প্রায় চারটের সময় দেখা গেল, বৈদ্যজী শনিচরকে সঙ্গে করে ডাকবাংলোর দিকে আসছেন। অবস্থা বুঝে শহর থেকে আসা গ্র্যামোফোনওয়ালারা এমন একখানা গান লাগিয়ে দিল, যার আরম্ভ, "নজর লাগী রাজা তেরে বাংলে পর।"

শুনেই ছোটে পালোয়ান এমন জোরে ধমকে উঠলেন যে, গ্র্যামোফোন আপনা থেকেই থেমে গেল। লোকেরা যে যার জায়গায়

ঠিক হয়ে বসল, কিছু লোক আবার উঠেও দাঁড়াল। শুধু বদ্রী-পালোয়ান একটা গাছের গুঁড়ির মতো এক কোণে পড়ে রইলেন।

বৈদ্যজী এগিয়ে গিয়ে নির্বিকারভাবে একটা গালিচার ওপর বসে পড়লেন। আপনা থেকেই তাঁর পেছনে তাকিয়া এসে গেল। শনিচর আর প্রিন্সিপাল একধারে দাঁড়িয়ে পড়লেন, যেন তাঁদের চামর দোলাতে হবে।

বৈদ্যজী বসতেই মনে হ'ল, কোনো চক্রবর্তী মহারাজ সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর তুলনায় অন্য শামিয়ানায় বসে থাকা খান্নামাস্টার আর রুপ্পনবাবু ওঁদের একেবারে লুচ্চা-লোফার বলে মনে হচ্ছে।

বৈদ্যজী প্রিন্সিপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী খবর ?"

প্রিন্সিপালসাহেব সোৎসাহে বলতে লাগলেন, "আমাদের লোকেরা সব আশেপাশেই রয়েছে। ওদিকে ওদের বহুমূত্ররোগে ধরেছে।"

শনিচর মজা করে বলে উঠল, "তা হলে বলো, রুপ্পনবাবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি। বেশি অসুবিধে বলে মহারাজের দাওয়াখানা থেকে এক এক বড়ি জোলাপ দিয়ে দিই সকলকে।"

বৈদ্যজীর চোখ-মুখের প্রসন্নতা মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন, "ঐ নীচটার নাম কোরো না।" একটু থেমে খানিকটা সুস্থ হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "ডেপুটি ডাইরেক্টরের কোনো খবর পাওয়া গেল না এখনও ? সূর্যাস্ত হতে তো আর দেরি নেই !"

পাছে কথাটা অফিসারদের কানে চলে যায়, এই ভেবে প্রিন্সিপাল লেজ-নাড়ানো ভঙ্গিতে বললেন, "এত বড়ো অফিসার, কোনো মিটিঙে আটকে পড়েছেন হয়তো, এখনই এসে পড়বেন।"

"কাউকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

প্রিন্সিপাল জানালেন, "সে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। মাস্টার

মোতিরাম সকালেই চলে গেছেন। তিনি তো এ পার্টিরও নন, ও পার্টিরও নন। তাঁর চিন্তা তো তাঁর আটা-চাকি নিয়ে। তাই আমি তাঁকে বললাম, 'মাস্টারমশায়, তুমিই যাও। তুমি বয়স্ক লোক, ডি. ডি. সাহেবের সঙ্গে গাড়িতে বসে চলে এস। কেউ তোমাকে বলতে পারবে না যে, তুমি আমাদের তরফ থেকে ডি. ডি.: সাহেবের কান ভারী করতে গিয়েছিলে।"

বৈদ্যজী জনতার মনোরঞ্জনের জন্য গল্প শুরু করলেন, "তখন আমাদের এখানে পন্তজীর যুগ চলছে। সবে রাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের একটা মিটিং হবে, দশটার সময় পন্তজীর আসার কথা। জেলাধীশ, পুলিস ক্যাপ্টেন— সবাই চাপরাস বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন। এগারোটা বাজল, বারোটা বাজল, তারপর একটাও বাজল, তারপর দুটোও…।"

গল্প চলতে থাকল। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজতে চলেছে। প্রিন্সিপালসাহেব দেখলেন, তাঁর শামিয়ানা থেকেও কিছু লোক উঠে উঠে ঝোপের দিকে যেতে আরম্ভ করেছে, এবং বহুমূত্ররোগ এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, অনেকে ঝোপের পেছন থেকে আর ফিরে আসছে না। তিনি ছোটে পালোয়ানকে ডেকে বললেন, "মেম্বারসাহেব, এটা তো ঠিক হচ্ছে না।"

ছোটে পালোয়ান বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, "তা আমি কী করব? লোকের হাগা-মোতাও বন্ধ করে দেব?"

গ্র্যামোফোনের গানও এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। লোকে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেছে। সূর্য ডোবার সময় হয়ে গেছে। প্রিন্সিপালসাহেব কিছুটা দূরে ডাকবাংলোর ধারে রাস্তার কিনারায় একটা আমগাছের দিকে

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। তাকিয়ে তাকিয়ে গাছের একটা শুকনো ডাল দেখছেন। ডালের সঙ্গে একটা কাস্তে আটকে আছে। কাস্তের সঙ্গে একটা বাঁশ বাঁধা আছে। বাঁশের নিচের দিকটা রয়েছে একটা মেয়ের হাতে। মেয়েটার বয়েস বছর কুড়ি। প্রিন্সিপালসাহেবের দৃষ্টি মেয়েটার দিকে নয়, ওপরের শুকনো ডালটার দিকে। হঠাৎ তিনি চমকে উঠে রাস্তার অন্যদিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "বাসটা এখানে থামছে কেন?"

সবাই তাড়াতাড়ি করে ফটকের দিকে যেতে আরম্ভ করেছে। সতিসত্যিই বাসটা ডাকবাংলোর সামনে থেমে পড়ল।

একটা বড়ো ঝোলা নিয়ে বাস থেকে মাস্টার মোতিরাম নামলেন। দুদিক থেকে লোকে তাঁকে ঘিরে ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বৈদ্যজীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন, "ডেপুটি-ডাইরেক্টর-সাহেব আজ আসছেন না।"

খবরটার ঘোষণা আগেই অনানুষ্ঠানিকভাবে হয়ে গেছে, কারণ চারদিকে হৈচৈ শুরু হয়েছে আর যাদের বহুমূত্ররোগ ছিল না তারাও দৌড়োদৌড়ি করে ওদিক-ওদিক যেতে আরম্ভ করেছে।

প্রিন্সিপালসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হলে? আবার কবে আসবেন বলেছেন?"

"কিছু বলা যায় না। আজ তো তিনি শহরেই ছিলেন না। তিন-চারদিন হ'ল বাইরে সফরে গেছেন, ফেরেন নি।"

"কবে নাগাদ ফিরবেন?"

"কী করে বলব? কেউ কিছু জানে না। কেউ বলছে, চারদিন পরে আসবেন; আবার কেউ বলছে, পাঁচদিন পরে। আমার বিশ্বাস, ফিরতে ফিরতে ছ-সাতদিন হবে।"

বৈদ্যজী চোখ বুজে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হলে আপনি দুপুরেই ফিরে এলেন না কেন? লোকের কত কষ্ট হ'ল!"

মাস্টার মোতিরাম বিনয়ে ঝুঁকে পড়লেন। একেবারে বেঁকে গিয়ে বললেন, "কী করে আসব মহারাজ! এটা কেনার ছিল।"—ঝোলাটা দেখিয়ে বললেন, "পুরনো চাকি, একটা-না-একটা যন্ত্র ভাঙতেই থাকে। কত জায়গায় যে ঘুরলাম! তারপর পুরনো যন্ত্রপাতির বাজারে··· ।"

মাস্টার মোতিরামের শ্রোতাদের মধ্যে রঙ্গনাথও ছিল। শত্রুপক্ষের তরফ থেকে পুরো খবর নেবার জন্যই হয়তো সে এসেছে। রঙ্গনাথ যখন আস্তে করে চলে যাবার উপক্রম করছে তখন বৈদ্যজী তাকে ডাকলেন। রঙ্গনাথ বৈদ্যজীর কাছে এসে বসে পড়ল।

বৈদ্যজী রঙ্গনাথকে দেখে মুচকি হাসলেন। মুচকি হেসে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। রঙ্গনাথ কিছুক্ষণের জন্য একটু ঘাবড়ে গেল, তারপর সাহস করে বলল, "কী আদেশ মামা?"

বৈদ্যজী মধুর স্বরে বললেন, "আদেশ কিছুই নয়। এ তো ধর্মযুদ্ধ। তোমার মনে হচ্ছে, ঐ দু-চারজন অধ্যাপক ঠিক পথে চলছেন, সুতরাং তুমি তাঁদের সমর্থন করছ। কিন্তু ঠিক পথ কী আর বেঠিক পথ কী, কখনও-না-কখনও তা তুমি বুঝতে পারবেই। যখন পারবে তখন তুমি তোমার আগের স্থিতিতে আসবে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি আবার বললেন, "তুমি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান। তোমাকে নিয়ে আমার চিন্তা নেই। আমার চিন্তা রুপ্পনকে নিয়ে।"

কথায় প্রাণ আনার জন্য প্রিন্সিপাল উল্লসিত ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, "আরে না মহারাজ, আপনি রঙ্গনাথবাবুকে চেনেন না। উনি একজন বড়ো রাজনীতিজ্ঞ। ওদিককার অবস্থা আগেই বুঝে নিয়েছেন, ওঁকে বোঝাবার দরকার নেই।"

বৈদ্যজী আবার মুচকি হাসলেন, "ধর্মযুদ্ধে বোঝাবুঝির কিছু নেই, আছে বিশ্বাস। তোমার যখন এই বিশ্বাস হয়েছে যে, আমরা দোষী তখন চিন্তার কিছু নেই, সবলে আমাদের বিরোধিতা করো। যেদিন আমার প্রাণটার দরকার হবে, বোলো। পিতামহ ভীষ্মের মতো আমি নিজেই আমার মৃত্যুর দিন স্থির করে নেব।"

রঙ্গনাথ এ কথার উত্তর দিতে পারল না। সে বলল, "আপনি একটু ভুল বুঝছেন।"

বৈদ্যজীর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। তিনি চিৎকার করে বললেন, "না, ভুল ওঁরা বুঝছেন। আমি গণতান্ত্রিক পথে চলি। সবাইকে বলার স্বাধীনতা দিই। প্রথম থেকেই অধ্যাপকরা— যাঁরা আমার গোলাম— আমার বিরোধিতা করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এরও একটা সীমা আছে, কী বলো প্রিন্সিপালসাহেব ?"

প্রিন্সিপালসাহেব দৃষ্টি নিচু করে বললেন, "আপনার সামনে আমি কী বলতে পারি ? তবে আপনি না থাকলে অনেক আগেই আমি ইস্তফা দিয়ে চলে যেতাম।"

"কেন আপনি চলে যেতেন ? এখন এই অধ্যায় শেষ করার সময় এসে গেছে। দাঁড়ান, আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি।"

বৈদ্যজী ছোটেকে ডেকে বললেন, "ছোটে, ওদিককার শামিয়ানায় চলে যাও। খান্না আর মালবীয়কে ডেকে নিয়ে এসো। রুপ্পনকেও সঙ্গে এনো। ওঁরা যদি না আসেন তো আমরাই ওখানে যাব।

আর দেখো, জনতাকে বলে দাও যে, তারা বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুক। প্রিন্সিপালসাহেব, তুমি ওদিকে গিয়ে জনতাকে ধন্যবাদ দাও।”

কিছুক্ষণের মধ্যে দুটো শামিয়ানাই ফাঁকা হয়ে গেল। খান্না মাস্টারের শামিয়ানা একটু আগেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, কারণ ওদিককার লোকেদের বহুমূত্ররোগ আটকানোর জন্য ছোটে আর বদ্রী পালোয়ানের মতো লোক ছিলেন না. আর ডেপুটি ডাইরেক্টর ধোকা দিয়েছেন, এই খবরটা শোনা মাত্রই অনেক লোক পালিয়ে গিয়েছিল। ঐ শামিয়ানায় এখন যারা মাইক্রোফোন-গ্র্যামোফোন রেকর্ড আর জলের ভাঁড় গুছোচ্ছে, কেবল তারাই আছে বেশির ভাগ। এদিকে বৈদ্যজীর শামিয়ানায় আছেন বদ্রী পালোয়ান, ছোটে, শনিচর, প্রিন্সিপালসাহেব, বৈদ্যজী, দু-চারজন বিশিষ্ট লোক আর বদ্রীর আখড়ার কয়েকজন গুণ্ডা।

বৈদ্যজীর তলব পেয়ে খান্না, মালবীয় আর তাঁদের পক্ষের দুজন মাস্টার এবং রুপ্পনবাবু বেপরোয়াভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে বলতে এগিয়ে এলেন, এসেই বৈদ্যজীর সামনে বসে পড়লেন। খান্না মাস্টার বললেন, “আপনি স্মরণ করেছেন?”

অন্ধকার হয়ে আসছে। আবছা অন্ধকারে জঙ্গলের মতো বাগান, শামিয়ানা, গালিচা— সবকিছু মিলিয়ে যেন একটা সম্মোহন সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে, কোনো শাহানশাহ্ দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যে পৌঁছে সন্ধ্যার সময় কোনো পাহাড়ী তল্লাটে তাঁর দরবারীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করছেন আর কয়েকজন বিদ্রোহী জায়গীরদারকে ধরে এনে তাঁর সামনে হাজির করা হয়েছে।

বৈদ্যজী তাঁর ভাষণ শুরু করলেন, “খান্নাজী আর মালবীয়জী,

আমি আপনাদের এখানে আত্মীয় মনে করে ডেকে পাঠিয়েছি। প্রিন্সিপালের সঙ্গে আপনাদের পারস্পরিক বিরোধ বেড়ে গেছে। মকদ্দমা হচ্ছে। খোলাখুলি গালিগালাজ চলছে, মারামারির প্রস্তুতি হচ্ছে। আমি আপনাদের দোষ দিচ্ছি না। দোষ যে-কোনো লোকের হতে পারে। আমার নিজেরও দোষ আছে। সুতরাং আমি কী করে বলব, কার দোষ? তবে একটা কথা আমি বুঝতে পারছি, পরিস্থিতি ভীষণ হয়ে উঠেছে। তার সমাধান হওয়া দরকার।"

খান্না বললেন, "আমাকেও আমার কথা বলতে দিন।"

"না।"— বৈদ্যজী গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "না, না, না। আপনি অনেকবার আপনার কথা বলেছেন, অনেক জায়গায় বলেছেন, অনেকভাবে বলেছেন। প্রিন্সিপালও তাঁর কথা বলেছেন। কেবল একজন এখনও পর্যন্ত তাঁর কথা বলেন নি। সেই একজন আমি। আজ কেবল আমিই আমার কথা বলব। এই বিদ্যালয় আমার তৈরি। একে আমি আমার রক্ত দিয়ে বড়ো করেছি। আপনারা দু পক্ষই কেবল বেতনভোগী। এখানে না হলেও অন্য কোথাও গিয়ে আপনারা অধ্যাপক হতে পারবেন। ভালো বেতন পেতে পারবেন। কিন্তু আমাকে এখানেই থাকতে হবে। যদি এই বিদ্যালয় ভালোভাবে চলে তো আমি আমার চেষ্টা সফল হয়েছে মনে করব। যদি এই বিদ্যালয় দলবাজিতে নষ্ট হয়ে যায় তো আমিই নষ্ট হয়েছি মনে করব। আমার মনে কষ্ট আছে, অনেক কষ্ট। অন্তরে ব্যথা আছে। আমার ব্যথা আপনারা বুঝতে পারবেন না।"

বৈদ্যজী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। গোটা শামিয়ানা থমথম

করতে লাগল। বৈদ্যজী আবার বলতে শুরু করলেন, “এখন আমি একটিমাত্র পথ দেখতে পাচ্ছি। আমার মন স্থির করে ফেলেছি। আপনাদের কাছে আমার করবদ্ধ প্রার্থনা, আপনারা আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিন। আপনাদের কাছে ঐ একটাই পথ, আপনাদের ঐ পথেই চলতে হবে। খান্নাজী আর মালবীয়জী, আমি আর কাউকে বলছি না, কেবল আপনাদের বলছি— আপনাদের ইস্তফা দিতে হবে।”

খান্না বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, “কিন্তু··· ।”

“না।”— দয়ার্দ্র অথচ কঠোর স্বরে বৈদ্যজী বললেন, “না। আমি আগেই বলেছি, আজ কেবল আমিই বলব। আমি বলছি, আপনাদের ইস্তফা দিতে হবে। আজ আর এখুনি, এখানে আর এই সময়েই আপনাদের ইস্তফা দিতে হবে। এ কথা আমি ক্রোধের বশে বলছি না, ভেবেচিন্তে বলছি। আপনাদের মঙ্গলের জন্য বলছি, বিদ্যালয়ের মঙ্গলের জন্য বলছি, গোটা সমাজের মঙ্গলের জন্য বলছি। এ-ই আমার বিনম্র নিবেদন। আপনারা আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করবেন না। আপনারা এখুনি ইস্তফা দিয়ে দিন। পরে আপনারা যা ইচ্ছে, বলার স্বাধীনতা পাবেন। ইচ্ছে হলে এ কথাও বলতে পারবেন যে, আপনাদের দিয়ে জোর করে ইস্তফা নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে মকদ্দমা করার স্বাধীনতাও আপনাদের থাকবে। কিন্তু আমার নিবেদন, এখন এই বিদ্যালয়ের হিতৈষী হিসাবে আপনারা স্বেচ্ছায় চুপচাপ ইস্তফা দিয়ে দিন। আপনারা আমার কাছে অনেককিছু চেয়েছেন, অনেক কিছু পেয়েছেন। আমি কখনও কিছু চাই নি। আজ এই বিদ্যালয়ের নামে কেবল আপনাদের ইস্তফা চাইছি। আমার প্রার্থনা··· ।”

এতক্ষণে রুপ্পনবাবু তাঁর জায়গায় উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর গলা কাঁপছে। তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলে উত্তেজনার দরুন একটা কথার সঙ্গে আর-একটা কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

রুপ্পনবাবু বললেন, "এমনটা হতে পারে না। আপনি জোর করে এঁদের দিয়ে ইস্তফা লেখাতে পারেন না। এঁরা ইস্তফা দেবেন না।"

বৈদ্যজী রুপ্পনবাবুর কথায় কান দিলেন না। প্রিন্সিপালকে তিনি বললেন, "আপনার কাছে টাইপ-করা কাগজটা আছে না? আছে? তা হলে ওদিকে নিয়ে যান। ছোটে, তুমি খান্নাজী আর মালবীয়জীকে ওদিকে নিয়ে যাও। এঁরা বুদ্ধিমান, সব বুঝবেন। যাও বদ্রী, তুমিও যাও।"

তারপর বৈদ্যজী চিৎকার করে উঠলেন। চিৎকারটা এমন আকস্মিক আর অদ্ভুত যে, বদ্রীপালোয়ান লাফিয়ে তাঁর সামনে চলে এলেন। অন্যরাও তাঁর কাছে এলেন। বৈদ্যজী চিৎকার করে বললেন, "আর এই রুপ্পন! ও মূর্খ! নীচ! পশু! পতিত! বিশ্বাসঘাতক!"

তিনি এইরকমভাবে বলতে লাগলেন আর প্রমাণ করতে থাকলেন যে, গালাগালের ব্যাপারেও সংস্কৃত দুর্বল ভাষা নয়। কিছুটা তাঁর চিৎকারের কঠোরতায়, কিছুটা সংস্কৃতের প্রকোপে লোকে থ' বনে গেল। তারা এই প্রথম বৈদ্যজীর এমন উগ্রমূর্তি দেখল।

বৈদ্যজী গালিচার ওপর বসে তাঁর হাঁটুদুটো ইস্পাতের পিস্টনের মতো চালনা করতে লাগলেন আর চিৎকার করে বলতে থাকলেন, "তুই নেতা হয়েছিস? আমার বিরোধিতা করে তুই নেতা হতে চাস? তা হলে দেখ, এখুনি তোকে উপযুক্ত শিক্ষা দিচ্ছি।"

তাঁর গলার স্বর আরও কাঁপতে লাগল। তিনি বলতে লাগলেন,

"আশা করেছিলাম, বৃদ্ধ বয়েসটা শান্তিতে কাটবে। গ্রামসভার ঝগড়া মিটিয়ে ফেলেছি। সমবায় সঙ্ঘ ছিল, ওটা বদ্রীকে দিয়েছি। ভেবেছিলাম, এই কলেজের দায়িত্ব তোকে দিয়ে যাব। এ ছাড়া আর আমার কাছে কী আছে যা দিতে পারি? কিন্তু নীচ, তুই বিশ্বাসঘাতকতা করলি? যা, এখন আর তুই কিছুই পাবি না।"

বৈদ্যজীর গলার স্বরে একটা অদ্ভুত অস্থিরতা এসে গেল। তিনি ঘোষণা করলেন, "যা, তোকে আমি আমার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করলাম। সবাই শুনে রাখো, আমার পরে বদ্রীই এই কলেজের ম্যানেজর হবে। এ-ই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। রুপ্পন কিছুই পাবে না।"

বলতে বলতে তাঁর গলা বুজে এল। ক্রোধে আর হতাশায় তাঁর চোখদুটো জলে ছলছল করতে লাগল। রঙ্গনাথের মনে হ'ল, সবাই ঘুরে তাকেই দেখছে। সে মাথা নিচু করল।

যখন রুপ্পনবাবু উঠে ফটকের দিকে পা বাড়ালেন তখন সকলের হুঁশ হ'ল। বৈদ্যজী তাঁর চোখ মুছছেন। লোকেদের মধ্যে হঠাৎ নড়াচড়া শুরু হ'ল। তারা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ডাকবাংলোর বারান্দায় একটা লণ্ঠন জ্বলছে। সেখানে মালবীয় জোরে জোরে কী বলতে শুরু করেছেন। ছোটে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ধীরে মাস্টার, ধীরে।"

প্রিন্সিপাল শক্ত করে খান্নার হাতটা ধরে বললেন, "এসো মাস্টার-মশায়, আমরা ওদিকে যাই। আমাদের ঝগড়া শেষ হয়ে গেল। আজ থেকে আবার আমরা বন্ধু হলাম।"

আশা না থাকলেও এইরকম রাত্রির পর সকাল হ'ল।

রাত্রে রঙ্গনাথ ভালো করে ঘুমোতে পারে নি, চিন্তা করতেও পারে নি। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙতেই নিজের সম্বন্ধে সে একটা কথা ভেবে নিল। কয়েকমাস আগে একটা বড়ো রকমের অসুখ থেকে উঠে এখানে সে কেবল শরীর সারাতে এসেছিল। হঠাৎ সে ভাবল, তার শরীর সেরে গেছে।

পাশে রুপ্পনবাবুর চারপাই খালি পড়ে আছে। কে জানে, সারা রাত তিনি কোথায় ছিলেন। কোনো কোনো ব্যাপারে রুপ্পনবাবুর ওপর রঙ্গনাথের পুরো ভরসা আছে। রঙ্গনাথ জানে, রুপ্পনবাবু যখন বেকুব হন তখন নিজের ইচ্ছেতেই হন। বেকুব হওয়া তাঁর পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়, শখ— অনেকটা আয়েশ। তাই রঙ্গনাথের বিশ্বাস আছে যে, বৈদ্যজীর হাহাকার শুনে তিনি মদের দোকানে যান নি। দুঃখ পেয়ে মদের দোকানে যাবার কথা তাঁর হয়তো মনেই হয় নি, কারণ তিনি "দেবদাস" পড়েন নি, সিনেমাও দেখেন নি। তিনি মন্দিরের দিকেও যান নি, কারণ সঙ্কটে পড়ে মন্দিরে যারা যায়, রুপ্পনবাবুর চরিত্র তাদের মতো নয়।

তা হলে তিনি কোথায় গেছেন? কলেজে হরতাল করানোর জন্য তাঁর শাগরেদদের জড়ো করছেন? কলেজে আগুন লাগানোর জন্য, কি প্রিন্সিপালকে মারার জন্য, কিংবা অকারণে বাজার লুঠ করানোর জন্য কোনো বিদ্রোহী দল গঠন করছেন? অথবা তিনি শিক্ষা-ব্যবসার বিখ্যাত ফরম্যুলা অনুসারে প্রতিবেশী কোনো গ্রামে খান্না মাস্টারকে প্রিন্সিপালের পদে অভিষিক্ত করে তাঁর জন্য ছঙ্গামল বিদ্যালয় ইণ্টার কলেজের মতো অন্য একটা কলেজ খাড়া করতে চলেছেন?

রঙ্গনাথ ভাবল, নিশ্চয় তিনি এমন কিছু করতে যাচ্ছেন। কারণ,

বৈদ্যজীর ক্রোধের প্রকাশ দেখে রুপ্পনবাবু যখন সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব নরম হয় নি, বরং জেগে উঠেছিল।

বৈদ্যজী রোজ সকালে অনেক দূর পর্যন্ত বেড়াতে যান। আজ এখনও তিনি ফেরেন নি। রঙ্গনাথ জানে, এখন বৈদ্যজীর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলা মুশকিল হবে, আর সে অস্বাভাবিকভাবে কথা বলতে রাজী নয়। সে নিজেই নিজেকে বলল, বিরোধের প্রথম দফাতেই তুমি লুটিয়ে পড়লে! এখন তোমার নিজের ওজনটা বোঝা উচিত। এই জায়গাটা ছেড়ে দেওয়া উচিত— মামা ফিরে আসার আগেই।

শনিচরের দোকানটা খুলেছে। দু'জন লোক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নাটকীয়ভাবে লড়াই করছে। লড়াই শাব্দিক, তার্কিক এবং এখনও পর্যন্ত অহিংসই আছে। ঐ দু'জনের মধ্যে একজন আর-একজনের ক্ষেতের খালের জল কেটে তার নিজের জমিতে নিয়ে এসেছে। তারা ঝগড়ার নিষ্পত্তির জন্য গ্রামসভার প্রধানের কাছে এসেছে আর নিষ্পত্তির আগে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। দু' তরফ থেকেই অঝোর ধারায় গালাগাল বর্ষিত হচ্ছে— এমন গালাগাল সাহিত্যে আর শিল্পে, খবরের কাগজে, রেডিওয় আর সিনেমায় নয়, কেবল বাস্তব জীবনেই দেখা যায়।

এই ক'মাস ধরে রঙ্গনাথ যে জীবনের আশেপাশে কেবল ঘুরেই মরেছে, যার ভেতরে ঢুকেও সে বাইরের লোক রয়ে গেছে, সেই জীবন যেন একটা কঠোর ভর্ৎসনার মতো তার সামনে এসে দাঁড়াল। তার আত্মার তারে— অবশ্য যদি আত্মা দেখতে সারেঙ্গীর মতো হয়— পলায়ন সংগীত ধ্বনিত হতে লাগল।

রঙ্গনাথ দরজার ওপর বসে চুপচাপ দেখতে লাগল। ছোটে পালোয়ান প্রতিদিনের মতো দাদ চুলকোতে চুলকোতে চলে গেলেন। রঙ্গনাথের দিকে তিনি ফিরেও তাকালেন না। রাস্তায় জোরে ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ শোনা গেল, শহরের কো-অপারেটিভ ডেয়ারির ট্রাক দুধ নিতে এসেছে। একটা লোক হাতে হাঁড়ি ঝুলিয়ে শনিচরের দোকানের দিকে চলেছে। রঙ্গনাথ বুঝল, এ সেই তেলীটা, যে শহর থেকে কলে পেষা তেল কিনে এনে গ্রামে ঘানিতে পেষা খাঁটি সরষের তেল বলে বিক্রি করে। আণ্ডারওয়্যার আর বেনিয়ান পরা সেপাইয়ের মতো দেখতে একটা লোক সুবিধা দরে মাংস কিনে কসাইয়ের বাড়ি থেকে ফিরছে। প্রতিদিনের মতো আজও সে রঙ্গনাথকে দেখে বলে উঠল, "জয় হিন্দ সাহেব।"

লোকটা মাংস ঝুলিয়ে চলে গেল। রঙ্গনাথের ইচ্ছে হ'ল, লোকটার গলা ধরে বলে, "তবু এই ছুতোয় এখানে কেউ তো হিন্দের নাম নিল!"

দূরে কোথায় এক বেদের ডুগডুগি বাজছে। শনিচরের দোকানের গালাগাল উচ্চগ্রামে ওঠার চেষ্টা করছে। রঙ্গনাথ ভাবল, সত্যিই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার আত্মার তারে এখন পুরো দমে পলায়ন-সংগীত ধ্বনিত হ'তে আরম্ভ করেছে।

পলায়ন-সংগীত

তুমি মাঝারি ধরনের একটা মানুষ আর মনুষ্যত্বের পাঁকে আটকে গেছ। তোমার চারিদিকে কেবল পাঁক আর পাঁক।

পাঁকের মোসাহেবি কোরো না। তুমি এই ভুল ধারণা নিয়ে

থেকো না যে, পাঁকেই পদ্ম ফোটে। পাঁকে পাঁকই থাকে, পাঁকই ছড়ায়, পাঁকই ছিটোয়।

পাঁক থেকে বাঁচো। এই জায়গাটা ছেড়ে দাও। এখান থেকে পালাও।

তুমি সেইখানে পালিয়ে যাও, যেখানকার রঙিন ছবি "লুক" আর "লাইফ" পত্রিকায় খুঁজে খুঁজে দেখেছ; যেখানকার ফুলের মুকুট, গিটার আর তরুণীরা তোমার আত্মাকে সব সময় নতুন অন্বেষণের জন্য অনুপ্রেরণা দেয়; যেখানকার বাতাস সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর; যেখানে রবিশঙ্করের মতো সংগীত আর মহর্ষি যোগীর মতো অধ্যাত্মের চিরন্তন স্বপ্নালুতা আছে।···

সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। এখান থেকে পালাও। এই জায়গাটা ছেড়ে দাও।

তরুণ ডাক্তারদের মতো, এঞ্জিনীয়ার, বৈজ্ঞানিক আর আন্তর্জাতিক খ্যাতির জন্য ক্ষয় হতে থাকা মনীষীদের মতো— চব্বিশ ঘণ্টা যাঁদের এই কান্না যে, এখানে সবাই মিলে তাঁদের সুখী হতে দিচ্ছে না— তাঁদের মতো পালিয়ে যাও। এখানে গণ্ডগোলের মধ্যে থেকো না।

যদি তোমার অদৃষ্টই খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে আর তোমাকে এখানেই থাকতে হয় তা হলে তুমি একটা আলাদা স্বপ্নরাজ্য গড়ে তোলো। সেই রাজ্যে থাকো, যেখানে বহু বুদ্ধিজীবী চোখ বুজে পড়ে আছেন। হোটেলে আর ক্লাবে, শরাবখানায় আর ক্যাবারে-ঘরে, চণ্ডীগড়-ভুপাল-ব্যাঙ্গালোরের নবনির্মিত ভবনে, শৈলাবাসে যেখানে কখনও সেমিনার শেষ হয় না, বৈদেশিক সাহায্যে তৈরি নতুন নতুন গবেষণাগারে যেখানে ভারতের প্রতিমা তৈরি হচ্ছে।

চুরুটের ধোঁয়া, ঝকমকে জ্যাকেটের বই আর ভুল কিন্তু অনিবার্য ইংরেজীর কুয়াশায় ভরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এইরকম কোনো জায়গায় গিয়ে জমে যাও আর জমে থাকো।

যদি তা না পারো তো অতীতের গর্ভে গিয়ে লুকিয়ে পড়ো। কণাদ, পতঞ্জলি, গৌতমের মধ্যে; অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যাণ্টার মধ্যে; কোণার্ক আর খাজুরাহোর মধ্যে; শাল-ভঞ্জিকা-সুরসুন্দরী-অলসকন্যার স্তনের মধ্যে; জপ-তপ আর মন্ত্রের মধ্যে; সন্ত-সমাগম-জ্যোতিষ-সামুদ্রিকের মধ্যে— যেখানেই জায়গা পাও, গিয়ে লুকিয়ে থাকো।

পালাও, পালাও, পালাও। ন্যায় তোমাকে তাড়া করছে।

রঙ্গনাথ উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় দেখতে পেল, কলেজের দিক থেকে প্রিন্সিপালসাহেব আসছেন। আজ তিনি শার্ট আর হাফ-প্যাণ্টের সঙ্গে জুতো-মোজাও পরেছেন। রোজকার মতো হাতে বেতও রয়েছে। দূর থেকেই তিনি হেসে রঙ্গনাথকে নমস্কার করলেন। দেখতে দেখতে তিনি চবুতরার কাছে এসে পড়লেন। চবুতরার পাশে একটা চেয়ার ছিল, যেন তাঁর জন্যই ছিল এমনিভাবে তার ওপর তিনি বসে পড়লেন।

প্রিন্সিপালসাহেব রঙ্গনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ এখনও বেড়িয়ে ফেরেন নি নাকি?"

কথাটা বলে ভালো হয়ে বসার জন্য জুতো মোজা খুলতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি চেয়ারের ওপর ব্যাঙের মতো উবু হয়ে বসলেন। তারপর বললেন, "কাল মহারাজের খুব দুঃখ হয়েছিল। যা-ই হোক, ব্যাপারটা তো মিটে গেছে।"

প্রিন্সিপালসাহেবের উৎসাহ হঠাৎ বেড়ে গেল। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "আমি তো আপনার সম্বন্ধে আগেই বলে দিয়েছিলাম। রামভরসায় সকলের মুজরো নিয়েছি, আপনি থোড়াই আমাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। ওদিকে তো আপনি খবরাখবর নেবার জন্য যেতেন। মহারাজকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।"

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইলেন। বেদের ডুগডুগির শব্দ কাছে এগিয়ে আসছে। প্রিন্সিপাল বললেন, "আপনার শরীর তো এখন একেবারে ভালো মনে হচ্ছে।"

"ভালো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন একেবারে ফিট তো ?"

রঙ্গনাথ বিনয় করে জবাব দিল, "আপনাদের কৃপায়।"

"তা হলে এখন কী ইচ্ছে ?"

"ফিরে যাচ্ছি। এতদিন রিসার্চের কাজ পড়ে আছে, গরমে শেষ করতে হবে।"

প্রিন্সিপাল অনর্গল কতকগুলো কথা বলে গেলেন, যার তাৎপর্য : রঙ্গনাথ ইতিহাসে মস্ত পণ্ডিত। কিন্তু বেশিরভাগ লোকই রামছাগল হয়ে গেছে। ইউনিভার্সিটিগুলোর হাল আস্তাবলের মতো, বড়ো বড়ো প্রফেসররা শুধু ভাড়াটে ঘোড়া।

রঙ্গনাথ এইসব কথায় কোনো আগ্রহ দেখাল না। প্রিন্সিপাল জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কীরকম চান্স আছে? এবছর কি ওখানে আপনার লেকচারার হবার আশা আছে ?"

রঙ্গনাথ বলল, "এখন সে প্রশ্নই ওঠে না।"

প্রিন্সিপালসাহেব তাঁর চেয়ারটাকে দু ইঞ্চি কাছে টেনে আনলেন। তারপর বললেন, "আপনি তো জানেনই, খান্না ইস্তফা দিয়ে

দিয়েছেন। আমাদের এখানে ইতিহাসের লেকচারারের জায়গাটা খালি হয়েছে। ওখানেই কেন আপনি লেগে যাচ্ছেন না? ঠাটের মাথায় মামার এখানে থাকুন, কলেজে দু ঘণ্টা পড়ান আর বাকি সময়টা রিসার্চ করুন।"

রঙ্গনাথের মনে হ'ল, তার শরীরের সমস্ত রক্ত ঝপ্ করে সাপের মতো তার কপালে পোঁছে গেছে। সে রুক্ষভাবে বলল, "আমি আপনার ওখানে মাস্টারি করব? আর তা-ও খান্নার জায়গায়?"

প্রিন্সিপালসাহেবের মুখে কোনো ভাঁজ পড়ল না। তিনি বললেন, "আমি বৈদ্য মহারাজের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি।"

রঙ্গনাথ আগের মতোই রুক্ষভাবে বলল, "আমার চোখের সামনে সব ঘটেছে। আমি জানি, কী করে খান্নাকে এখান থেকে তাড়ানো হয়েছে।"

প্রিন্সিপাল হতাশ হয়ে বললেন, "কী আর বলব! আপনিও এইরকম কথা বলছেন। এ তো পার্টিবাজির ব্যাপার।"

একটা লোক ছেঁড়া লুঙ্গি পরে, গায়ে কালো নোংরা জামা দিয়ে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে শনিচরের দোকানের কাছে এল। তার সঙ্গে রয়েছে একটা পুরুষ-বাঁদর আর একটা মেয়ে-বাঁদর। তাদের গায়ে স্টেজে নাচার পোশাক। তাদের পেছন পেছন কয়েকটা ছেলে মজা করতে করতে আসছে। এই ভিড়ের মধ্যে কয়েকটা কুকুরও আছে। তাদের ধমকানোর জন্য লোকটা মাঝে মাঝে ডুগডুগিটা মাথার ওপর তুলে খুব জোরে জোরে বাজাচ্ছে।

ডুগডুগির জন্য প্রিন্সিপালসাহেবকে তাঁর গলার স্বর চড়াতে

হ'ল। তিনি বলতে লাগলেন, "জায়গাটা খান্না চলে যাবার জন্য হয়েছে, কি মালবীয় মরার জন্য তাতে আপনার কী? আপনার নিজের বাগান যখন, তখন আম খেয়ে যান। গাছ গুনছেন কেন?"

রঙ্গনাথের কাছ থেকে এ কথার কোনো জবাব না পেয়ে তিনি স্নেহার্দ্র হলেন, "আপনি" থেকে "তুমি"-তে নেমে বললেন, "আমি তো তোমাকে বাড়ির লোক মনে করে বলছি। শেষ পর্যন্ত করবে কী? কোথায়ও-না-কোথাও চাকরিই তো করবে? এখানে তো খান্না নিজের ইচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছে, কে জানে সেখানে কোনো খান্নাকে হয়তো কান ধরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ থেকে কতদূর বাঁচতে পারবে বাবু রঙ্গনাথ? যেখানেই যাও, কোনো-না-কোনো খান্নার জায়গাতেই তোমাকে যেতে হবে।"

কথাগুলো বলেই তিনি চবুতরা থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে বেদের দিকে তাকিয়ে সজোরে হাতের ইশারা করে তাকে জাহান্নামে যাবার পরামর্শ দিতে লাগলেন।

রঙ্গনাথের মুখচোখ রাগে লাল হয়ে উঠল। গলার স্বর চড়িয়ে, যেন তার সঙ্গে ন্যায়ের পতাকাও তুলে ধরে, সে বলল, "প্রিন্সিপাল-সাহেব, আপনার কথাবার্তা আমার ভালো লাগছে না। আপনি চুপ করুন।"

প্রিন্সিপাল অবাক্ হয়ে রঙ্গনাথের কথাগুলো শুনলেন। তারপর হতাশ হয়ে বললেন, "বাবু রঙ্গনাথ, তোমার চিন্তা অনেক উঁচু, তবু সব মিলিয়ে প্রমাণ হচ্ছে, তুমি একটা গাধা।"

এরপর দুজনেরই বাক্‌রোধ হয়ে গেল। ওদিকে বেদেটা জাহান্নামে

যাবার বদলে ওখানেই জোরে জোরে গান গাইতে আরম্ভ করেছে, তার ডুগডুগি এখন একটা নতুন তালে বাজছে। খানিকটা দূরে কয়েকটা কুকুর লেজ নাড়তে নাড়তে, কোমর বাঁকাতে বাঁকাতে অবিরাম ডেকে চলেছে। ছেলের দল চারদিক ঘিরে আছে। বাঁদর দুটো বেদের সামনে খুব গম্ভীর হয়ে মুখ ফুলিয়ে বসে আছে। মনে হচ্ছে, তারা যখন উঠবে, ভরতনাট্যমের চেয়ে খারাপ কিছু নাচবে না।